লেখকের মুখোমুখি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬১

প্রকাশক :
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
বাদল রায়
বিদ্যাসাগর প্রেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
কানাই পাল

মূল্য : ছ' টাকা

শ্রীপীযূষকিরণ বসু

জীবনরসিকেষু

লেখকের নিবেদন

বন্ধুবর শ্রীসমর সোম যখন তাঁর 'মানসী' পত্রিকার জন্য তিন বছর আগে লিখতে বললেন, তখন মনে মনে বিব্রত হয়েছিলাম, প্রশ্ন করেছিলাম কি লিখব?

বন্ধু উত্তরে বেদারের একটি উর্দু শায়র আবৃত্তি করেছিলেন:

জো কুছ্ চাহিয়ে আপ্ ফরমাইয়ে,
পর গৈরোঁ কী বার্তে ন সুনাইযে।

—আপনার যা-খুশী তা-ই লিখুন। যা প্রাণ চায়, তা-ই আদেশ করুন। কিন্তু যাঁরা অন্তরঙ্গ নন, তাঁদের কথা বলবেন না।

এ-বই ঐ অনুরোধের ফল। যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যপত্র সম্পাদনা উপলক্ষে বিগত বারো বছর ধরে বহু লেখকের সঙ্গ করেছি, অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছি ও সুখ-দুঃখ ভরা বহু কাহিনী শুনেছি। এ-গ্রন্থে সেইসব কাহিনীর মালা গেঁথেছি। তথ্য সম্পর্কে যথাসম্ভব বিশ্বস্ত হতে চেষ্টা করেছি। যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে উদ্দিষ্ট লেখকদের দিয়ে তথ্য যাচাই করিয়ে নিয়েছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেছি। অন্যত্র লেখকদের মুখের কথাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছি।

সকল লেখকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় নি, তা আমার দুর্ভাগ্য। যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছি, এখানে তাঁদের গল্পই বলেছি। জন্মসাল-অনুযায়ী লেখকদের সাজিয়েছি। যাঁদের সম্বন্ধে লিখি নি, তাদের সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা কারুর চেয়ে কম নয়। যদি কোনোদিন অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পাই, তাঁদের সম্পর্কেও লিখব।

সম্পাদক-বন্ধু শ্রীসমর সোম দুবছর ধরে লেখাগুলি 'মানসী'তে ছেপেছিলেন এঁকে প্রীতি জানাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের বই

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

রবীন্দ্র-সমীক্ষা

রবীন্দ্র মনীষা

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

বাংলা সমালোচনার ইতিহাস [যন্ত্রস্থ]

সম্পাদনা :

রবীন্দ্র-বিতান

দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-সঞ্চয়

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে)

সূচী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের গুরু বলতেন, 'আড্ডা দদাতি বিনয়ং। আড্ডা দদাতি জীবনং। আড্ডা দদাতি ধর্মং।'

অর্থাৎ যদি বিনয় চাই, দীর্ঘজীবন কামনা করি ও ধর্মপথে থাকতে চাই, তবে আড্ডা দিতেই হবে।

এ বিষয়ে আদর্শ ছিলেন 'বিচিত্রা' ও 'গল্পভারতী'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের উপীন, আমাদের উপেনদা। মনে পড়ছে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িব পূর্ব-দক্ষিণ খোলা দোতলার ঘরে বসে উপেনদার আড্ডা-মাহাত্ম্য কীর্তন :

"ভায়া, জানো তো দ্বিজু বায়ের সেই কবিতা ?

সব বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি
আব কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
এ সব কোরো নাকো, খাসা বসে থাকো
ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা,—
আর বল, জীবনটা কিছু না !

এই ক'টি চরণেই অলস আড্ডাধারী ব্যক্তিদের জীবনদর্শন নিহিত আছে।"

আমরা ভক্তিভরে তদ্গত চিত্তে হাত জোড় করে বসে শুনছি, উপেনদা বলে যাচ্ছেন :

"জাগ্রত জীবনের বেশ খানিকটা অংশ আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে বুঝেছি, আলস্য ও আড্ডার মধ্যে একটা গোত্রগত সাজাত্য এবং ধর্মগত সাযুজ্য আছে। অর্থাৎ, জাতি হিসাবে আলস্য ও আড্ডা একই গোত্রের অন্তর্গত, এবং আচরণের দিক দিয়ে তাদের পরস্পরের

মধ্যে ধর্মবিরোধ নেই। জাতি হিসাবে তারা নঞ্‌তৎপর, ধর্ম হিসেবে নৈষ্কর্ম্যবাদী।

"আলস্য আর আড্ডার নঞ্‌তৎপরতার উপসর্গ প্রধানতঃ দুটি,— অ এবং ন। একবার যারা আড্ডায় জমিয়ে বসে, তখনকার মতো তারা অ+চল=অচল; আর কাজের লোকেরা তাই তাদের মনে করে ন+গণ্য=নগণ্য। কিন্তু জীবনে দশ বৎসর অন্তর একটি দিন আসে যেদিন অলস আড্ডাবাজ মানুষও গণ্য বলে বিবেচিত হয়। আদমসুমারীর দিনটিতে পরিসংখ্যানের হিসাব-খাতায় অকেজো মানুষের মূল্য 'এক'; কেজো লোকের মূল্যও ঠিক সেই 'এক'ই; একের চেয়ে একশতাংশও বেশী নয়। গণনার নিরপেক্ষ নিরিখে অকেজো মুড়ি আর কেজো মিছরি একদর।

ধর্ম হিসেবে অলস আড্ডাবাজ ব্যক্তিরা নৈষ্কর্ম্যবাদী। জীবনের প্রতি তাদের বৈদান্তিক ঔদাস্য; 'তুমিও যেমন! কিছুই কিচ্ছু না।' তাই বলছিলাম—"

বাধা দিয়ে বলি, "দাদা ব্যাপারটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। একটু সোজা করে বলুন।"

উপেনদা বলেন, "আচ্ছা ভাই, সোজা করেই বলি। একটা উদাহরণ দিই। এই জগতে আদর্শ আড্ডাধারী কে? গুলিখোর। আলস্যপরায়ণতায় গুলিখোরদের টেক্কা মারা ভার; আর সেইজন্যে আদর্শপরায়ণতায় তাদের আড্ডার তুলনা মেলা ভার। গুলিখোররা স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, সরল, অবিদ্বেষী। কোনো 'অতি' বা 'উচ্চ' তারা বরদাস্ত করতে পারে না। উচ্চ শব্দ, উগ্র আলোক, অতি অট্টহাস্য তাদের পীড়িত করে। গুলি খেয়ে সামনে চাটের পাত্তর নিয়ে আলো-ছায়ার আবছায়ায় বসে তারা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে পাত্তর থেকে অল্প একটু চাট নিয়ে মুখে দেয়; কদাচিৎ এক আধটা কথা কয়। গুলিখোররা ভয় করে মাতালদের, কেননা মাতালরা বড্ডই চেঁচায়, শান্তিভঙ্গ করে। গায়ে বমি করে দেয় আর চাট খেয়ে

যায়। মাতালদের আগমন-রূপ দুর্ঘটনা থেকে আড্ডার সংহতি রক্ষার জন্য গুলিখোররা যে কত স্বার্থ ত্যাগ করে, ও কত অদ্ভুত এবং সরল ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করে তার একটা বাগবাজারি গল্প বলি।"

উপেনদা চায়ের কাপে দু'চুমুক দিয়ে ফের শুরু করলেন :

"বহুকাল আগের কথা। বাগবাজারে পুরানো এক অট্টালিকার পরিত্যক্ত পূজার দরদালানে মাঝে মাঝে গুলির আড্ডা বসত। পাড়ায় কয়েকজন মাতাল ছিল। গুলির আড্ডা বসেছে জানতে পারলে হৈচৈ করতে করতে সেখানে ঢুকে তারা সন্ত্রস্ত গুলিখোরদের সমস্ত চাট নিঃশেষে মেরে দিত। একদিন সাতজন গুলিখোর গুলি সেবন করে প্রগাঢ় মৌজের তুরীয় আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে বসেছে। সকলের সামনে এক-একটি পাত্তরে উৎকৃষ্ট চাট্। মাঝে মাঝে তারা চাট মুখে দিচ্ছে। কিন্তু মুখ থেকে বাক্য নির্গত হবার মতো নেশা তখনও তরল হয় নি। এমন সময়ে হ্যারে-র‍্যারে-র‍্যারে-র‍্যারে করতে করতে চারপাঁচজন মাতাল সহসা প্রবেশ করলে।

শব্দ শুনে এক মুহূর্তে নেশা গেল ছুটে। চাটের নৈবেদ্যে সন্তুষ্ট হয়ে অপদেবতারা যাতে আর কোনো দৌরাত্ম্য না করে চলে যায় সেই জন্য চাটের পাত্তরগুলো ফেলে রেখে তারা এক একটা থামের আড়ালে গিয়ে লুকোলো। এখন থাম ছিল ছ'টা আর গুলিখোর সাতজন। সুতরাং সপ্তম কোনো আশ্রয় না পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে খানিকটা ছুটোছুটি করে অগত্যা হাত-পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

চাট শেষ হওয়ার পর তার ওপর দৃষ্টি পড়ল মাতালদের। বোধ হয় কতকটা কৌতুক করার অভিপ্রায়েই হ্যার‍্যার‍্যার‍্যা করতে করতে তার কাছে ছুটে আসতে ধীরে মৃদুকণ্ঠে সে বললে, 'দোহাই বাবারা, আমাকে কিছু বোলো না, আমি আঁকা।'

মাতালরা তেড়ে উঠল, 'তুই মানুষ নোস ?'

মাথা নেড়ে গুলিখোর জানালে, সে মানুষ নয়।

'তুই ছবি ?'

পুনরায় মাথা নেড়ে সে জানালে, সে ছবি।

এক মাতাল বললে, 'যে ছবি কথা কয়, মাথা নাড়ে, আমি সে ছবির গায়ে বমি করি।'

শুনে যুক্তকর বাড়িয়ে ধরে গুলিখোর কাত্রে উঠল, 'দোহাই বাবা। নিজে নেশার রসিক হয়ে অন্যের নেশা নষ্ট কোরো না।'

বোধ হয় মাতালদের দয়া হ'ল, হল্লা করতে করতে তারা চলে গেল। গুলিখোররা এমনি সরল, বিনয়ী ও মহৎপ্রাণ বলেই তাদের আড্ডা জমাট হতে পারে।"

উপেনদা থামলেন। গম্ভীর মুখ। আমরা হো-হো করে হেসে উঠতেই বললেন, 'দিলে তো উচ্চ শব্দ করে নেশার বারোটা বাজিয়ে।' আমরা আরো জোরে হেসে উঠলাম। তখন উপেনদা মুচ্কি হেসে বললেন, 'এখন কেমন লাগে ? বলছিলে, আড্ডা তত্ত্ব খুব কঠিন তত্ত্ব। এখন বলো, সহজ সরল কিনা ?'

আমরা সবাই হাতজোড় করে বললাম, 'আড্ডা দদাতি জীবনং।'

এই হলেন উপেনদা। ছেলে-বুড়ো সকলের প্রাণের সখা।

•

উনআশি বছরের নবীন যুবক উপেনদা বয়স পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের বন্ধু ছিলেন। অবারিত ছিল তাঁর হৃদয়-দুয়ার। সকলের সঙ্গে আমিও সেই খোলা পথে ঢুকে গিয়েছিলাম।

'মায়াবতী পথে'র পাতা উল্টোতে উল্টোতে দেখবেন উপেনদা লিখেছেন :

'বয়সের উপরে আমরা সাধারণত যতটা গুরুত্ব আরোপ করি, বস্তুত বয়স ততটা গুরু ব্যাপার নহে। বয়সের সমতা মিলনের একটা ক্ষেত্র বটে। কিন্তু সে মিলনের ক্ষেত্রের ঘাসে সব সময় শিশির জমে না। এবং গাছে সব সময়ে ফুল ফোটে না। মিলনের

উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র, বোধ করি, রুচি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র। তেমন ক্ষেত্রে মিল যদি হয় তাহা হইলে বায়ু শিশির ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, এবং বৃক্ষ কোরক ছাড়িতে থাকে।'

উপেনদা এই দুর্লভ গুণের অধিকারী এবং বয়সের বাধা অতিক্রম করে অনায়াসেই বন্ধুত্বের ফুল ফোটাতে পারতেন। এবং সব কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।

উপেনদার 'স্মৃতিকথা'য় দেখবেন গুণগ্রাহিতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও পরিহাসরসিকতা—এই তিন দেব-দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। বস্তুত তিনি দেখিয়েছেন যে জীবনের সকল দুঃখের ক্ষেত্রেই আনন্দের ফুল ফোটানো যায়। এর জন্য চাই সরস মন।

উপেনদার সঙ্গে আমার পরিচয় কয়েক মাসের, কিন্তু তার গভীরতা সমস্ত জীবনের। তাঁর জীবনের শেষ ক'মাস তাঁকে চিনি। এই পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছি। শেষ দিনের আগের দিনে তাঁকে প্রায় সারাদিনই সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেম।

জীবন যে কখনো কখনো নাটকের চেয়েও নাটকীয়, উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র, রূপকথার চেয়েও অবিশ্বাস্য, তার প্রমাণ পেলাম এইদিনে।

সেদিনটা আজো আমার মনে পড়ে এবং চিরজীবন মনে পড়বে ; ১৯৬০ সালের ২৯শে জানুয়ারী। এই দিনটির সকালে চার ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় চার ঘণ্টা এক সুন্দর সঙ্গে কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সুন্দর সঙ্গ যিনি দান করেছিলেন তিনি ঊনআশি বছরের তরুণ উপেন্দ্রনাথ।

সেদিনের আলোকোদ্ভাসিত সেই খাস-দরবারে উপেনদার শেষ বৈঠক বসেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা—সেই বৃষ্টির বর্ণনা—'অমনি ছাদের ওপরে দুপ-দাপ, হনুমানদের গাছে গাছে হুপ-হাপ'—এই চরণগুলি আবৃত্তি করে উপেনদার সে কী হাসি!—

উপেনদা আমাদের কোন্ ব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন—এই প্রশ্নটা অনেক সময় মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ভেবে দেখেছি, উপেনদার সব চেয়ে বড় শিক্ষা—আড্ডা দেওয়ার মহিমা প্রচার। উপেনদা ছিলেন মহাআড্ডাধারী।

'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে উপেনদা রসিয়ে রসিয়ে এর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "আড্ডা দেওয়া বিষয়ে এই উপযুক্ততা অর্জন করেছিলাম বাল্যকাল থেকে আড্ডা দিয়ে দিয়ে। জীবনের বেশ একটা ভগ্নাংশ আড্ডা দিয়েই কেটেছিল। যেখানে যখন গেছি এবং থেকেছি, আড্ডার পথ খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি, অনেক সময় আড্ডাই আমাকে পথ দেখিয়ে যথাস্থানে নিয়ে গেছে।—সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার দ্বারা নন্দিত সুন্দরতর এবং সূক্ষ্মতর জীবনের সহিত যারা যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে চলতে চায়, তাদের পক্ষে আড্ডা দেওয়া অপরিহার্য।"

যাঁরা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প পথের যাত্রী, তাঁবা মহা আড্ডাধারী উপেনদার এই আর্ষবাক্য স্মরণে রাখবেন, এই প্রত্যাশায় তাঁর আড্ডার কথা লিখছি।

একদিন সকালে উপেনদার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে গেছি। সেই পূর্ব-দক্ষিণ খোলা রৌদ্রালোকিত ঘরে দেখি উপেনদা লিখছেন।

প্রসন্ন আননে আহ্বান করলেন,—'এসো, এসো, আজ সকালে কেউ না আসায় স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।' বলেই কাগজ কলম তুলে রাখলেন।

একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—'কিন্তু আপনার লেখার—'।

—'রাখো, তোমার লেখা। কি খবব বল?' ব্যস্, আরম্ভ হয়ে গেল ঘণ্টা তিনেকের আড্ডা।

কথাপ্রসঙ্গে বললাম—'উপেনদা, একি করেছেন, গোঁফ রেখেছেন কেন?'

—'না, শেষ পর্যন্ত রাখব কিনা, তা সিদ্ধান্ত করিনি। নানা জনের অভিমত নিচ্ছি। তোমার কি মনে হয়?'

—'কেটে ফেলুন, আপনাকে আর এই বয়সে নোতুন করে প্রবীণ সাজতে হবে না।'

হেসে বললেন—'ভোটে তোমাদেরই জয়। গোঁফটা কেটেই ফেলব ভাবছি।'

তারপর আরম্ভ হল গোঁফের গল্প। সুকুমার রায়ের বিখ্যাত ছড়া—'গোঁফের আমি, গোঁফেব তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা'—এটি পুরোটা আবৃত্তি করলেন।

হেসে বললাম, 'প্রথম চরণটির কাবুলী সংস্কবণ শুনেছেন?'

এতক্ষণ উপেনদা আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন, সোজা হয়ে বসে বললেন—'সেটা কি, এখুনি বল।'

বললাম—'সেটার অনুবাদক পরম রসিক সৈয়দ মুজতবা আলি।

আলি সাহেবের কাবুলী ভাষান্তরে ওটা হয়েছে এই—'তনে বুরুৎ মনে বুরুৎ, বুরুৎ সনাক্তদার।'

শুনে উপেনদার সে কি হাসি। ৭৯ বছর বয়সে লোকে যে অত খুশী হতে পারে, তা কে জানত। এত সামান্য আয়োজনে উপেনদা এত হাসতেন ও হাসাতেন, তা থেকে প্রমাণ হয় তাঁর ছিল অদম্য জীবনীশক্তি।

উপেনদা কেবল আড্ডারসিক নন, বক্তৃতা-রসিকও। যেখানে যত সভা, তাতে উপেনদা এক কথায় যেতে রাজি। বললাম—'উপেনদা, এই বয়সে এত সভায় যাবেন না, শরীরের কথা ভাবুন।'

হেসে বললেন—'ভেবে আর কে কি করতে পেরেছে? তোমরা বোঝ না, সভায় গেলেই আমি সুস্থ বোধ করি। যেই গাড়ি এসেছে, জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। অমনি শরীরটা হয়েছে ঝরঝরে।'

তারপর আড্ডার মোড় ঘুরে গেল, প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হল। বক্তা ও বক্তৃতার প্রসঙ্গ এল।

কে কি রকম বক্তৃতা দেয়, সে কথায় উপেনদা বললেন, 'অমুকের বক্তৃতা শুনেছ? বেশ ভালো বলে!'

প্রশ্ন করলাম—'সে কি? অমুক ভালো বলে! কি বলছেন আপনি?'

গম্ভীর হয়ে বললেন—'তার বক্তৃতা একক দশক।'

বিস্মিত হয়ে বলি—'তার মানে?'

আরো গম্ভীর হয়ে উপেনদা বললেন—'বক্তৃতার সূচনা একক দশকে। তারপর সেই সূত্র ধরে এগিয়ে চলল স্রোতের মত। একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক অঘ্রাণ পৌষ মাঘ ছেলে পিলে লীভার মুরগী খাসি পাঁঠা গরু ভেড়া—'

হাসতে হাসতে বললাম—'দাদা থামুন, আর না, এতেই হবে।'

এইবার উপেনদা হাসলেন। বললেন, 'তাহলেই একক দশক বক্তৃতার মাহাত্ম্য বোঝ।'

কতদিন কত রকম গল্প উপেনদা বলতেন, তার ইয়ত্তা নেই। একদিন বললেন সংস্কৃত পণ্ডিতদের গল্প।

উপেনদা এমন একটা মজলিসি কণ্ঠে গল্প বলতেন, তা এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। নিশ্চিন্ত অবসর, ঢালাও ফরাস, তাকিয়া-বালিশ, গড়গড়া সামনে না থাকলেও উপেনদা মনে মনেই সেগুলির সাহচর্য পেতেন।

বললেন, 'জানো হে, এক সংস্কৃত পণ্ডিতের এক ঝি ছিল।'

মুখ টিপে হেসে বললাম—'তার নাম কি সাবিত্রী?'

উপেনদা হেসে বললেন—'আরে, না, না, সে ধরণের গল্প নয়। এ অন্য গল্প। ঝি'র নাম পাঁচী। পণ্ডিত মশাই তাকে বড় স্নেহ করতেন। পণ্ডিতের সঙ্গে থেকে থেকে পাঁচীও বেশ কিছুটা সংস্কৃত শিখেছিল। একদিন হয়েছে কি, ভট্টাচার্যের খোড়ো ঘরের

চালায় আগুন ধরে গেছে। পণ্ডিত মশায় তখন পাঁচীকে ডেকে বলছেন—

'পাঁচি, পঙ্কি, প্রপঙ্কি, পঞ্চাননি, বারি আনয় (জল আনো)।

পাঁচি ছাড়বে কেন? সে-ও সমান তালে উত্তর দিল—ভট্টাচার্য, আচার্য, শিরোধার্য, পরমগুরো, গঙ্গোদকং কূপোদকং বা? (গঙ্গাজল আনব, না—কুয়ার জল আনব?)

এদিকে তো পণ্ডিতের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে।'

বললাম—'দাদা, এ বড় খাশা গল্প।'

সদাপ্রফুল্ল উপেনদা গল্পের ভাণ্ডারী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে নানা অশান্তি ও চিন্তা তাঁর ছিল। তা সত্ত্বেও এত আনন্দ, এত গান, এত হাসি, কোথা থেকে আসত? এ প্রশ্নের আলোচনায় বারবার বিস্মিত হই, মনে হয় উপেনদা জানতেন, 'Laugh and the world laughs with you, cry and you cry alone.'

উপেনদা কত গল্পই যে বলতেন! একদিন কথা হচ্ছিল—সেরা বিষয় দাম্পত্যজীবন নিয়ে। বললেন,—"ভায়া, বিয়ে করেছ তো! খুব সাবধানে চলবে, এদিক-ওদিক হয়েছ কি, ব্যস! আর রক্ষা নেই, তোমার হয়ে গেল।'

দাম্পত্যজীবনের আদর্শ শিল্পী উপেন্দ্রনাথের পক্ষেই সাজে এই কথা।

তর্ক উঠল, বাঁকা স্বামীকে সিধে করা যায় কি করে?

উপেনদা বললেন, "এতো খুব সোজা! তুমি আমার 'শশিনাথ' উপন্যাস পড়নি? তাতেই তো পথ বাৎলে দিয়েছি।"

বললাম,—"তবু, আপনার মুখে শুনি।"

উপেনদা এক খণ্ড 'শশিনাথ' টেনে নিয়ে পাতা উল্‌টে গম্ভীর ভাবে পড়ে গেলেন—

"'বাঁকা লাঠি, বাঁকা কাঠি, এসব সোজা করবার উপায় জান

তো? যে দিকে বাঁকা, তার উল্টো দিকে আরও বেশী জোরে বেঁকিয়ে দিতে হয়। বাঁকা বর সোজা করবারও ঠিক তাই নিয়ম। সে যে দিকে বাঁকা দেখবে—তুমি তার উল্টো দিকে আরও বেশী করে বেঁকবে। সে যদি হাসে, তুমি কাঁদবে, সে যদি মুখ ভার করে থাকে, তুমি হাসি মুখে ঘুরে বেড়াবে; সে যদি কথা বন্ধ করে; তুমি বাড়ির বাজে লোকদের সঙ্গে অনর্গল কথা কইবে; সে যদি বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে, তুমি একেবারে সোজা বাপের বাড়ী গিয়ে উঠবে। এইরকম কিছুদিন করলেই দেখবে, উল্টো বর দিব্যি সোজা হয়েছে।"

এটি গম্ভীরভাবে পড়ে বইটি যথাস্থানে রেখে উপেনদা আমাদের দিকে তাকালেন। এইদিনের আড্ডায় যে দু-একজন মহিলা ছিলেন তারা বিজয়গৌরবে হেসে উঠলেন। উপেনদাও হাসলেন। আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য ভল্টু চীৎকার করে উঠল, "এ তোমার ভারী অন্যায় উপেনদা! বাঁকা বৌ সোজা করার কথা তো ওতে নেই। সেটা বাৎলাও নি কেন?"

উপেনদা হেসে বললেন, "তোমার যেদিন তা দরকার হবে, আমার কাছে এসো, একটি অব্যর্থ মুষ্টিযোগ দিয়ে দেব।"

এবার সকলের মিলিত কণ্ঠের হাসিতে ঘর ভরে ওঠে।

আরেক দিনের কথা বলে এই প্রসঙ্গে ছেদ টানি।

গল্পটি বিশিষ্টা লেখিকা শ্রীযুক্তা বাণী রায়ের মুখে শুনেছি।

তিনি বললেন, "জানেন, উপেনদা, কত খোলা মনের ছিলেন? একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তারপরে উপেনদা প্রেম-ট্রেম জীবনে করেছিলেন, না, একেবারেই নিরামিষ?"

স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকহাস্যে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "দিদি, আমার যৌবনকালে তোমরা কোথায় ছিলে? আপসোস রয়ে গেল।"

শ্রীযুক্তা রায়ের কাছে এই গল্প শুনে উপেনদাকে বললাম। উপেনদা হাসতে লাগলেন। মুখ ঘুরিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালেন, দেয়ালে একটি বাঁধানো অভিনন্দন-লিপি পেরেকে ঝুলছে। বললেন,—"ওই দেখ, বাণী কি লিখেছে? ওটা নামিয়ে নিয়ে এসো।" নামিয়ে নিয়ে এসে পড়লাম। উপেনদা বললেন—"চেঁচিয়ে পড়ো, আমিও শুনি।"

সেই অভিনন্দন-লিপির একটি স্তবক পাঠকদের কাছে পেশ করছি। ভরসা করি, পাঠকরাও এতে সায় দেবেন,—

'জানি না তোমার যৌবন ছিল কতই বা অভিরাম,
অবেলায় এসে আমরা কেবল বৃদ্ধকে পেলাম।
ফুলের মনের খবর আমরা পাইনি ভ্রমর-দিনে,
শেষ গোধূলির শেষ আলো দিয়ে তবুও নিলাম চিনে।'

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

এই তো সেদিন, গত বৈশাখে (১৩৬৮) প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের উদ্বোধন করতে এসেছেন বিজ্ঞান-সাহিত্যরসিক-রবীন্দ্র-সহচর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পদার্থবিজ্ঞানের বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন চারুচন্দ্র। আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছি। সামনের সারিতেই আমি ছিলাম। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন, ছদ্ম ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "এই, অরুণ, তু মাস্ ধরে যাও না কেন? আড্ডায় আর মন বসে না?"

হাত জোড় করে চাপা স্বরেই বলি, "যাব, স্যার, অন্যায় হয়ে গেছে।"

গম্ভীর কণ্ঠে তর্জনী তুলে বল্লেন, "মনে থাকে যেন।" তারপর যেমন এসেছিলেন, তেমনিই এগোলেন, মঞ্চে বসলেন।

এই হলেন চারুচন্দ্র। সভাশোভা হয়ে গাম্ভীর্যের মুখোস পরে বসে থাকতে ভালবাসতেন না। নিছক নির্ভেজাল আড্ডাধারী হতেই পছন্দ করতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের সম্পর্কে সেদিন চারুচন্দ্র লিখিত ভাষণ পড়লেন। প্রথম জনের তিনি প্রিয় ছাত্র, দ্বিতীয় জনের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী।

সভা বিকেল পাঁচটার পর। ছাত্রছাত্রীরা সারাদিন পরীক্ষা দিয়ে ক্লান্ত, আমরা পরীক্ষার তদারক করে ততোধিক ক্লান্ত। নিদাঘের তপ্ত দিন শেষ হয়ে এলেও উত্তাপের অবসান হয় নি। সভায় শ্রোতৃসমাগম কম। এই নিয়েই জোর গলায় অনুযোগ করলেন অপর এক বক্তা। কলেজ-কর্তৃপক্ষকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। উদ্যোক্তারা বিড়ম্বিত, শ্রোতারা লজ্জিত, আমরা হতবাক্। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি রক্ষা করলেন চারুচন্দ্র। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে

বললেন, "সভায় লোকসমাগম কম বলে উনি আক্ষেপ করছেন। কেন? এই তো সেদিন কলকাতা-পৌরসভা-আয়োজিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ছিলুম সভাপতি। মাইকের লোক, উদ্যোক্তা ও আমাকে নিয়ে অত বড় প্যাণ্ডালে লোকসংখ্যা ছিল মোট তেইশ। তবু তো প্রত্যেকে একটি করে ফুলের 'বোকে' উপহার পেয়েছিল।"

একটু থামলেন, দম নিয়ে বললেন,—"সভাশেষে ছেলেরা আমাকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে বল্ছে। এর কোনো দরকার নেই। কাজ হয়ে গেছে, এখন আর গাড়ির কি দরকার? এখন তো আর 'ফচ্ ফচ্' করবে না।"

এক মুহূর্ত থামলেন, পরিবেশের তিক্ততা মুছে ফেলে দিয়েছেন, স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর-তরল কণ্ঠে বললেন, "ও, সেটা তোমরা জানো না, বুঝি! এক গাঁয়ে একবার ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

"গাঁয়ের ভোটারবা খুব খুশি। নির্বাচন-প্রার্থীবা তাদের গরুর গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে এসেছে। তাবপর লিমোনেড খেতে দিয়েছে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মুখে লেগে আছে সেই লিমোনেডের স্বাদ। আরেকবার হয় না? আরেকটু খেতে পাওয়া যায় না? নির্বাচন প্রার্থীর এজেণ্টকে গিয়ে একজন বলছে, "ও মশাই, আরেকবার সেই 'জল' একটু দেন দিকি।" এজেণ্ট বুদ্ধিমান, সেই বোতলগুলোতেই জল ঢেলে তাদের খেতে দিয়েছে। ঐ লোকটি খেয়ে তেমন খুশি হয় নি। কই, এবার তো আগের মত 'ফচ্ ফচ্' করে শব্দ হলো না। ভেবে-চিন্তে গিয়ে বলছে, 'ও কত্তা, কই, এবার তো আগের মতো 'ফচ্ ফচ্' শব্দ হল নি?'

এজেণ্ট তখন ধৈর্যের শেষ বিন্দুতে পৌঁচেছে। গম্ভীর তাকে বললেন, "ভোট দেবার পর আর 'ফচ্ ফচ্' করে না, আগে করে।"

গল্পটা বলে চারুচন্দ্র থামলেন। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত হল-ঘর অট্টহাস্যমুখরিত হলো। চারুচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, "তাই বলছিলাম। এখন আর ফেরৎ পাঠাবার জন্য গাড়ির কি দরকার।"

অট্টহাস্যের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। নিচে গাড়িতে তুলে দিলাম। তিনি চুপিচুপি বললেন, "দেখো, অ- -চ'—র পক্ষে এভাবে বলা উচিত হয় নি।"

বিপ্রদাস স্ট্রীটে তাঁর বাড়ির তেতলার ঘরে আর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে তাঁর কাগজের আফিসে দোতলাব সম্পাদক-কক্ষে কতদিন কত গল্পই তিনি আমাদের বলেছেন।

ত্ব-তিন সপ্তাহ না গেলেই অনুযোগ, "কি হে, এতদিন তোমার দেখা নেই কেন? বেশি লিখো না, অত খাতা দেখো না, মাঝে মাঝে আড্ডা দাও।" নিজেই বলতেন, "এখানে যে সব কথা শুনতে পাবে, তা আর কোথাও পাবে না।"

সত্যি তাই! গত তিন বছরে তাঁর কাছে কত গল্পই শুনেছি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপও এই তিন বছরের। লেখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ। প্রথম দিন বলেছিলেন, 'আপনি'। পরের দিন থেকে 'তুমি'—বাকি দিনগুলি স্নেহ সুধায় সিঞ্চন করেছেন।

অনেকদিন ধরেই বলেছিলেন, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে। দেব, দেব, দিচ্ছি করে শেষ পর্যন্ত একদিন সাহিত্যপরিষদে বসে ত্ব'ঘণ্টায় লেখাটি শেষ করে চলে গেলাম তাঁর পত্রিকার অফিসে। লেখাটি নিয়ে গম্ভীরভাবে সোজা ছাপাখানার কর্তা দাশরথিবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'কম্পোজ করুন গে যান।'

খানিক বাদে বললেন, 'আচ্ছা, কৃষ্ণকমলের মৃত্যু কোথায় হয়েছিল, কি ভাবে হয়েছিল,—সেটা লিখেছ?'

কিন্তু-কিন্তু করে বললাম, 'স্যর, ওটা দিই নি। কারণ সে বিষয়ে কোথাও কিছু নেই। আচার্য কৃষ্ণকমলের শেষ বিশ বছর সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথও কিছু লেখেন নি।'

মৃত্ব হেসে বললেন, 'জানলে তো বলবে! তোমাদের এই আচার্য

কলিকাতা নগরীতে শ্রীরামচন্দ্রের নামাঙ্কিত উদ্যান-অঞ্চলের এক বাসব-দত্তার বাড়িতে শেষ জীবন কাটিয়েছেন, সেইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।' অপরূপ মুখভঙ্গি করে বললেন, 'আজকাল-কার ছেলেরা কিছুই জানে না।'

আড্ডার সব ক'জন লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'বলেন কি ?'

—'বলি ঠিকই।'

নিবেদন করলাম, 'স্যর, ওটা কি প্রবন্ধের শেষে জুড়ে দেব।'

—'থাক, ছেড়ে দাও।' এতক্ষণে একটু হাসলেন।

তাঁর পত্রিকার মালিক শ্রীত্রিদিবেশ বসুমশায় এই আড্ডার কেয়ার-টেয়ার, অর্থাৎ পান'টা-চা'টা সন্দেশ'টা তিনিই জোগাতেন। সম্পাদক চারুচন্দ্র আসার পরই তিনি নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতেন, 'আজ কি হবে ?' চারুচন্দ্র আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'হাতে-গরম সন্দেশ।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুয়েচ, তোমাদের বালিগঞ্জে এ-জিনিস পাবে না। কল্‌কেতার কাল্‌চার হলো, থিয়েটার, সন্দেশ, আর তেলেভাজা। এর কোনোটাই বালিগঞ্জে নেই। সবই উত্তর কল্‌কেতায়।' বলে বিজয়ী-হাসি হেসে নড়ে-চড়ে বসতেন।

বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর-সাতাত্তর। সন্দেশ এলে একটি মাত্র খেতেন। তারপর 'চা খাই-কি-না খাই' করতে করতে কয়েক চুমুক খেতেন, তারপর একটি পান।

একদিন এমনি এক আসরে বললেন, 'ওহে, সাড়ে ছ'টা বাজলেই আজ চলে যাব। ত্রিদিবেশ বাবু, গাড়িটা এসেছে কিনা খোঁজ নিন। আজ আমাকে ডাক্তার দেখতে আসবে।'

তাঁর পুত্র অমল ভট্টাচার্য ডাক্তার, তা ছাড়াও অন্য ডাক্তারের সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল। হাঁপানির টানে উনি কষ্ট পাচ্ছিলেন।

রোগযন্ত্রণা ও ডাক্তারি পরীক্ষার গুরু সংবাদকে তিনি মুহূর্তের

মধ্যেই হাল্‌কা করে দিলেন গল্প বলে। 'জানো না, বুঝি। একজনের খুব অসুখ। ভিন্‌ গাঁয়ের কোবরেজ তাকে দেখতে এসেছে। এসে দেখে রোগী শয্যায় নেই। খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল ? দেখা গেলো, রোগী তালগাছের মাথায় চড়ে কাটারী দিয়ে কেটে কেটে তালশাঁস খাচ্ছে।' হাস্যরোলের মধ্যেই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—'যাই, ডাক্তারদের আর লজ্জা দিতে চাই না।'

চারুচন্দ্র ছিলেন নাট্যরসিক। তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশ ছিল নাট্যলোক। নাট্যকাব-প্রযোজক-অভিনেতা ববীন্দ্রনাথ প্রযোজক-অভিনেতা শিশিরকুমার—বাংলা দেশের এই তৃতীয়বহিত তুই প্রযোজকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

'বসুধারায়' 'সূত্রধব' ছদ্মনামে বারো মাসে লিখলেন 'অথ-নট-ঘটিত।' বাংলা রঙ্গমঞ্চেব দেড় শ' বছরেব ইতিহাস। বইটি বেরুলে এক কপি দিলেন। বললাম, 'সই করে দিন।' গম্ভীর ভাবে বললেন, 'কার বই, কে করে সই।' তাঁর নাম-স্বাক্ষবিত বইটি আজ আমার মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

রঙ্গালয়ের কত গল্পই যে জানতেন। একটি মাত্র ঘটনা বলেই শেষ করছি। এ-ঘটনা কোথাও তিনি লেখেন নি। আজ বিশ্বাস ভঙ্গ করে আপনাদেব বলি। ভরসা আছে, পরমবসিক চারুচন্দ্র ক্ষমা করবেন।

চারুচন্দ্র বললেন, "জানো, একদিন শিশিরবাবু (ভাতুড়ি) বললেন, 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটা বিষয় কবির সঙ্গে আলোচনা করতে যাব। আপনিও সঙ্গে চলুন।"

"বুঝলে, শিশিরবাবুর সঙ্গে এক সকালে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।"

"রবীন্দ্রনাথ এক চেয়ারে বসে আছেন। পাশাপাশি অর্ধবৃত্তাকারে কয়েকটি চেয়ার সাজানো আছে। শিশির বাবু একেবারে শেষের

চেয়ারটিতে বসলেন। হাস্যমুখে রবীন্দ্রনাথ যতই বলেন, 'শিশির, এ দিকে এসো, পাশের চৌকিতে বসো', বিব্রত শিশিরবাবু ততই বলেন, 'না, না, এই ঠিক আছি।' রবীন্দ্রনাথ আবার বলেন, 'আহা। আমি তো জানি তুমি দিনুর বন্ধু। কাছে এসো।' মিনিট দুয়েক এ'রকম চলার পর কাজের কথা হলো।"

দুজনে যখন চলে আসছি, জোড়াসাঁকো-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছি, তখন শিশিরবাবু আমায় বললেন, 'দেখছেন, লোকটার কি আক্কেল? ঠিক বুঝতে পেরেছে।'

আমরা হেসে উঠতেই চারুচন্দ্র বললেন, "বুঝতে পেরেছে? গত রাতের নেশায় খোঁয়ারি না ভাঙতেই শিশিরবাবু চলে এসেছেন। কবি যাতে গন্ধ না পান, সেকারণেই দূরে বসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিনেন্দ্রনাথের বন্ধু বলে উল্লেখ করে ব্যাপারটা তাঁর অজানা নয়, এটাই বুঝিয়ে দিলেন।"

আর-এক দিনের কথা বলি। সেদিনের আড্ডায় ছেলেভুলানো ছড়ার প্রসঙ্গ উঠেছিল। চারুচন্দ্র জানতে চাইলেন, কোন্ ছড়াটি আবালবৃদ্ধবনিতার পক্ষে সমান উপভোগ্য।

দুম্ করে বলে দিলাম, জাদু এতো বড় রঙ্গ।

চারুচন্দ্র একটু হেসে বললেন, তা তো জানি, দুটি শ্লোক বলো দেখি। ভাগ্যিস্, ছড়াটা মুখস্থ ছিল। অবলীলায় বলে দিলাম,—

এতো বড়ো রঙ্গ জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥

চারুচন্দ্র হেসে বললেন, হয়েছে ফুল মার্কস্। আচ্ছা এবার বলো দেখি, রবীন্দ্রনাথের লেখা এই ধরনের ছড়া।

আড্ডায় ছিল 'অগ্নিমিত্র' ওরফে অনিল সেনগুপ্ত। অনিল সঙ্গে

সঙ্গে বলল, স্যর এবার আমি বলি। প্রহাসিনী কাব্যের 'রঙ্গ'ছড়া রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

—ছুটো শ্লোক বলো।

অনিল গদ্‌গদ্ কণ্ঠে আবৃত্তি করল—

এতো বড়ো রঙ্গ, জাহু, এতো বড়ো রঙ্গ।
চাব মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
মিথ্যে ভেল্‌কি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না।
তাহার অবিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না॥

আড্ডার সকলে হেসে উঠলেন।

চারুচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, রবীন্দ্রনাথ আরো একটি 'রঙ্গ' ছড়া লিখেছিলেন। বল তো সেটা কী?

আমরা তো সাত-হাত পানিমে। ভেবে আর পাই না। তখন চারুচন্দ্র বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন, তোমরা কিস্যু জানো না। তবে শোনো।—বলেই গদগদ কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন,—

এতো বড়ো রঙ্গ, জাহু, এতো বড়ো রঙ্গ।
চার চারু দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
তিন চারু সুকিয়া স্ট্রীটে, হাজরা রোডে, ঢাকায়।
তাহার অধিক চারু বন্দী মৃণাল বাহুর শাঁখায়॥

বলে বিজয়ীর হাসি হাসলেন।

আমরা তো অবাক্। কই এটা তো কোথাও পাইনি।

তখন চারুচন্দ্র রহস্যভেদ করলেন।

"জানো, একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই ছড়ার কথাই হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনি মুখে-মুখে এই ছড়াটি রচনা করে শোনালেন।" বললাম, সার্, এটার অর্থ?

—"আহা শোনই না। এবার ভাষ্য করি। প্রথম চারু—সুকিয়া স্ট্রীটের বাসিন্দা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য অর্থাৎ এই অধম। দ্বিতীয়

চারু—হাজরা রোডের বাসিন্দা চারুচন্দ্র দত্ত। আই. সি. এস—যিনি 'পুবানো কথা' লিখেছিলেন। তৃতীয় চারু—ঢাকার বাসিন্দা অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর চতুর্থ চারু—বাড়ি গিয়ে চোখ খুলে দেখো।"

হো-হো করে সবাই হেসে উঠলেন।

বললাম, "স্যর এবাব হাব মানছি।"

আড্ডা ভেঙে দিয়ে চারুচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "কেমন, বলেছিলুম কিনা, তোমরা কিস্স্যু জান না।"

গল্প শেষে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটেব হল্‌দে বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চারুচন্দ্র বললেন, "এ'সব কোথায় পাবে?"

সত্যি তাই, এই গল্প, এই আনন্দ, এই আড্ডা আবার কোথায় পাব? চারুচন্দ্রেব জীবনাবসানেব সঙ্গে সঙ্গে এ'সবেরই অবসান হলো।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈচিত্র্যহীন নীরস গ্রন্থকীট নন, তিনি জীবনরসিক। তাঁর মতো মজলিশী ও ভোজনরসিক বাঙালী একালে আর চোখে পড়ে না। আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য, আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম এবং নানা কমিটিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির তিনি বর্তমান সভাপতি। এই সমিতির সদস্যরূপে তাঁকে খুব কাছের থেকে দেখেছি। একদিনের কথা বলি।

সভাব অধিবেশন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তখনো দু মিনিট বাকি। সভাপতি এসে পৌঁছন নি। সম্পাদক জানালেন. সভাপতিমশায় ঠিক সময়ে আসবেন জানিয়েছেন। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আচার্য হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন,—আমার দেরী হয় নি। আই হ্যাভ্ কাম্ থর্ণ টু থর্ণ।

থর্ণ টু থর্ণ? তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় এসেছেন। হাসি ছড়িয়ে গেল। এক মুহূর্তেই সভার আবহাওয়া বদলে গেল। সভা আরম্ভ হবার আগেই তিনি এই ধরণের আবো কয়েকটি ইংরেজী বললেন। ঃ জ্যাক্‌ফ্রুট ট্রি, অয়েল ম্যুস্‌টাশ্ (গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল)।

ঃ হু-চো টু ডিগ্ ডিগ্, সারপেণ্ট কেম্ আউট বিগ্ (কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুল)।

আচায সুনীতিকুমার জীবনরসিক। ফরাসীতে জীবনরসকে বলে Joic de Vivre। এই রস তাঁর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। সকল বিষয়ে তাঁর সমান আগ্রহ ও অনুরাগ।

প্রথম তাঁকে দেখি দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের লেক রোডের বাসায়। তেইশ বছর আগেকার কথা। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে। পিতৃদেব বললেন, আজ সুনীতিবাবু আসবেন। দুজনের মধ্যে ছন্দ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হবে ও দুপুরে তিনি আমাদের বাসাতেই আহার করবেন। সুনীতিবাবু এলেন। বৈঠকখানায় মিনিট পাঁচেক বসার পর বললেন,—'অমূল্যবাবু, চেয়ার-টেবিলে বসে আমি আরাম পাই না। তাকিয়া-গদি না হলে জুৎ হয় না।'

তৎক্ষণাৎ তাঁকে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হলো। যতদূর মনে পড়ে, ইন্দো-আর্য ভাষার ছন্দ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

দীর্ঘ আলোচনায় হাসিঠাট্টারও অবকাশ ছিল। তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজন। সুক্ত, ঘণ্ট, ভাজা, ঝোল, চচ্চড়ি—কিছুতেই তাঁর আপত্তি নেই। খুব জমিয়ে আড্ডা দিয়ে খেলেন।

সেদিন আমি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছি।

তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ক্লাসে পড়বার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে। তাও আজ এক যুগ আগের ঘটনা।

আচার্য আমাদের ভাষার ইতিহাস ও ধ্বনিতত্ত্ব পড়াতেন। চকটি হাতে উঁচু করে ধরতেন, তারপর এক টানে একটি মানুষের মুখ আঁকতেন। কারো মুখ সংবৃত, কারো বা বিবৃত। মুখের মধ্যে এক টানে জিব আঁকলেন। জিব কখনো তালু দন্ত, কখনো কখনো বা মূর্ধা স্পর্শ করত।

আচার্য শুষ্ক ভাষাবিজ্ঞানী নন, চিত্রশিল্পী ও কথারসিক। নীরস ভাষাতত্ত্বকে সরস করে বোঝাতেন। খুব ভালো লাগত তাঁর ক্লাস। ব্ল্যাকবোর্ড সাদা চকের টানে দৃঢ় গভীর সরল ও বক্র রেখায় শিল্পীর পরিচয় ফুটে উঠত।

মনে আছে, একদিন হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরধ্বনির আলোচনা করছেন। বললেন,—"বাঙালীরা হ্রস্ব স্বরধ্বনির ব্যবহার করে। দীর্ঘ স্বরধ্বনি

চল্তি বাংলায় নেই। সংস্কৃতে ও লাতিনে আছে। আধুনিক ইতালীয় ভাষা ও পঞ্জাবী ভাষায় দীর্ঘ স্বরধ্বনি আছে।”

এই কথাব পর ধ্বনিগত উদাহবণ দিলেন। বললেন, “রোমের রাজপথে দেখেছি ইতালীয় ছোকবাবা খববেব কাগজ ফেবি কবছে—মুখে মুখে দাম হাঁকছে—দো লি—রে (অর্থাৎ দুই লিবা)। আমাদের পঞ্জাববাসীবা দীর্ঘ স্বরধ্বনি ব্যবহার কবেন। যেমন,—এ পাই—অ। ‘পাই’। বাঙালী বিকৃত উচ্চাবণে বলে ‘পাঁইআ’।”

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—চল্তি বাংলায় কি একেবাবেই নেই? আচার্য এক মুহূর্ত থামলেন, চাপা হাসিব আভায় মুখ উজ্জ্বল। বললেন,—“হ্যাঁ, বাংলা ভাষাব প্রকৃতি-বিবোধী দীর্ঘ স্ববধ্বনি আজকাল অনেকে উচ্চারণ কবে। লক্ষ্য কবে দেখো, বালিগঞ্জেব মর্ডান মেয়েবা কী রকম টেনে টেনে কথা বলে।”

এই কথা বলেই ফোন ধবার ভঙ্গীতে ডান হাতটা তুললেন। তারপর মেয়েলী কণ্ঠে বললেন—“মাসিমা, কেম—ন, আ-া-া-ছেন।” পরমুহূর্তেই গম্ভীব কণ্ঠে বললেন, “এই হলো দীর্ঘ স্ববধ্বনি।”

সাবা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল।

মনে পড়ে আব একদিনেব কথা। ডায়লেক্ট-এব আলোচনা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে খাঁটি কলকাত্তাই ভাষা ও লণ্ডন ককনী ভাষার উদাহবণ দিলেন। বললেন, “গিবিশ ঘোষেব নাটকে খাঁটি কল্কাত্তাই ভাষার নমুনা আছে। সে ভাষার ব্যবহাব আজ বিবল হয়ে যাচ্ছে। ‘অমর্ত্তবাজাবেব শিশিববাবু বোজ ঠাকুবেব চন্নামেত্ত খান।’ এব মধ্যে কলকাত্তাই ঢঙটি আছে। লণ্ডনেব ককনী আব লিখিত ইংবেজী এক নয়।” এই কথা বলে উদাহবণ দিলেন, দুটি লণ্ডনী ছোকরা ঘুষো-ঘুষি কবছে,—অঙ্গভঙ্গী করে আমাদের অপরিচিত অ্যাক্সেণ্টে কয়েকটি লণ্ডনী বাক্যি ছাড়লেন।

আচার্য যখন আমাদের ক্লাস নিতেন, তখন তাঁর বয়স ষাট। আজ তিনি বাহাত্তর পেরিয়েছেন। কিন্তু জরা তাঁর মনকে স্পর্শ

করতে পারে নি। তিনি চির-যুবা, প্রবীণ, কিন্তু প্রাচীন নন। এই জন্যই আচার্যদেবের কাছে যখনই যাই, তখনই আনন্দ আহরণ করে ফিরি।

একদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। এক জনের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। আচার্য সুনীতিকুমার বললেন,—"লোকটার জিগালিষা এত প্রবল যে ওর দ্বারা কোনো কাজ হলো না।"

উৎকর্ণ হলাম। জিগালিষা? সেটা কি?

প্রশ্ন করলাম।

আচার্যের উত্তর—"এও জানো না? জিগালিষা বোঝো না? সন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ জানো না?"

তখন জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। বুঝলাম। বাঁচবার ইচ্ছা—জিজীবিষা, জয়ের ইচ্ছা—জিগীষা, হননের ইচ্ছা—জিঘাংসা, জানবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা, শুনবার ইচ্ছা—শুশ্রূষা, তেমনই গালি দিবার ইচ্ছা—জিগালিষা। বুঝলাম, এটা আচার্যদেবেব 'কয়েন'। 'লোকটা এত গাল দেয় যে ওর দ্বারা কোনো কাজ হলো না'—এই হলো অর্থ।

হিন্দুস্থান রোডে 'সুধর্মা' আচার্যদেবের আলয়, আমাদের তীর্থ। অনেকদিন বাদে গিয়েছি। উনি বললেন, আজকাল আর আসো না কেন?

উত্তর দিই—'স্যর, গেটে পুলিশ বসে থাকে, নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে, সেই জন্যেই—।' আচার্যদেব বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সভাপতি, সে-কারণেই তাঁর বাড়ির গেটে পুলিশ প্রহরা। উনি বললেন—'তোমরা তো ছাত্র, সোজা ঘরে ঢুকে পড়বে।' কথায় কথায় বললেন,—'মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরো না কেন? আমি তো পরি। এইভাবেই ক্লাসে যাই, সভাসমিতিতে যাই।'

সবিনয় উত্তর দিই—'স্যর, আপনাকে যা মানায়, আমাদের তা সাজে না।' আচার্যদেবকে বরাবর দেখছি মালকোঁচা মেরে ধুতি

পরতে, কাঁধে একটা চাদর, পাঞ্জাবীর হাত খানিকটা গোটানো। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বললেন।

"জানো, একদিন ট্রামে যাচ্ছি। এক ছোকরাকে দেখলাম। ফুলবাবু। আদ্দির পাঞ্জাবি, সামনের কোঁচা লোটানো। ট্রামটাকে ঝাঁট দিতে দিতে চলেছে। কণ্ডাক্টর বলে, 'ভেতরে আসুন,' কথায় কান দেয় না। মেয়েদের সীটের কাছে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চা নিয়ে কোনো মহিলা ট্রামে চড়েছিলেন। বাচ্চা সেখানেই নিত্যকর্ম করে রেখেছে। ছোকরা অত আর দেখে নি। তাঁর ঝোঝুল্যমান কোঁচাটি বেশ করে সেই বস্তুটিতে নেবড়ে গেল। ট্রাম শুদ্ধ হৈ-হৈ। ছোকরার ডন-জুয়ানী ভাব আর নেই। দুঃখ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি 'গ্লীফুলি' ব্যাপারটা উপভোগ করলুম।" —এই কথা বলে আচার্য হেসে উঠলেন। সে হাসিতে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

আচার্য সুনীতিকুমার শিল্পরসিক। রঙ্গমঞ্চের জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। গিরিশ ঘোষের নাটকের সংলাপ প্রায়ই কথাবার্তায় ব্যবহার করেন। এটা জানা না থাকলে রস গ্রহণে অসুবিধা হয়। একদিন বললেন— "অমুক এসেছিল। বলে, আমাকে দেখে সে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে।" অর্থাৎ অভিভূত হয়েছে। এই ধরণের শব্দ-মুক্তা আচার্য অনবরত ছড়িয়ে চলেছেন। তাঁর মধ্যে এমন 'বয়ান্সি,' এমন ফুর্তিলা-ভাব, এমন চট্‌পটে ভাব দেখেছি, যাতে মনেই হয় না তিনি প্রবীণ মনীষী, সকল সঙ্কোচ দূর করে দিয়ে তিনি আলাপিত ব্যক্তিকে জয় করে ফেলেন।

আচার্যদেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর ডি-লিট্‌ থিসিস—Origin and Development of Bengali Language (১৯২৬)। সংক্ষেপে O. D. B. L. ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের কাছে এখানি বেদগ্রন্থ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করুন, এই অনুরোধ তাঁকে করেছি। তিনি

বলেছেন,—'এদেশে এখন O. D. B. L. ছাপার চেয়ে সরকারী রিপোর্ট ছাপায় আগ্রহ বেশী।' আরো বলেছেন—'এই বই সংশোধন ও পরিবর্ধন করতে চাই। দুচারজন উৎসাহী কর্মী চাই, যারা নিরলস পরিশ্রম করবে আমার সঙ্গে। কোথায় তারা?' নিরুত্তর থেকেছি। এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যথার্থ স্কলার হলো জার্মানরা। দিনে বারো-চোদ্দ ঘন্টা মাথার কাজ করতে পারে। বোধ হয় ষাঁড়ের ডালনা খায় বলেই পারে।' আচার্যদেব এককালে নিজেও এই ধরনের কাজ করেছেন। সম্প্রতি তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন 'সাংস্কৃতিকী' প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। সুনীতিকুমারের মনীষা কত বিচিত্রগামী, তার পরিচয় এই গ্রন্থে পাই। সংস্কৃতির ব্যাপক সংজ্ঞা ও পরিচয় আমরা তাঁর কাছেই পেয়েছি। এই গ্রন্থে যে-সব বিষয়ের আলোচনা করেছেন, তা অনুধাবন করলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। যবদ্বীপের মহাভারত, বৃহত্তর ভারতের রামায়ণ-সাহিত্য, প্রাচীন তামিল গ্রন্থ কুরল্, কোল-জাতির সংস্কৃতি, চীনা ঋষি লাও-ৎসি-রচিত ধর্মগ্রন্থ তাও, সূফী অনুভূতি ও দর্শন, অল্ বিরূনী ও সংস্কৃত, গঙ্গাস্তব-রচয়িতা দরাপ খাঁ গাজী, মেইতেই বা কুকি-চিন্ বা মণিপুর-পুরাণ, শিল্পকলা এবং রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" প্রসঙ্গে বৈদিক উর্বশী, গ্রীক আফ্রোদীতে, সূফী বিশ্বপ্রিয়ার আলোচনা দুই মলাটের মধ্যে বাঁধা পড়েছে। সাগরের মতো বিশাল ও গভীর মনের অধিকারীর পক্ষেই এই আলোচনা করা সম্ভব।

আচার্য সুনীতিকুমার সব রকম আদিখ্যেতা, ন্যাকামি, আর্যামির বিরুদ্ধে। "মি"-প্রত্যয়ান্ত সকল বিকৃতির তিনি বিরোধী। বস্তুতঃ তাঁর মতো সহজ গভীর জীবনরসিক আর চোখে পড়ে না।

ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচ্যামি (Orientalism) সম্বন্ধে সুনীতি কুমারের অভিমত স্পষ্ট। এই সব ন্যাকামি ও ঢঙ্ তিনি বরদাস্ত করতে রাজি নন। 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু)-রচিত গল্পের

তুলনা করে তিনি বলেন, ইয়োরোপের নকলে 'প্রাচ্যামি' অপকৃষ্ট বিকার মাত্র। এ যেন পরশুরাম-দৃষ্ট, বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষিত লোক এবং এমনকি 'জজ মেজিষ্টের মহামহোপাধ্যায়'গণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত 'রেগুেজ ভোঁস্' 'আংগ্লোমোগ্‌লাই কেফ'-এর 'নবতম অবদান'—'কচি ভাইটো-পাঁঠার ইষ্টু', 'মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো', অথবা 'ডবল ডিমের রাধাবল্লভী', কিংবা অতি-আধুনিক বাঙ্গালী সংগীত-স্রষ্টার 'ধ্রুপদী গজল' অথবা 'ঠুংরীর 9th Symphony'।

আচার্য দেবের শিল্পরসিকতার পবিচয় তাঁর 'সুধর্মা'-আলয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সকল ঘরের দবজার মাথায় হিব্রূ, গ্রীক, লাতিন, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক উৎকীর্ণ করা আছে। বিশ্বের তাবৎ সভ্যতার তাবৎ গ্রন্থাদি ও শিল্পসম্ভারে 'সুধর্মা' সমৃদ্ধ। তারি মাঝে এক উজ্জ্বল প্রাণবান জীবনরসিক। তিনি আচার্য শ্রী সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। মেক্সিকো থেকে যবদ্বীপ, আবমেনিয়ার কাব্যকথা থেকে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, রুশবীর ইগোব গাথা থেকে নিগ্রো আর্ট, তাও ধর্মগ্রন্থ থেকে কোল-সংস্কৃতি—সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সুনীতিকুমাব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি ও শ্যাম দেশে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'জাভাযাত্রীর পত্র', সুনীতিকুমার লেখেন 'দ্বীপময় ভারত'।

'জাভাযাত্রীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার সম্পর্কে লিখেছেন—

"আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু এবার দেখলুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ

ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণতঃ, একথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে, শব্দচিত্র তাদের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারের উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নিরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথা সময়ে পড়বে। পড়লে দেখবে এগুলো বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্, বর্ণনা-সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটবড় কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত লিপি-বাচস্পতি কিম্বা লিপি-সার্বভৌম কিম্বা লিপি-চক্রবর্তী।”

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা ভাষা-পরিচয়’ প্রকাশিত হয়; সেটি তিনি ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে উৎসর্গ করেন।

এই প্রবল বিচিত্র সমৃদ্ধ মনীষাকে আমাদের ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে ধরতে পারি না। তবে মজলিশী সুনীতিকুমার তাঁর হার্দিক আলাপচারিতা গুণে ছোটকে কাছে টেনেছেন, অপরিচয়ের বেড়া ভেঙেছেন। তাই তাঁর কাছে আমরা পৌছতে পেরেছি। জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সঙ্গে হাসির গল্প পরিবেশনে সুনীতিকুমার পয়লা নম্বরের ওস্তাদ।

আচার্য সুনীতিকুমার যে কী পরিমাণ রসিক, তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনি জানেন। তাঁর আড্ডায় কত রকমের গল্প শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী সুনীতিকুমার জাভা-বালি-সুমাত্রার নানা গল্প মুখে বলেছেন, যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ রসের কথা কতটা বলতেন ও উপভোগ করতেন, তার নমুনা একদিন আচার্যদেবের কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। সুনীতিকুমার একটু হেসে বললেন, “তবে শোনো :

"সেবার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমরা যখন জাভায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছি, তখন এক স্টেশনে একটি ডাচ্ যুবতী ট্রেনের কামরায় কবির কাছে এসে হাজির। সাজ-পোষাকে উগ্র আধুনিকা, হেসে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে রঙ-ঢঙ করে কথা বলছে। আমরা আর-দুজন সেই কামরায় ছিলাম। মেয়েটির রকম-সকম দেখে আমরা হতবাক্। মেয়েটি এমন ভাবে কথাবার্তা কইতে লাগল যে দেখে মনে হচ্ছিল এক প্রেমব্যাকুলা যুবতী কবির প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছুক, কবির কাছে জীবন যৌবন নিবেদন করে সে ধন্য হয়ে উঠবে। জানো তো, কবি অতিশয় ভদ্র, রূঢ় কথা বলতে পারেন না, মৃদু হেসে দু-একটি কথা বললেন। যুবতীটি তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু আশা করেছিল, কোনো ইশারার আশায় ছিল। তা পেল না দেখে শেষ পর্যন্ত মিনিট দশেক বাদে হাত-ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল।

আমরা যে দু'জন ছিলাম, বিব্রত, বিরক্ত ও স্তম্ভিত হলাম। চুপ করে জানলার বাইরে চেয়ে বসে রইলাম। ট্রেন ছেড়েছিল। কবি ত গম্ভীর, নির্বাক।

হঠাৎ কবি গভীর কণ্ঠে বললেন,—মেয়েটিকে কেমন দেখলে সুনীতি? আমি বললুম,—যাচ্ছেতাই। ওর রঙ-ঢঙ আপনি অতক্ষণ সহ্য করলেন কী করে? কবি মৃদু হেসে বললেন,—মেয়েদের সম্বন্ধে পণ্ডিতরা কঠিন হতে পারে সুনীতি, কিন্তু কবিদের যদি সেই মনোভাব হয়, তাহলে কবিতারও সমাপ্তি ঘটবে, এটা জানো তো?

কী আর বলি! চুপ করে রইলাম। ট্রেন চলেছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। কবি ফের প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বল তো, বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের কোন মেয়েকে কে অমর করে রেখে গেছেন?

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের মেয়ে কোথায়?

কবি আমার দিকে না তাকিয়ে যেন চিন্তার ভাণ করে বলে উঠলেন,—আহা, একটু মনে করে দেখো না।

চুপ করে ভাবছি। কোথায় রে বাবা এমন মেয়ে। হঠাৎ কবির দিকে তাকিয়ে দেখি, কৌতুকে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, নীরব হাসিতে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। গভীর কণ্ঠে বললেন, —আহা, মনে করতে পারলে না সেই মেয়েটিকে, যার সঙ্গে এর তুলনা চলে! বিদ্যেসুন্দর পড়েছ তো? এর হাবভাব দেখে কেমন মালিনীমাসী, মালিনীমাসী ভাব মনে হচ্ছিল না?

কবির সঙ্গে আমরা হেসে উঠলুম।”

গল্প শুনে হেসে উঠলুম। সুনীতিকুমার বললেন, “এই ধরনের আর একটি ব্যাপার ঘটেছিল শান্তিনিকেতনে কবির সামনে, তবে সেবার কবি জবাব দেন নি, দিয়েছিলেন রসিকচূড়ামণি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মশাই।

একবার উদয়নে কবি কয়েকজনকে নিয়ে বসে আছেন। নানা কথা হচ্ছে। হঠাৎ একটি মেয়ে উপস্থিত। মেয়েটি গায়ে-পড়া, অতি-বাচাল বেহায়া। এসেই কবিকে প্রণাম করে এমনভাবে ‘দাছু দাছু’ করে বেহায়াপনা করতে লাগল যে বিশ্বকবিও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে মেয়েটি বিদায় নিল। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ব্যাপারটা এত যাচ্ছেতাই যে তার পর আর কেউ অন্য কোনো কথা শুরু করতে পারেন না।

কবি গভীর কণ্ঠে অন্তরঙ্গদের প্রশ্ন করলেন, মেয়েটিকে কেমন মনে হ'ল? কেউ আর জবাব দেন না। অস্বস্তিতেই সবাই চুপ। কিন্তু কি জবাব দেওয়া যায়। শাস্ত্রী মশাই সেখানে বসেছিলেন। তিনি হঠাৎ হাতজোড় করে বলে উঠলেন, দেখুন, যদি বেয়াদপি মাপ করেন, তাহলে বলি, ওকে, দেখে আমার কি রকম মনে হচ্ছিল।

কবি মৃদু হেসে বললেন, এখানে তো বাইরের কেউ নেই, আপনি অসঙ্কোচে যে কোনো কথা বলতে পারেন, কিছু মনে করব না।

তখন শাস্ত্রী মশাই বলে ফেল্লেন, দেখুন মেয়েটিকে দেখে আমার শুধু মনে হচ্ছিল, একেবারে যেন মাইরি-মাইরি কর্ছে।

কবি সে কথা শুনে সেদিন এত জোরে হেসে উঠেছিলেন যে সাধারণতঃ ওভাবে তাঁকে হাসতে দেখা যেতো না।"

গল্প শুনে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হ'ল। যতবারই শাস্ত্রী মশায়ের ব্যাখ্যান মনে পড়তে লাগল ততবারই হাসি ফেনিয়ে উঠতে লাগল। সেদিন আচার্যদেবের সঙ্গে প্রাণখুলে অনেকক্ষণ হেসেছিলেম।

হাসতে হাসতেই আচার্য বললেন,—'শ্যামদেশে ভারী মজা হয়েছিল। আমরা তখন বাংককে। শ্যামদেশে শেষ দিন। পবদিনই ফিরব। ঐদিন বিকেলে বাংককের ভোজপুরে বাসিন্দাদের বিষ্ণু-মন্দিরে কবি গিয়েছিলেন, সঙ্গী একমাত্র আমি। বাকি সঙ্গীবা তল্পি-তল্পা বাঁধছেন। বাংককের শহরতলীতে এই বিষ্ণু-মন্দির। গিয়ে দেখি মন্দিবের আঙিনায় তিন-চাব শ' লোক হাজির। বেশির ভাগই আমাদের 'ভৈয়া-লোগ', ভোজপুবী দেশওয়ালী। এরা ইংরিজির ধার ধারে না। মহা মুশ্‌কিল। কবি কিন্তু বাজারূ হিন্দীতেই দু-চার কথা বললেন। মনে হল, এবা আবো কিছু শুনতে চায়। বিদেশে এসে ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ আব জাতির সম্মান-সম্বন্ধে কবি সাধারণ ভাবে দু-একটি কথা বললেন। তখন একজন পঞ্জাবী ঠিকাদার এসে কবির কাছে বললেন,—"অগর হুজুরকী ইজাজৎ হো, তো মৈঁ আপ্‌কী অঙ্গরেজী তক্‌রীর-কো হিন্দোস্তানী-মেঁ তর্জুমা কর্‌কে ইন্‌হেঁ সুনা দূঙ্গা—ইয়ে লোগ, আপ দেখতে তো হৈঁ, জ্যাদাতর জাহেল ঔর অন্‌পঢ় হৈঁ।" এই চোস্ত উর্দু শুনে আমরা একটু কিনারা পেলুম। তখন কবি ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। খানিকটা করে তিনি বলেন, আর এই ঠিকাদার-ভদ্রলোক তর্জমা করে যান। দেখলুম, ব্যাপারটি তেমন সুবিধার হ'ল না। একদিকে কবির ভাব আর অন্যদিকে এই ভদ্র-লোকের বিদ্যাবুদ্ধি আর ইংরিজির জ্ঞান, এই দুই-ই তেমন উচ্চ

কোটির নয়, আর বেশী গোলমাল ব্যাপার দেখলেই তর্জমাকারী সাঁটে স্থূলভাবে বলতে আরম্ভ করলেন। তার ফল হল যেমন হাস্যকর তেমনি হৃদয়বিদারক।"

মজলিশী-কথক একটু থামলেন, চোখের সামনে হয়ত বা বাংককের শহরতলীর সেই বিষ্ণু-মন্দিব আঙিনাব দৃশ্যটি দেখলেন, ১৯২৭-এর অক্টোবরের সেই সন্ধ্যাব কথা মনে পড়ল। তারপর শ্রুতিধর সুনীতিকুমাব একটু হেসে ফের শুরু করলেন—

"ইংরিজিতে বলতে-বলতে কবি এক জায়গায় বিশ্বভারতী বিদ্যালয় সম্পর্কে এই ধবনেব একটা কথা বললেন—"My idea has been to establish in some place in our country a centre of study and research, where foreigners, who want to participate in the spiritual feast left by our ancestors, may stay with us as honoured guests, and receive whatever they can take from us and what India ha › to give ; and at the same time, we would also claim it as our right to receive from them the best they have to offer from their own culture, their own thought and idea." এর অনুবাদ পঞ্জাবী ঠিকাদারদের মুখে সংক্ষেপে এই বকম হ'ল—ং রব দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তাঁব প্রতি শ্রোতাদেব দৃষ্টি এই ভাবে আকর্ষণ করে, ইনি বললেন, "আপ রাবিন্দর-নাথ টেগোর কহ্‌তে হৈঁ কি, পরদেশী তালিমে-ইল্‌মোঁ-কে লিয়ে এক হোটাল বনায়েঙ্গে, তাকি ওয়ে আকর কুছ ইল্‌ম্ হাসিল কর্ সকেঁ।" তাঁর বিশ্বভারতী স্থাপনের এই ব্যাখ্যা কবি শুনে চমকে উঠলেন, আর আমার দিকে একবার কাতর-ভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। আর আমি? আমি অপরাধীর মত মাথা নীচু করে রইলু । কবি তখন যথাসম্ভব শীঘ্র, নমো নমঃ করে তাঁর এই "আঙ্গরেজী তক্‌রীর" শেষ করলেন।

কিন্তু এতেই উপস্থিত জনগণের উৎসাহের সীমা নেই। এদের মধ্যে এক ধনী ভোজপুরিয়া ভদ্রলোক—মাতব্বর ব্যক্তি, বেশ জোর গলায় সমবেত ভাইদের ঠাকুরজীর "বিস্-ভারতী বিস্-বিদিয়ালে"-র জন্য চাঁদা দিতে অনুরোধ করলেন। এরা বেশীর ভাই অল্প পুঁজির লোক। কিন্তু এখান থেকে এক টিকল, ওখান থেকে দু টিকল, দূর কোণ থেকে চার-পাঁচ টিকল করে মুদ্রা পড়তে লাগল। দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আবার তারস্বরে হিন্দীতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন —"ভাই লোগ, বিদ্যা-দান সে বঢ়কর পুন্ নহী হৈ—আপনী শক্তিকে মুতাবিক দান করো।" এইভাবে প্রায় মিনিট দশের মধ্যে ১৭০।১৮০ টিকলের মতো চাঁদা বিশ্বভারতীর জন্য এঁরা তুলে দিলেন, বেশিব ভাগ দু-চার টাকার দানে। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, "পুরো দুই শ' টিকল না হলে আমাদের বাংকক্ শহরের হিন্দুদের দুর্নাম হবে।" তখন স্থানীয় দু-জন ভদ্রলোক বাকী টাকা দিয়ে দুই শ' টিকল পুরো করে দিলেন।

কবি যখন ঐ স্থান থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর চারিদিকে দর্শনার্থীদের ভীড়। তারা দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে এবং মাথা হেঁট করে ওঁকে প্রণাম জানাল। এদের সহৃদয়তা ও আন্তরিকতায় কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি প্রসন্ন হাসি হেসে বিদায় নিলেন। আমরা যখন মোটরে এসে বসলুম, তখন কবি আমাকে কেবল এই কথা বললেন,—'লোকগুলির হৃদয় ভালো, কিন্তু শেষটায় এরা আমাকে হোটেলওয়ালা করে ফেললে হে।'

মজলিশী কথক থামলেন। হোটেলওয়ালা রাবিন্দর-নাথের কথা ভেবে প্রাণখুলে হাসলাম। আচার্যদেবও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

বিধুমণ্ডলীর অন্যতম আচার্য সুনীতিকুমার বিশ্ববরেণ্য মনীষী, কিন্তু আমাদের মতো সামান্য মানুষের কাছেও ধরা দিয়েছেন। আড্ডাধারী সুনীতিকুমার শতায়ু হোন।

পরিমলকুমার ঘোষ

পরিমল এক নয়, দুই। একজন পরিমল গোস্বামী, অপরজন কবি অধ্যাপক পরিমল কুমার ঘোষ। 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'উপাসনা', 'প্রতিভা', 'ভারতবর্ষ' পত্রের নিয়মিত লেখক, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দীপিকা' ও 'প্রাচী' পত্রের সম্পাদক পরিমলকুমার ঘোষ কাব্যসংসার থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র, গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, নাটোর-রাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্র মোহন বাগচীপ্রমুখ সাহিত্যসেবকদের প্রীতি ও স্নেহ অর্জন করেছিলেন পরিমলকুমার।

জীবনেব শেষ পর্বে (১৯৪১-৬০) তিনি দক্ষিণ কলকাতায় বাস করতেন। এই সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তই তাঁকে লড়াই করতে হত। শয্যাবন্দী হয়ে বাইরের চলমান সংসার থেকে নির্বাসনের দুঃখ ভোগ করতে হত। তথাপি এক দিনের জন্যও তাঁর মুখে দয়াহীন সংসারের প্রতি ক্ষোভ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনি নি।

শুয়ে শুয়েই তিনি লেখাপড়া করতেন। সংসারের সঙ্গে যোগ রাখতেন আর আড্ডা দিতেন। বর্তমান সাহিত্যস্রোত থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পুরনো দিনের শত সহস্র সাহিত্যস্মৃতি তিনি বলে যেতেন, পুরনো সাহিত্য-সতীর্থদের দেখতে চাইতেন, আর বাইরে উদাসীন নিষ্ঠুর পৃথিবী তাঁকে ভুলে গিয়েছিল।

আজো মনে পড়ে তাঁর প্রসন্ন আনন, অভ্যর্থনায় কোমল দুটি চোখ, তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর। নরম গলায় নিভৃত আলাপেব ঢঙে তিনি পুরনো দিনের কথা বলতেন—ঢাকা থেকে কলকাতা, মুন্সীগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য স্নেহাশ্রয় ছিল, সে-সব কথাই বলতেন।

"জানো, সেবার ভারী মজা হয়েছিল। মুন্সীগঞ্জে সে বছর ষোড়শ বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন হচ্ছে। অভ্যর্থনা-সমিতিব পক্ষ থেকে সাহিত্যিকের কাছে আমন্ত্রণলিপি আমবা পাঠিয়েছি। সম্মেলনেব সভাপতি ছিলেন নাটোরেব কবি-মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, আব সাহিত্যশাখার অধিনায়ক ছিলেন শবৎচন্দ্র। জলধব-দা'কে তো চেন?"

ঘাড় নেড়ে জানাই, হাঁ।

কবি পুনরায় বলতে থাকেন, "কি কারণে জলধরদা'র কাছে সম্মিলনের আমন্ত্রণ সময় মত পৌঁছয় নি। অধিবেশনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ খবর এলো, 'দাদা' আসবেন না। সর্বনাশ! বাংলাদেশে বা বাংলার বাইরে বোধ হয় বাংলা সাহিত্যেব এমন কোনো সভা হয়নি, যাতে জলধরদা উপস্থিত ছিলেন না। সম্মিলনেব কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, চিঠিতে, লোক মারফৎ অনুবোধ চলল, কিন্তু 'দাদা'র এক কথা, 'বুড়ো হয়ে গেছি, না পারি লিখতে, না পারি বলতে, তাই সবাই ভুলে যাচ্ছে। এই অকেজো অথর্বকে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া কেন?"

পরিমলকুমার আলগোছে মুখে একটু জর্দা ফেলে দেন। কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলে চলেন, "বুঝলাম, ব্যাপার সঙ্গীন,—মুন্সীগঞ্জের অজ্ঞানকৃত উপেক্ষা দাদা'র কোমল প্রাণে কতখানি বেজেছে। জানো তো, জলধরদা বড়ো অভিমানী ও স্নেহাসক্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের উপরোধে তখন আমি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলাম, এবাব আমন্ত্রণ, ক্ষমা প্রার্থনা, অনুরোধ নয়,—একেবারে নিছক

আবদার—আসতেই হবে, নয় তো সব ফেলে ছড়িয়ে চলে যাব, যা হয় হোক্।

অবিলম্বে জবাব এলো, 'যা লিখেছ, এরপর আর কি করে না গিয়ে পারি ভাই? কিন্তু কেন আর এ বুড়োকে নিয়ে টানাটানি? যাচ্ছি বটে, তবে কারো অনুরোধে নয়,—শুধু তোমার আবদার ঠেলতে পারলুম না, তাই।'—জানি, শেষ পর্যন্ত আসতেন তিনি নিশ্চয়, সাহিত্য-সম্মেলনে না এসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত। আমার মত সামান্য অভাজনকেও জলধরদা কত ভালবাসতেন। সেকথা মনে করে আজো আনন্দ পাই।"

উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করি—'তারপর কী হ'ল?'

বক্তা একটু হেসে বলেন, "শেষ পর্যন্ত চাদর ও চুরুট-শোভিত নবজলধরকান্তি জলধরদা এলেন মুন্সীগঞ্জে 'নাটোর', শরৎচন্দ্র আর জলধরদা—তিন চন্দ্রে আসর জমে উঠল। এক সন্ধ্যায় অধিবেশনের ফাঁকে রসালাপ হচ্ছে। তিন জনের মধ্যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ। আমরা দুয়েকজন উপভোক্তা। সুরসিক মহারাজ (জগদিন্দ্রনাথ) বলছেন, 'দু পাশে সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল। মাঝখানে বসে সভাপতি একেবারে 'বকো যথা'।'

জলধরদা সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দিকে ইশারা করে উত্তর দিলেন, 'দিকপাল ওই একপাশেই। আমি তো আছি পঙ্গপাল নিয়ে। শরৎ যেদিন থেকে কলম ধরেছে, সেদিন থেকে আমরা সব মিইয়ে গেছি। ওর মনে যে এই ছিল, তা কে জানতো!'

একটু হেসে শরৎচন্দ্র সকৌতুকে বলেন, 'দাদা, লেখা কি আর এম্‌নি হয়?'—তারপর 'কি করলে' লেখা আসে তার এক তালিকা!—'এই - করেছেন? এই—খেয়েছেন? এই—এই অভিজ্ঞতা আছে? এই - জায়গায় গিয়েছেন? এই—জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখেছেন?' দাদা ভারী কুণ্ঠিত হয়ে ক্রমাগত ঘাড় নাড়ছেন—না! না!—শরৎচন্দ্র তখন শেষ অস্ত্র ছাড়লেন, 'তবে কি করে লিখবেন

বলুন।' আমরা সবাই অট্টহাস্য করে উঠি। দাদা শুধু বললেন, 'তা বটে।'

আর-একদিনের আড্ডা। সকালের রোদ ঘরে এসে পড়েছে। শয্যাশায়ী কবি অতীত-রোমন্থন করছেন। মাঝে মাঝে জর্দা পান খাচ্ছেন, আর গল্প বলছেন।

"শরৎচন্দ্রের কথা অনেক বলতে পারি। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। জানো আমাকে তিনি তাঁর একটি অপ্রকাশিত গল্পের পাণ্ডুলিপি দান করেছিলেন, বলেছিলেন, পরিমল, এটা তোমার।"

শুনে আফশোষ হয়, বললাম,—'সে পাণ্ডুলিপি কোথায়?'

মৃদুহাস্যে কথক বলেন, 'বহু মূল্যবান দ্রব্য নষ্ট হয়েছে। সেটিও গেছে। ঢাকা থেকে চলে এলাম। সব-কিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের দু'একখানি চিঠি মাত্র আছে।' ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাজে-শিবপুর থেকে লেখা একটি চিঠি দেখালেন। বললেন, "জানো, প্রথম যেদিন বাজে-শিবপুরের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন কী কাণ্ড!"

পত্রালাপে দিন ঠিক করে এক সকালে গিয়েছি। অনেক খুঁজে খুঁজে একটি সরু গলি পেলাম।

সেদিকেই শরৎচন্দ্রের বাড়ি। একটু এগিয়েই দেখি, এক অপূর্ব দৃশ্য। সরু রাস্তায় লুঙ্গি-ফতুয়া পরে শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ফর্‌সির নল। পেছনে চাকর ফর্‌সি হাতে। শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে তামাক টানছেন, আর ধূমপানের অবসরে সামনে-দাঁড়ানো এক কুণ্ঠিত ব্যক্তিকে যা-নয় তাই করে ধমক দিচ্ছেন। সে ধমকের অনর্গল স্রোতের বেগে শ্রাব্য-অশ্রাব্য প্রাকৃত বাংলা 'বুলি' বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখেই হঠাৎ স্বরগ্রাম খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'এই যে পরিমল, তুমি এসে গেছ, ঘরে গিয়ে বসো। আমি এখুনি আস্‌ছি।' বলেই আগের মতো অগ্নিশর্মা হয়ে আবার সেই

অনর্গল প্রাকৃত বাংলা 'বুলি' ছাড়তে আরম্ভ করলেন। হতবাক্ হয়ে শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় এসে বসলাম। খানিক বাদে শরৎচন্দ্র এলেন।

বললাম,—'দাদা, কি ?' উত্তর দিলেন—'আরে, ও কিছু না। ব্যাটাকে একটু শাসিত করে এলাম।' শুনলাম উক্ত প্রতিবেশীর অপরাধ তিনি শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর ভেলীকে তাড়না করেছিলেন। সেদিন সারা দুপুর শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ছিলাম। দুপুরে বৈঠকখানায় শুয়ে শুয়ে দুজনে অনেক গল্প করলাম। দিনের শেষে যখন ফিরে এলাম তখন শরৎ-স্নেহে স্নাত ও স্নিগ্ধ হয়েছি।"

উৎসাহিত হয়ে বলি, "শরৎচন্দ্রের কথা আরো কিছু বলুন।"

কথক পুনরায় বলতে থাকেন, "যে চিঠিটি সেদিন তোমাকে দেখিয়েছি, ওটি শরৎচন্দ্র আমাকে ১৩৩২ সালে লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রিয়তম কুকুর ভেলীর মৃত্যুর পর লেখা এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন,—শোনো—'তোমাদের ওখান থেকে এসে পর্যন্ত বড় দুঃখ পেলাম। আমার পুত্রাধিক প্রিয় কুকুরটি গেল মরে, মৃত্যুর আগের দিন ওষুধ খাওয়াবার জবরদস্তির চোটে সে দিল আমাকে কামড়ে—যত বন্ধুবান্ধব মিলে টেনে নিয়ে গেল কুকুর-কামড়ানোর Injection দিতে, সমস্ত পেটময় ২৮টি Injection—সে এক বীভৎস ব্যাপার!' এই ভেলীকে দেখেছি। শরৎচন্দ্রের মতে ভেলী খুব ভদ্র শান্ত কুকুর, আর আমাদের মতে অতি অভদ্র অশিষ্ট কুকুর। অথচ শরৎচন্দ্রকে এ'কথা বললে তিনি ভবিষ্যতে আর মুখদর্শন করবেন না।"

হাস্যরোলে সেদিনের আসর শেষ হ'ল।

আর—একদিনও শরৎচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। কবি বললেন, "জানো, শরৎচন্দ্রকে একটি শাঁখ আর ঝিনুক উপহার দিয়েছিলাম। ঝিনুকের ওপরে শরৎচন্দ্রের নাম খোদাই করে দিয়েছিলাম। উনি খুশী হয়েছিলেন খুব। শাঁখটি তাঁর লেখার জলচৌকির ওপরে রেখে-

ছিলেন। জানো তো শরৎচন্দ্র খুব শৌখীন ছিলেন। লেখার সরঞ্জাম পরিপাটি হওয়া চাই, দশ-বারোটা কলম তৈরী থাকা চাই, মসৃণ কাগজ চাই,—তবে তিনি লিখতে বসবেন। আবার যদি মেজাজ না আসে, তবে লিখবেন না। পাশে বসে রচনারত শরৎচন্দ্রকে দেখেছি। হাতের লেখা মুক্তোর মতো। ধীরে ধীরে লিখতেন। বলতেন, 'পরিমল, রচনা ভাল হওয়াই যথেষ্ট নয়, হাতের লেখাটাও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই।'

পরিমলকুমার শরৎচন্দ্রের অনুরক্ত ছিলেন। তার পরিচয় বহু গল্পে পেয়েছি। শরৎচন্দ্রের রসিকতা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কত গল্পই না তাঁর কাছে শুনেছি।

এক দিনের কথা। শায়িত অবস্থায় পরিমলকুমার কথা বলছেন। একটু হেসে বললেন, "শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের সেই অংশগুলি নিশ্চয়ই মনে আছে, যেখানে রাসবিহারী-চরিত্রের নির্মম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল বলে শুনেছি। এবিষয়ে শরৎচন্দ্র একটি গল্প বলতেন। সেটি আজ তোমাকে বলি।

"শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, একবার কলকাতার এক উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মবাড়িতে নির্মন্ত্রণ পেলাম। যাব কিনা সেটা সমস্যা। যদি যাই কিছু অপ্রীতিকর ঘটতে পারে; আর যদি না যাই, বলবে, ভয়ে এলো না। শেষ পর্য্যন্ত চলেই গেলাম। তারপর গিয়ে দেখি এলাহী ব্যাপার। বিরাট ডিনার-টেবিল, প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য, প্রচুরতর আপ্যায়ন। টেবিলের মাথায় একটি অতি-মূল্যবান সুদৃশ্য চেয়ার। মহিলারা সেটাতেই আমাকে নিয়ে গিয়ে মহাসমাদরে বসালেন। তারপর ভালো ভালো কথা, সুন্দর সুন্দর বিশেষণ আমার ওপর বর্ষিত হলো। তারপর সেই বিরাট আহার-পর্ব শুরু হ'ল।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার তাকিয়ে দেখি বাঁ দিকে একটি রূপোর থালায় আমারই একখানি বই খোলা অবস্থায়, একটি পাতায়

কয়েকটি বাক্য লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া। একটু উঁকি মেরে দেখি, বইটি 'দত্তা' যেখানে রাসবিহারী তার প্ল্যান মাটি হয়ে যায় দেখে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেকে তাড়না করছে, বিজয়াকে অভি-সম্পাত দিচ্ছে, সেই জায়গাটা। বুঝতেই পারছ! আমি যেন ওটা দেখতেই পাইনি, এমন ভাব নিয়ে খেলাম, গল্প করলাম, চলে গেলাম। ওই বেহ্ম মহিলারা ভেবেছিলেন, ওইভাবে আমাকে জব্দ করবেন। হুঃ।"

কথক থামলেন। শরৎচন্দ্রের সেই বেকায়দা-অবস্থা কল্পনা করে বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েই হাসলেন।

কবি পরিমলকুমার রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম। কুমুদ-রঞ্জন-করুণানিধান-কালিদাসের সতীর্থ পরিমলকুমার বন্ধুবৎসল ছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন 'অনেকদিন ওঁদের দেখি না, দেখতে ইচ্ছে করে।' নবীনদেরও তিনি বন্ধু-সহায়ক ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত তাঁরই হাতে-গড়া ছাত্র, তাঁদের প্রথম কবিতা পরিমল-কুমারের উৎসাহে মুকুলিত হয়। তবে কবি বেশী গল্প করতেন 'মানসী ও মর্মবাণী'-ভারতী গোষ্ঠী সম্পর্কেই। এমন কি গল্পের আসরে নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ ও গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছিলেন।

কবি পরিমলকুমার বলতেন, "নাটোরের মতো উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল রসিক খুব কম দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ ওঁকে খুব পছন্দ করতেন। নাটোর পাখোয়াজ বাজাতেন খুব ভালো, মিষ্টি কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জমিদারের দম্ভ তাঁর মধ্যে ছিল না, সত্যিকারের বিদগ্ধ রসিক বন্ধু বলে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।"

একটু থেমে কবি চোখ বুজে বুঝি-বা সেই পুরনো সুখের স্রোতে অবগাহন করলেন, এক পলকের মধ্যে তিরিশ বছর ঘুরে এলেন, তারপর স্বগতোক্তির ঢঙে বলতে থাকেন, "আমি তখন ঢাকায়।

সেখানে পড়াই। বছরে পাঁচ-ছ'বার কাজে-অকাজে কলকাতা আসি। একবার এসে উঠেছি গ্রে স্ট্রীটেব কাছাকাছি। নানা জরুরীকাজেব চাপে পড়ে আর মহারাজার কাছে যেতে পারি নি। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় দেখি আমাদের সরু গলির মধ্যে এক বিশাল মোটর এসে ঢুকল। ঠিক, যা ভেবেছি তা'ই। নাটোব গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে ধরে নিয়ে যাবাব জন্য। আমারই আগে গিয়ে দেখা করা উচিত ছিল। শশব্যস্ত হয়ে ছুটলাম।

"ল্যান্সডাউন বোডে নাটোর-প্রাসাদে পৌঁছে দোতলাব সিঁড়ি বেয়ে ওপবে উঠেই দেখি, মহারাজ একা বসে আছেন প্রশস্ত বারান্দায়। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই হেসে বললেন, 'তুমি কলকাতা এসেছ খবর পেয়েছি ; মনে কবেছিলাম এখানেই আসবে। এলে না, তাই লোক পাঠিয়ে ডাকতে হল। বোস। প্রভাতকে খবব দিয়েছি, সে এখুনি আসবে। তোমাব সঙ্গে আমাদের অনেক বোঝাপড়া আছে। তুমি তো জান, আমি 'মানসী ও মর্মবাণী'র নিজস্ব লেখক দল গড়তে চাই। তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

আমি খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলাম। তাবপব খানিকক্ষণ একথা-সেকথার পর সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ শব্দ শুনে সাগ্রহে তাকিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবী পবিহিত এক বিপুলকায় বাঙালী ভদ্রলোক উপরে উঠে আসছেন। এই কি সেই ব্যাবিষ্টার প্রভাতকুমার ! মনে পড়ল কবির কথা—'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো।'

মহারাজ পরিচয় করিয়ে দিলেন। নমস্কাব বিনিময়ের পর প্রভাতকুমাবের অতি গম্ভীর মুখে অতি-মৃদু হাসিব বেখা ফুটে উঠল। বললেন, 'এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছেন, দেখি কেমন করে এড়িয়ে থাকবেন।' অবাক হয়ে ভাবলাম, এঁর ভিতরেই এত অজস্র হাসি, উদার সহানুভূতি ! 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পাল, 'বলবান জামাতা'ব নলিনী, 'নিষিদ্ধ ফলে'র রায়বাহাদুব, 'রসময়ীর রসিকতা' যে এঁরই লেখনী-সৃষ্ট, সেই মুহূর্তে একথা ধারণা করা কঠিন হয়েছিল।

তারপর আরম্ভ হল বিশুদ্ধ আড্ডা। মহারাজের সরস বাক্যালাপে প্রভাতকুমারের বাহ্যিক গাম্ভীর্য যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল, আর ভিতরকার মানুষটির সত্যিকারের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল অজস্র রসমধুর রহস্যে ও নানা বিষয়ের বিচিত্র আলোচনায়। আমার সমস্ত কুণ্ঠা মুহূর্তে বিদূরিত হল। দু'জনে বাক্-প্রতিযোগিতায় নামলেন। রঙ্গরস শেষে বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণে মুখরিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে মহারাজের ইঙ্গিতে আমার জন্য চা আর নানারকমের খাবার এলো। মহারাজ নিজে কিছুই খেলেন না।"

এই পর্যন্ত বলে পরিমলকুমার একটু থামলেন। দুটি ছোট পান একটু জর্দা দিয়ে খেলেন। জর্দা ও ধূপের গন্ধে পরিবেশ বিচিত্র সুরভিতে ভরে উঠল।

থাকতে না পেরে বললাম, "সে কি, কেবল আপনার জন্য চা খাবার। আর প্রভাতকুমারের জন্য?"

পিকদানিতে পিক ফেলে একটু হেসে কথক শুরু করলেন আহা সে কথাতেই তো আসছি।

প্রভাতকুমারের জন্য বন্ধুবৎসল মহারাজ আনিয়ে দিলেন বিলেতী সোমরস। সুধাপানে প্রভাতকুমারের হৃদয় আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, মনের দুয়ার খুলে গেল, শুরু হল নানা গল্প, যার শেষ নেই। ওদিকে সন্ধ্যা বিদায় নিয়েছে, রাত এগিয়ে চলেছে। নানা কথার মধ্যে প্রভাতকুমার একটা কথা বলেছিলেন। শুনে রাখো। 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে কাশ্মীরের পথঘাট নিসর্গের চমৎকার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রভাতকুমার কবুল করলেন তিনি নিজে কখনো কাশ্মীর যান নি।

একটা প্রসঙ্গ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা হচ্ছিল। চরিত্র-চিত্রণে বাস্তব ও কল্পনা কতটা করে থাকবে। আমরা তিনজনেই আপন মত প্রকাশ করছিলাম। প্রভাতকুমাব শেষ পর্যন্ত বললেন, "দেখুন, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা মনের ওপর যে ছায়াপাত করে, তারই

উপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে গল্পের চরিত্র এঁকে যাই। সব নির্ভর করে মনের ভিতরকার ছবিটির ওপর। 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পাল যে নিছক কল্পনা নয়, এ অনায়াসে অনুমান করতে পারেন।'

মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বলবান জামাতা'র নলিনীর চিত্র যে আত্মজীবনীমূলক নয়, এ-কথাটি অতি সহজেই অনুমান করা যায়।'

প্রভাতকুমাবেব দেহায়তন লক্ষ্য করেই এই সরস মন্তব্য। আমরা তিনজনেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরে তুললাম।"

বক্তা একবার চোখ বুজে সেই আনন্দ-দৃশ্যটি মনে মনে দেখলেন। তারপর বললেন, "এদিকে রাত দশটা বেজে গেছে। এগারোটার কাছাকাছি ঘড়ির কাঁটা। প্রভাতকুমাবের কথা মন্থর, তন্দ্রাজড়িত। মহারাজও যেন পরিশ্রান্ত। বিদায়ের জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। মহারাজ বাধা দিলেন, 'এত তাড়া কিসের? Night is young yet, চল গাড়ীতে গঙ্গাব ধাবে বেড়িয়ে আসা যাক্। কাজের কথাই যে এখনো হয় নি। গাড়ীতে হবে' খন'।

"করজোড়ে সেদিনকার মত বিদায় চাইলাম, প্রভাতকুমার অনুকূল হয়ে বললেন, 'আজ থাক্, আর একদিন হবে।' মহাবাজ সম্মতি দিলেন। প্রণাম কবতেই সকৌতুক গাম্ভীর্যে বললেন, 'আমি শ্রেষ্ঠ বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণ, প্রাতঃস্মবণীয় বাণী ভবানীর বংশধর। আমার গা ছুঁয়ে বলো, কোনো লেখা আমাকে না বলে কোনো কাগজে পাঠাবে না, আর ভাল লেখা পেলেই 'মানসী ও মর্মবাণী'র জন্য সংগ্রহ কববে।'

"নতমস্তকে বললাম, 'গা ছুঁয়ে নয়, পা ছুঁয়েই বলছি, আপনার এ স্নেহের আদেশ মনে থাকবে।"

এতক্ষণে কবি থামলেন। তিরিশ বছর আগেকার বাংলা সাহিত্যের সামাজিক জীবনের চলচ্ছবি এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। এবার চমক ভাঙ্গল।

পরিমলকুমার কলকাতা ও ঢাকায় সাহিত্যস্রোতে একদিন ভেসে

ছিলেন। ঢাকা থেকে সাহিত্যপত্র বার করবেন। প্রথম সংখ্যায় কবিতা চাই, শুধু তাই নয়, কাগজের একটা ভালো নামও চাই,— এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্নেহের দাবী পাঠালেন। দিন কয়েকের মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে ঢাকায় আশীর্বাদ এসে গেল। 'কাগজের নাম দাও—'দীপিকা'। সেই সঙ্গে 'দীপিকা' নামে একটি কবিতা। সেই কবিতা ব্লক করে প্রথম সংখ্যাব প্রথম পাতায় ছাপালেন। সে আনন্দের দিন চলে গেছে। কবির মনে হয়েছে, সাহিত্যসংসারে সেই প্রীতি ও দাক্ষিণ্য, অপরিমেয় উদারতা ও স্বাভাবিক সারল্য, ভক্তের প্রণতি ও তপস্বীর ধ্যান আজ আর নেই। এ'কথার উত্তর নেই বলেই চুপ করে থেকেছি। পুরনো দিন অবসিত, পুরনো বন্ধুরা অন্তর্হিত। এখন নবীন যুবা কাশীনাথেব দল গান গাইছেন। বুড়ো বরজলাল অপসৃত হয়েছেন। কিন্তু সেদিনের সেই প্রীতিসুধারস কি আজ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে?

কবি পরিমলকুমারকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পবিত্রদা ওরফে শ্রীপরিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কে না চেনে! ছেলে বুড়ো জোয়ান প্রৌঢ়—সকলেরই তিনি বন্ধু, সর্বজনের পবিত্রদা। পবিত্রদার সর্বজনীনতার মূলে আছে তাঁর মানসিক যৌবন। গত তিন যুগের বাংলা সাহিত্যআন্দোলনের সকল তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সাহিত্যসংসারেএকমাত্র পবিত্রদাই বলতে পারেন—

> চুলে আমার পাক ধরেছে বটে,
> তাহার প্রতি এত নজর কেন ?
> পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো আছে,
> সবার আমি এক বয়সী জেনো।

পবিত্রদার জন্ম ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এই ত' সেদিন সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। বলতে পারি, পবিত্রদা জনি-ওয়াকার, Born in 1893—still going strong। ভাবলে অবাক লাগে, পবিত্রদা কি আজকের লোক ? তিনি স্বদেশী যুগের লোক।

হাতে লাঠি, কাঁধে চাদর, মুখে খৈনি—এই সাজে পবিত্রদাকে একালের আমরা দেখছি। সেকালের পবিত্রদাকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন পবিত্রদা চিরতরুণ, দেখা হলেই পবিত্রদার সেই প্রীতি সম্ভাষণ—কি রে, কেমন আছিস্!

—'দাদা, এই একরকম আছি।'

ধমক দিয়ে বলেন,—'এক রকম কী রে! বল্, ভাল আছিস্। তোরা আজকাল মা হয়েছিস না। অকালে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস্। আমাকে দেখ্।'

তা সত্যি, সেই ১৯১১।১২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পবিত্রদা গিয়েছিলেন। সে গল্প তাঁর কাছে শুনেছি।

"বুঝলি, আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি বিক্রমপুরের বেলতলী ইস্কুলে। খবরের কাগজে দেখলাম চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলন হচ্ছে। ব্যস, রবাহূত হয়ে চলে গেলাম।"

বিস্ময় প্রকাশ করি—'বলেন কি, দাদা! বেলতলী থেকে চট্টগ্রাম। সে ত অনেক দূর। তা ছাড়া ট্রেণের ভাড়া।'

দাদা বাধা দিয়ে বলেন—'আহা, শোন না। আগেই সিদ্ধান্ত করে ফেললি। আমার এক সহপাঠি ছিল ডাকনাম লালা, তার বাবা এ বি রেলের মেডিকেল অফিসার। সেই সুবাদে চাঁদপুর চাটগাঁ লাইনের অধিকাংশ রানিং স্টাফ লালাকে চেনে, স্নেহ করে। সে-ই ভরসা দিলে, চল তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।" বললাম, "দাদা, আপনার জীবনে প্রথম সাহিত্যসম্মিলনে যোগদান করলেন বিন্-টিকিটের যাত্রী হয়ে।"

পবিত্রদা অধীর হয়ে বলেন,—"ওই তো তোর দোষ! আগে শোন্। বিক্রমপুরের বেলতলী গ্রাম থেকে গহনার নৌকা করে লালার সঙ্গে এলাম নারায়ণগঞ্জে। সেখান থেকে দস্তুর মত টিকিট করে স্টিমার চড়ে চাঁদপুর। তারপর চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম ট্রেনে—এখানেই লালার কেরামতী দেখলাম। চাঁদপুর থেকে ট্রেন ছাড়ল। কেউ টিকিট চাইল না। আমার ত বুক টিপ-টিপ করছে। তারপর লাকসায় স্টেশনে চেকার উঠেছে আমাদের থার্ড ক্লাস কামরায়। এইবার ত' গেলাম। লালার পরণে কোট-প্যাণ্ট বুট। সে মস্ মস্ করে এগিয়ে গেল। চেকারকে কী বোঝাল, তা সে-ই জানে। চেকার আমাদের কামরায় না উঠে চলে গেল অন্য কামরায়।"

বললাম, "খুব জোর বেঁচে গেছেন দাদা।"

গম্ভীরভাবে পবিত্রদা বললেন, "বাজে বকিস্ না।

তারপর চট্টগ্রামে পৌঁছে সেখানে অন্দরকিল্লায় আরেক প্রাক্তন সহপাঠি ক্ষেত্রদের বাসায় উঠলাম। এই প্রথম সাহিত্যিকদের স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। উঃ, সে কি উত্তেজনা! তোরা কি বুঝবি! এখানেই আলাপ হ'ল তখনকার প্রধান প্রধান লেখকদের সঙ্গে। সম্মিলনের সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দেবকুমার রায়-চৌধুরী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, রামকমল সিংহ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, বিনয়কুমার সরকার—এঁরা গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। আর চট্টগ্রামের স্থানীয় নেতা ও লেখকরা ছিলেন—রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার রায়, যাত্রামোহন সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র দত্ত, মুনশী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ। এই সব বাঘা বাঘা লোকদের সঙ্গে গ্রামের ছেলে আমি দিব্বি আলাপ জমিয়ে ফেললাম।"

"ওই সম্মিলনের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল কাকে?"—প্রশ্ন করি।

পবিত্রদা একটু থেমে বললেন—"দুজনকে—অধ্যাপক বিনয়-কুমার সরকার আর কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তকে। সেই নয়াবাংলার ধারক বিনয়কুমার, উনিশ শ' পাঁচ-এর বাহক বিনয়কুমার, অসাধারণ কৃতী ছাত্র, অসাধারণ তেজী, অথচ বেশে-বাসে এতটুকু জৌলুষ নেই, আটআনি-আটআনি চুল ছাঁটা, বোম্বাই চাদর গায়ে, চটি পায়ে। সম্মিলনে অত সব প্রবীণদের মধ্যে এই নবীনের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি সকলকে আকর্ষণ করেছিল। সম্মেলনের মধ্যে শেষ দিন বিনয়কুমার আগুন-ঝরা বক্তৃতা করলেন। তারপর ধন্যবাদের পালা শেষ হয় হয়, সম্মেলনের কাজ সাঙ্গ হয়েছে, বিনয়কুমার হঠাৎ আমাকে মঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। সমবেত দর্শক-প্রতিনিধিদের বললেন, 'এই দেখুন নয়া বাংলা, উনিশ শ পাঁচে যার গোড়া পত্তন হয়েছে। সুদূর বিক্রমপুরের গ্রামের স্কুলের

ছাত্র, খবরের কাগজের নিমন্ত্রণে নিজের চেষ্টায় ছুটে এসেছে।'
আমি ত হতবাক্, খুব লজ্জিত হয়ে বসে পড়লাম।"

পবিত্রদা একটু থামলেন, বোধ করি অতীত স্মৃতি রোমন্থন করলেন, খৈনি মুখে দিলেন, তারপর আবার শুরু করলেন।

"আর একজন হলেন চট্টলের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। যেদিন চট্টগ্রামে পৌঁছই, সেদিন বিকেলে বন্ধু ক্ষেত্রের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তা-ঘাট সব আমার চোখে নোতুন লাগছে। চট্টগ্রাম শহরটি খুব সুন্দর। একটা বাড়ির গেটে ক্রাচের উপর ভর করে একজন সুদর্শন সুবেশ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। পথে যেতে যেতে ক্ষেত্র আমায় চিনিয়ে দিল, ঐ হলেন কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। পথে দাঁড়িয়েই আলাপ হ'লো। জীবেন্দ্রকুমার বললেন, 'ভেতরে এসো, আলাপ করি। তোমার ত উৎসাহ খুব। বিক্রমপুরের গ্রাম থেকে এসেছো চট্টগ্রাম। বসো ভাই, চা খাও।' বুঝলি অরুণ, প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সম্মেলনের শেষে জীবেন্দ্রকুমারের বাড়ি ক্ষেত্রব সঙ্গে গেলাম। দু' ঘণ্টা ধরে উনি এই অর্বাচীনের সঙ্গে সাহিত্যেব কত কথাই না বললেন। চা-জলখাবার খেয়ে উঠতে যাচ্ছি, কবি বললেন, 'দাঁড়াও ভাই, একখানি বই দিই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ।' এই বলে 'ধ্যানলোক' বইখানি উপহার দিলেন। জীবনে বহু গ্রন্থকারের কাছ থেকে বহু বই উপহার পেয়েছি, কিন্তু 'ধ্যানলোক' পেয়ে নিজেকে যতটা গৌরবান্বিত মনে করেছিলাম, তত আর কিছুতে করি নি। জীবেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আর কখনও দেখা হয় নি জীবনে।"

স্মৃতিভারে রুদ্ধকণ্ঠ সংবেদনশীল পবিত্রদা থেমে গেলেন।

পবিত্রদাকে ধরা ভারী মুশ্‌কিল। কখন যে কলকাতায়, কখন যে আসানসোলে, কখন যে পুরুলিয়ায়, আর কখন যে মেদিনীপুরে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুকে সভা করে বেড়াচ্ছেন, তার সঠিক সংবাদ পাওয়া কঠিন। অনেকদিন তাকে তাকে থেকে একদিন

বিকেলে বইপাড়ায় ধরে ফেললাম। সঙ্গে ছিলেন তরুণ কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়। ব্যস্! আর কথাবার্তা নেই। দুজনকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে সোজা বাড়িতে এনে ফেললাম। তারপর চা-ইত্যাদি ব্যবস্থা করে দাদাব হাতে একটি চুরুট গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত। পবিত্রদা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন,—"তুই আগে বলিস নি কেন যে তোর এখানে আনবি ?"

কথাটা শুনতেই পেলাম না। আবার বললেন, "বৌমার উপর জুলুম। অবশ্য, সে আমার মেয়ের মত। তবে ব্যাপার হচ্ছে—"

শান্তকণ্ঠে বললাম, "দাদা আপনাকে আর এক কাপ গরম চা দিক।" উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তোব মতলবটা কি ?"

ততোধিক শান্ত কণ্ঠে বলি, "কিছু না, আড্ডা দদাতি বিনয়ং।" শেষ পর্যন্ত পবিত্রদাকে তাঁর স্মৃতিচারণার পথে নিয়ে যেতে পেরে-ছিলাম। বললাম, "দাদা আপনাব আসাম প্রবাসেব গল্পটা বলুন।"

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—"আসামের কথা কী আর বলব। গাঁয়ে থেকে আর চলে না। রাজনীতির আবর্তে পড়ে লেখাপড়া হ'ল না। সংসারের স্বার্থে বিয়ে করতে হল। দারিদ্র্যের চাপে পড়ে চাকরির চেষ্টায় বেরুতে হল। ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারলাম না। জোড়হাটে থাকতেন আমার বড় ভগিনীপতি। তাঁরই আনুকূল্যে জোড়হাটের সরকারী উকিল রায়বাহাদুর প্রমোদ-কিশোর রায়ের মুহুরি হয়ে চলে এলাম। তাঁব বাড়িতেই থাকতাম। বুঝলি, এখনকার মত অসমীয়া-বাঙালী ঝগড়া সে সময়ে ছিল না। অসমীয়া লেখক নকুল ভুঁইয়া, কৃষ্ণকান্ত হন্দিকৈ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আসামের নবজাগরণের হোতা আনন্দ-রাম বড়ুয়ার প্রথম স্মৃতিসভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিল এই শর্মাও। গড়ে তুলেছিলাম 'সাহিত্য সংসদ', বার করেছিলাম 'সহচর'—সবই অসমীয়া বন্ধুদের সঙ্গে। আর আজকে দেখ, অসমীয়া-বাঙালী খুনোখুনি করছে। জোড়হাট থাকাকালীন কত কী করেছি।"

নিভে-যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, "এখান থেকেই ১৯১৬ সনে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। কলকাতার নামী পত্রিকায় গল্প-কবিতা বেরুল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত লোককথা ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের কথা বিক্রমপুরের ভাষায় লিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করলাম। আর একটা কাজ করেছিলাম। জোড়হাটের সরকারী লেডী ডাক্তারের বাড়িতে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে প্রথম হাতে পড়ল 'সবুজপত্র' মাসিকপত্র। দেখে মুগ্ধ হলাম। সাহিত্যে নোতুন রীতি দেখে চমকে উঠলাম। সাহসে ভর করে এই নোতুন রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্রমথ চৌধুরী মশায়কে চিঠি লিখে ফেললাম। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। চৌধুরী-মশায় আমার তুটি চিঠিরই উত্তর দিলেন। তাতে ছিল না তাচ্ছিল্য, ছিল সশ্রদ্ধ যুক্তি।"

বললাম, 'হাঁ, মনে পড়ছে, আপনার 'চলমান জীবন'-এর প্রথম খণ্ডে চৌধুরী মশায়ের উত্তব-পত্র তুটি সংকলিত হয়েছে।"

পবিত্রদা পুবনো দিনের কথায় উন্মনা হলেন। জোড়হাট থেকে হঠাৎ একদিন চলে এলেন ঢাকা। বোধ হয় এক জায়গায় বেশীদিন বাঁধা থাকতে চাইলেন না।

কথার খেই ধরে বললেন, "জোড়হাটে থাকতে থাকতেই ঢাকার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে পত্রালাপ হয়। ঢাকায় এসে তাঁর সহকাবী রূপে 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় যোগ দিলাম। তাঁর নারিন্দার বাসাতেই উঠলাম। বেতন যৎসামান্য। আমি তাতেই রাজি। এ-সময় যোগেন্দ্রনাথের 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন ঢাকার অধিবাসী ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কবি-অধ্যাপক পরিমলকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ। এঁদের সঙ্গে আলাপ হল এই সূত্রেই। তাছাড়া গোষ্ঠী-বহির্ভূত অধ্যাপক-বর্গের সঙ্গেও পরিচিত হলাম—সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, বিধুভূষণ গোস্বামী,

সুখরঞ্জন রায়, অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত। যোগেন্দ্রনাথ ছাড়া আর তিনজনের স্নেহলাভ করেছিলাম এই সময়ে—পরিমলবাবু, শ্রীপতিবাবু ও ভট্টশালী মহাশয়। কী সুখের দিনই না ছিল! পরিমলবাবুর বাড়িতে আর বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বিরাট লাইব্রেরীতে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটিয়েছি।"

"ভাইরে, এত সুখ সইল না। যোগীনদার 'বিক্রমপুর' ছেড়ে চলে গেলাম বুড়িগঙ্গার অপর পারে কোণ্ডা স্কুলে শিক্ষকতা করতে। কিন্তু তাও ভাল লাগে না। তখন আমার প্রাণ ছটফট করছে। কলকাতা মহানগরীর জীবন-সাগরে পৌঁছবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। কলকাতায় আশ্রয় প্রার্থনা করে দুখানি চিঠি ছাড়লাম দুজনের কাছে—রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ তখুনি কোনো আশ্বাস দিলেন না, কিন্তু একদিন প্রমথ চৌধুরীর চিঠি পেলাম—কলকাতা যাবার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। তখনো যুদ্ধ চলছে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। গাঁয়ের ছেলে এসে পড়ল কলকাতার মহাসমুদ্রে।"

এই কথা বলে পবিত্রদা উঠে পড়লেন—'মহাসমুদ্রের কথা আর-একদিন হবে।'

সেই ১৯১৮ থেকে ১৯৬৩: পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পবিত্রদা কলকাতার সকল সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে আছেন। নবীন প্রবীণ, বাম দক্ষিণ, উগ্র কোমল, দুরন্ত শান্ত, চঞ্চল স্থির,—সকল দলের সঙ্গেই তাঁর হৃদয়ের যোগ। সবুজপত্র, যমুনা, কল্লোল, প্রমথ চৌধুরীর 'কমলালয়', 'ফোর আর্টস ক্লাব', স্বরাজ, আনন্দবাজার, দেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিজলী, শিশির ভাদুড়ীর মনোমোহন থিয়েটার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ঠাকুর-বাড়ি, 'ভারতী'র আড্ডা ও গজেন ঘোষের বৈঠক, জীবনকালী রায়ের বৈঠক, বিশ্বপতি চৌধুরীর বৈঠক, রসচক্র—সকল সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা ও আড্ডার সঙ্গে পবিত্রদার বরাবর প্রাণের

যোগ ছিল। আজো তিনি সকলের বন্ধু—নবীনের সখা, প্রবীণের সহচর, তারুণ্যের দোসর।

আর একদিনের কথা। পবিত্রদাকে বললাম, "আজ আপনাকে বলতেই হবে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা।"

চুরুটে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন পবিত্রদাঃ "তোকে ত আগেই বলেছি, চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে আমার সংযোগ জোড়হাট থেকে লেখা পত্রে ১৯১৬ সালে। তার দু'বছর বাদে এলুম কলকাতায় তাঁর চিঠি পেয়ে। মনে আছে তখন গরম কাল। কালিঘাট মুখার্জিপাড়া লেনে আমার এক দিদির বাসায় এসে উঠলাম। সেই প্রথম কলকাতা এলাম। যা দেখি তাতেই অবাক হই। এই লাবণ্য, এই বিপুল কর্মস্রোত, এই জীবনচাঞ্চল্য—এরই নাম কলকাতা। পরদিন সকালেই কালিঘাট থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম ওল্ড্ বালিগঞ্জে চৌধুরী মশায়ের 'কমলালয়'-এর উদ্দেশে। বালিগঞ্জ ময়দানের কাছে এসে পথে খোঁজ নিতে নিতে এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রীটে কমলালয়ে পৌঁছলাম। গেটের এক পাশে বাড়ির নম্বর ও চৌধুরী মশায়ের নামের ট্যাবলেট দেখে নিঃসংশয় হলাম। গেট খোলা, কাছাকাছি কাউকে দেখা যাচ্ছে না, সসঙ্কোচে ঢুকে পড়লাম। মখমলের মত কচি সবুজ লন ডাইনে রেখে লাল কাঁকরের পথ ধরে সামান্য কয় পা এগিয়ে দেখা হ'ল দারোয়ানের সঙ্গে।

"দারোয়ান বেয়ারা প্রভৃতি বাধা পেরিয়ে অবশেষে সাহেবের অর্থাৎ চৌধুরী মশায়ের আপিস-ঘরে পৌঁছলাম। দেখলাম উনি চেয়ারে বসে আছেন, সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে অনেক কাগজপত্র বই সাজানো। আর একটা গ্লাসে সদ্য-ঢালা সোডা। বাঁ হাতের সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন,

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন 'কবে এলে? কোথায় উঠেছ? বসো।'

"কথ্যভাষাকে সাহিত্যে প্রমোশন দেওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস ও দূরদৃষ্টি এবং যাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রখর বুদ্ধিবাদ—প্রগতি থেকে বহুদূরে ছোট্ট মফঃস্বল শহরে এক অশিক্ষিত তরুণ মনকে আলোড়িত করেছিল, সেই মনীষীর একেবারে সামনা-সামনি বসে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আমার মন অভিভূত হল। প্রশস্ত ললাটে ও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি উদ্ভাসিত মনে হল, গৌরবর্ণ চেহারায় সাদা আদ্দির বুটিদার পাঞ্জাবি, পরনে সাদা ঢিলে পায়জামা। দু'হাতের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দুটো সিগারেটের ধোঁয়ায় লালচে হলদে হয়ে গেছে।

"আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন—চাকুরি চাই, এটাই ছিল মূল কথা। জানালেন, ভেবে দেখি। জেনে নিলেন, কতটাকা বাড়িতে পাঠাতে চাই। তিন দিন বাদে দেখা করতে বললেন।

"অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে দেখা করতে গেলাম। পায়েব ধুলো নিতেই চৌধুরী মশায় বললেন,—'তোমার কথা ভেবে দেখলাম। যদি কাজে লেগে যাও তবে যেখানে রয়েছ সেখান থেকে যাতায়াতের তোমার অসুবিধা হবে। আমার এখানে থাকতে পার যদি, তোমারও সুবিধা হবে, আমিও হাতের কাছে যখন-তখন সব কাজেই পাব।'

"সবুজপত্রের আপিসের চাকুরি আর আশ্রয় দুই-ই পেলাম। পূব-বাংলার গ্রামের এক নগণ্য যুবক কলকাতায় নাগরিক সংস্কৃতির পীঠস্থান 'কমলালয়ে' ঠাঁই পেলাম। সাহেব (চৌধুরী মশায়) ও ন'মা (ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী) উভয়ের স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি।"

পবিত্রদা থামলেন। আড্ডায় আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই কাহিনী শুনেছিলাম। আজ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধানে এই কাহিনী

আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য গল্পের মতো মনে হয়। কিন্তু সেদিন এই আন্তরিকতা ও হৃদয়বত্তার প্রকাশ বিরল ছিল না।

অন্য একদিনের আড্ডা। পবিত্রদা খৈনি মুখে ফেলে বললেন, "আজ শোনো ঠাকুরবাড়ির কথা। 'কমলালয়ে' সকাল দশটায় ভাত খাওয়া হয়ে যেতো। কাজ থাক, আর না থাক, দেরী করা চলবে না। খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে তক্তাপোশে চিত্ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি, ননী (ভৃত্য) এসে খবর দিল—সাহেব ডাকছেন। ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না। ওপাশের বারান্দা থেকে ডাক শুনতে পেলাম, 'পবিত্র, এদিকে এসো।'

"সেখানে গিয়ে দেখলাম চেয়ারে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চোখা নাক, মাথায় টাক, গায়ে আকাশী রঙের জোব্বা, পায়ে কটকী চটি, জোব্বার নীচে ঢিলে সাদা পায়জামার প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছে। আমি যেতেই চৌধুরী মশায় বললেন, ইনি অবন ঠাকুর।

"সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রণাম করলাম।

"অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। বিক্রমপুরে আমার বাড়ি শুনে তিনি বললেন, বিক্রমপুরের গ্রামের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পব্যবহারের নমুনা—আমসত্তের ছাঁচ, নারকেলের নাড়ু তক্তির ছাঁচ, আল্পনার নকশা—সংগ্রহ করে দিতে হবে। সানন্দে রাজি হলাম। লোকশিল্পের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের সত্যিকারের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা মাঘমণ্ডলের গল্পটা উনি লিখে দিতে বললেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের ব্রতকথা 'ঠাকুরমার ইতিহাস' দেখালাম। অবনীন্দ্রনাথ শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। স্থির হল, পরের রবিবার খাঁটি বিক্রমপুরী ভাষায় মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা লিখে জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসব। লিখে ফেললাম।

"পরের রবিবার সকালে জোড়াসাঁকো যাব। চৌধুরী মশায় পথের নিশানা বলে দিলেন, এস্‌প্লানেড থেকে চিৎপুরের ট্রামে উঠে ক'টা স্টপেজ পরে নামতে হবে। তাজ্জব ব্যাপার। এস্‌প্লানেড থেকে ট্রামে উঠে সত্যি স্টপেজ গুনে গুনে চললাম, আর হিসেব মত নেমে সামনেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি চোখে পড়ল। ঘরকুনো মোটর-বিহারী চৌধুরী মশায়ের টপোগ্রাফির জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলাম। '

"জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই আমার প্রথম পদক্ষেপ। রবীন্দ্র-নাথ তখন শান্তিনিকেতনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচিতে বাস করেন। বছর ছয়-সাত আগে 'জীবনস্মৃতি' বেরিয়েছে। সে আলেখ্য মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু গত শতকের শেষপাদের ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ১৯১৯।২০ সালের ঠাকুরবাড়ির অনেক তফাৎ। দেউড়িতে দারোয়ান ছিল বটে, ছিল না হাঁকডাক, ছিল না পালকি-বেহারা। সব নিস্তব্ধ নিঃঝুম। সামনে আদি বাড়ি, বাঁ দিকে লাল বাড়ি বিচিত্রা-ভবন, সদ্য নির্মিত হয়েছে। ডান দিকে একটি বড় লোহার গেট। তার দক্ষিণে বিরাট প্রাসাদ। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এইটেই অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি। আজ সেখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। আজ সেখানে শ্যামল আঙ্গিনা, রবীন্দ্রভারতী প্রেক্ষাগৃহ আর বিশ্বভারতীর কর্মালয়।

"গেট পার হয়েই বাঁ দিকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলাম। সিঁড়ির শেষেই দেখতে পেলাম, ঝাড়ন কাঁধে একজন খানসামাকে, তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে অবনীন্দ্রনাথের কাছে পোঁছে দিল বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পূবে-পশ্চিমে টানা বৃহৎ বারান্দায়। এই সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা। প্রথমেই দেখলাম ইজিচেয়ারে শুয়ে একজন পক্ককেশ জোব্বাপরা ভদ্রলোক গুড়গুড়ি টানছেন। পরে জানলাম তিনি গগনেন্দ্রনাথ। তাঁর বাঁ পাশে ইজিচেয়ারে জোব্বা পাজামা-

পরা আর-একজন, তিনি সমরেন্দ্রনাথ। এঁদের বাঁদিকে রেখে ডানদিকে ফিরতেই দেখতে পেলাম অবনীন্দ্রনাথকে।

"গালিচার আসনে বসে ডেস্কের উপর রেখে একখানা তক্তার সঙ্গে আটকানো কাগজে ছবি আঁকছিলেন। তুলি হাতে মুখ তুলেই অবনীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে সুর করে বললেন, 'আরো এসো পবিত্রবাবু, এসো এসো।'

"পায়ের ধুলো নিয়ে আমি কার্পেটের একধারে বসে পড়লাম।

" 'মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা আপনার জন্য লিখে এনেছি,' বলে খাতাখানা তাঁর হাতে দিলাম।

"তাঁর চোখে মুখে খুশি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বললেন, 'একেবারে চটপট রেডি করে এনেছ দেখছি। এতখানি কাজে উৎসাহ যদি ছেলেদের সবার থাকত, তবে আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যেত এতদিন।'

"ইতঃমধ্যে দেখি একথালা জলখাবার এসে হাজির হল। আশ্চর্য হলাম, কে কখন কাকে হুকুম করল, আর এরই মধ্যে খাবার এসে গেল! পরবর্তী অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম, এটাই ঠাকুরবাড়ির চিরাচরিত রীতি। ইতস্তত করছিলাম, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'খেয়ে ফেলো পবিত্রবাবু।' খেতে শুরু করে দিলাম। অবনীন্দ্রনাথ খাতাটা উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'আরো ব্রতকথা আছে নিশ্চয়ই, সেগুলি লিখে ফেলো। আর কৃশার কথা ভুললে চলবে না।' খেতে খেতেই ঘাড় নাড়ি।

"তারপর সংকোচ কাটিয়ে দুম করে বলে ফেলি, 'ছবি দেখতে চাই।'

" 'তা ছবি দেখবে, এ আর কি কথা'—বলেই শিল্পগুরু দীর্ঘদেহী অবনীন্দ্রনাথ ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে পিছনে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকলাম। তার দেয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো। এক এক করে আমাকে দেখালেন, 'শেষ বোঝা', 'মন্থরার মন্ত্রণা',

'কচ ও দেবযানী', 'সাজাহানের স্বপ্ন'। শিল্পীর চোখে মুখে দেখলাম স্বপ্ন ফুটে উঠেছে।"

এই স্বপ্নঘোরে আমাদের ফেলে রেখে পবিত্রদা সেদিন উঠে গেলেন।

অনেকদিনের ইচ্ছে, পবিত্রদার কাছে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গল্প শুনবো। লোকমুখে শুনি, পবিত্রদা আজকাল আসানসোল-কলকাতা-জামতাড়া-কোলাঘাট-দীঘা ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্র-সভায় পৌরোহিত্য করছেন। শেষে একদিন সন্ধ্যায় এক বইয়ের দোকানে তাঁকে ধরে ফেললাম। বললাম, 'দাদা আজ আর ছাড়বো না। চলুন।'

নির্বিকার মুখে বললেন, 'চল্, কোথায় যেতে চাস্।'

আড্ডায় বসে সুস্থির হয়ে বলি, "দাদা, নজরুল প্রসঙ্গ একটু বলুন, শুনি।" চুরুটটি নিপুণভাবে ধরিয়ে পবিত্রদা শুরু করলেন।

"তিন নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীটে 'ক্যালকাটা উইকলি নোটস'-এর ছাপাখানা ও আপিস। এখান থেকেই সবুজপত্র-এর কাজকর্ম হতো। প্রুফ দেখা, চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া, লেখা নেওয়া বা ফেরৎ দেওয়ার কাজ করতে হতো আমায় এইখানে বসে। একদিন বিকালে এসে এখানকার আপিসের শশীবাবুদের কাছে শুনলাম, আমার খোঁজে এক মিলিটারিম্যান এসেছিল। শশীবাবু বললেন, ঘোড়ায় চড়া শ্রীকৃষ্ণ! সে কী রে বাবা! একটা তিন লাইনের স্লিপ রেখে গিয়েছে। পড়ে দেখি, আরে! এ যে করাচী-ফেরতা হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। তখুনি ছুটলাম উদ্দিষ্ট ঠিকানায়—৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে।

"এই ঘটনার-পূর্ব ইতিহাস আছে। মাস আষ্টেক আগে সবুজ-পত্র সম্পাদকের নামে করাচী থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তির একটি ছোট কবিতা আসে। চৌধুরী মশায় সেটা ছাপতে রাজি হন নি।

তখন আমিই সেটা 'প্রবাসী' আপিসে সহ-সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিয়ে আসি। তিনি তখুনি পড়লেন ও সঙ্গে সঙ্গে ছাপতে দিলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসীতে' বেরিয়ে গেল নজরুলের আশায় (হাফেজ থেকে)—

নাই বা পেল নাগাল শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে তেমনি বিভোর থাকরে প্রিয়ার আশায়
তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোরও নাসায়।
বরষ শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবেরে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

এইভাবে পত্রযোগে অ-দেখা নজরুলের সঙ্গে আমার প্রীতি-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারপর যুদ্ধ শেষ হয়েছে—এখন ১৯১৯ সাল—সেই অ-দেখা হাবিলদার আজ কলকাতায়! ছুটলাম কলেজ স্ট্রীটে। মুজফ্‌ফর আহমদের ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। এপাশে-ওপাশে ঘরে তালা দেওয়া। সব চুপচাপ। গেল কোথায়? হঠাৎ কানে বেজে উঠল হারমোনিয়ামের সুর, তার সঙ্গে কে যেন গলা মেলাবার চেষ্টা করছে। ঘরের ভেতরে অন্দর থেকেই আওয়াজ আসছে। ঢুকে দেখি, একটি কেওড়াকাঠের ..ড়া তক্তা-পোষে বসে একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। সুরের আবেগে মাথা নাড়তে যে-ভাবে দীর্ঘ কেশগুচ্ছ দুলে উঠছে, আমার লেশমাত্র সংশয় রইল না—এ-ই শশীবাবুর 'ঘোড়ায় চড়া শ্রীকৃষ্ণ।'

হঠাৎ সে চোখ ফেরাল, বললাম, 'হাবিলদার সাহেবকে চাই।' হারমোনিয়ামটা কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক লাফে উঠে এসে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিলে, তারপর, 'আপনি

পবিত্র গাঙ্গুলী।' বলে সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গনে আমায় বেঁধে ফেলল। হেসে উঠল, বলল, 'চিনেছি, আমার মন বলেছে,' বলেই গেয়ে উঠল—'সে যে আসে আসে আসে।' সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে। সেই সঙ্গে নজরুলের বন্ধু হলাম আমি।

বললাম, 'খবর কী ভাই! করাচী থেকে চলেই এলে?'

'বসো তা হলে।' নজরুল বলল। 'জাঁকিয়ে আড্ডা দিতে হলে রসদ চাই। আসছি।' বেরিয়ে গেল চটি ফট্‌ফট্‌ করে। একটু পরেই ফিরে এল। এক হাতে চায়ের কেটলি ঝুলছে। অপর হাতে সিঙাড়ার ঠোঙা আব কলাপাতায় মোড়া এক গাদা পান। হেসে বললে, 'বন্ধু-মিলন মানেই উৎসব। চা, সিঙাড়া, পান,—মজলিসের তিন বেস্ত। এসো ভাই, হাত লাগাও।' চা-সিঙাড়া শেষ করেই মুখে পুরল পান, তারপরই হারমোনিয়াম টেনে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে গাইতে শুরু করল—

'দারুণ অগ্নিবাণে রে, হৃদয় তৃষায় হানে রে'

সুর উঠল সপ্তমে, অপসারিত হল সকল ভয়, উদাত্ত হয়ে উঠল গায়কের কণ্ঠ—

'ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে রে॥'

তখন সারা পরিবেশ সুরের অগ্নিবন্যায় ভেসে গেল। এই হ'ল নজরুল। নিদারুণ রোগে আজ সে-কণ্ঠ নীরব।'

বন্ধুঅন্ত-প্রাণ পবিত্রদা বিদ্রোহী কবির বর্তমান জীবন্মৃত অবস্থা ভেবে দুঃখিত হলেন। আড্ডার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিলাম।

পবিত্রদার আসন সকলের হৃদয়ে। তিনি তিন যুগের সেতু,

সকলের বন্ধু। পবিত্রদা সকল দলের। একটি পবিত্র সূত্রের মতো বহু সাহিত্য-প্রাণের মালা রচনা করেছেন সারা জীবন দিয়ে। মানব-সম্পর্কই সাহিত্যের মূল কথা, এই পরম সত্য মনে করিয়ে দেবার জন্য তিন যুগ ধরে রয়েছেন সকলের পবিত্রদা। জীবনের ঘাটে ঘাটে চলমান জীবন স্রোতের আনন্দবার্তা পৌঁছে দিয়েছেন পবিত্রদা। সুখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায় রৌদ্রে-ছায়ায়—জীবনের পথে পথে পবিত্রদা প্রীতি বিলিয়েছেন,উদাব দাক্ষিণ্যে সকলকে গ্রহণ করেছেন, জীবনের পবিত্র গঙ্গায় চিরচলমান হয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাই আড্ডাধারী পবিত্রদাব কথালাপে জীবনেব আনন্দ বাঙ্ময় রূপ লাভ করে।

যমদত্ত

"ইনি হলেন যমদত্ত, আর ইনি—"

নমস্কার-প্রতিনমস্কারের মধ্যেই খানিকটা চমকে উঠি। 'যমদত্ত? সে আবার কি?' 'দীর্ঘ শীর্ণকায় হাইকোর্ট-ফের্তা কালো-কোট-পরিহিত যমদত্তকে দেখে হঠাৎ চমকে যেতে হয়। যিনি আলাপ করিয়ে দিলেন, আপনারা তাঁর পরিচয় পেয়েছেন। তিনি আমাদের সকলের 'স্যার'—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, যাঁর সঙ্গে সদ্য আলাপ হ'ল, তিনি তাঁরই ছাত্র—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত। একজনের বয়স সাতের কোঠায়, অপরজনের ছয়ের কোঠায়। গুরু-শিষ্যে উইটের লড়াই দেখার মতো। স্থান 'বসুধারা'র আপিস। এঁরা দুজন প্রধান ভূমিকায়, আমরা ক'জন অপ্রধান ভূমিকায়।

যমদত্ত নমস্কার করেই বাণ ছাড়লেন, লক্ষ্যস্থল এই অধম, বললেন—"আমি ওনার নগণ্য ছাত্র"—বলেই চারুচন্দ্রের পদধূলি নিলেন। চারুচন্দ্র সস্নেহে 'থাক থাক, হয়েছে' বলে আশীর্বাদ করলেন। হাসিভরা মুখে ছাত্রের দিকে প্রত্যাশা-দৃষ্টি মেলে ধরলেন। আমি হতবাক। যমদত্ত হাত জোড় করে আমাকে বললেন, "আমরা তো আর আপনাদের মতো পণ্ডিত নই। খুব জ্ঞানের কথা কইতে পারব না। তাছাড়া বুড়ো হয়েছি—কী বলতে কী বলে ফেলি, তার ঠিক নেই—Dotage and anecdotage are the two signs of old age."

অপ্রস্তুত হয়ে বলি, "না না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

'স্যার' (চারুচন্দ্র) বলেন, "হ্যাঁ, তুমি ছাতুবাবুর সেই গল্পটি অরুণকে শোনাও। ওহে, শোনো।"

নিরীহ মেষশিশুর ভঙ্গিতে যমদত্ত একবার 'স্যারে'র দিকে

তাকালেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "ছাতুবাবুর নাম জানেন? আশুতোষ দেব ছাতুবাবু নামেই পরিচিত। উনি খুব শৌখিন বাবু, সঙ্গীতজ্ঞ, রসিক ও দাতা ছিলেন। সেকালের কোনো দলকে ঠাট্টা করে ছাতুবাবু একটা ছড়া বাঁধেন, সবটা মনে নেই, খানিকটা বলছি:

বাঁশ বাগানে ডাকে কাক।
মালি কাটে কপিশাক।
ঈশ্বর তুমি পরম দয়ালু
তোমার কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাঁকালু।"

আড্ডার সকলেই উচ্চ হাস্য করেন। যমদত্ত বিরক্তির ভাণ করে বললেন, "এর মধ্যেই হাসছেন! ছাতুবাবুর আসল গল্পটা তো শুরুই হয় নি।"

খোশ গল্পের আশায় আমরা উৎসুক হয়ে উঠি। যমদত্ত শুরু করেন,

"ছাতুবাবুর এক পেয়ারের চাকর ছিল—নাম দীনবন্ধু বা দীননাথ। ছাতুবাবু তাকে 'দীন' বলে ডাকতেন। দীন বেশ গা টিপতে, পা টিপতে পারত; গা-হাত-পা টিপে সে ঘুম পাড়াতে পারত। বুঝেছেন, এমনই তার গা-টেপার খ্যাতি। সন্ধ্যার পর দীন প্রায়ই ছাতুবাবুর গা টিপত—অন্য লোকের গা-টেপানো ছাতু-বাবুর তত পছন্দ হত না। দীন যখন ছাতুবাবুর গা টিপত, তখন নানারকমের আজগুবি গল্প বলত। ছাতুবাবু খুব খুশী। একদিন গানের মজলিস হবে বাবুর বৈঠকখানায়। বাবু মজলিসে থাকবেন। দীনের গা টিপবার দরকার হবে না এই ভেবে দীন মাথায় চাদর জড়িয়ে 'নগর-ভ্রমণে' বার হয়ে তার শখের আড্ডায় পাড়ি জমাল। ছাতুবাবুর শরীর এইদিন ভাল ছিল না বলে খানিক পরে তিনি মজলিস থেকে উঠে এলেন। বিশ্রাম ঘরে এসে দীনকে ডাক

দিলেন—গা-হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ করছে—টিপে দেবে। কিন্তু দীন কোথায় ?

"অনেকক্ষণ পরে দীন 'নগর-ভ্রমণ' ও আড্ডা শেষ করে ফিরল। তারপর বাবুর গা টিপছে। ছাতুবাবু মনে মনে খুব বিরক্ত। মুখে বললেন—'গ্যাখ দীন! তুই এত ভালো গা টিপিস যে, আমার খালি মনে হয় কখন সন্ধ্যে হবে আর তোকে দিয়ে গা টেপাব। কিন্তু দিন যেন আর শেষ হতে চায় না, মনে মনে বলি দিনের বাপের মুখে······করি।'

"দীন বুঝল যে, বাবু ভীষণ চটেছেন, সেজন্য তার 'বাপ' তুললেন। দীন মুখ বন্ধ করে অতি যত্নের সঙ্গে বাবুর গা টিপতে লাগল, অন্যদিনের মতো গল্প করল না। ছাতুবাবু বুঝলেন যে, দীন খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ গা টিপবার পর ছাতুবাবু বললেন—'দীন! আজ যেরকম ভালো গা টিপেছিস তাতে তোকে একসের রসগোল্লা খাওয়াব।' এই বলে তিনি দীনকে একসের রসগোল্লা খাওয়াবার হুকুম দিলেন। দীনকে রসগোল্লা খাওয়ানো হল—খাওয়া শেষ হলে ছাতুবাবু দীনকে জিজ্ঞেস করলেন—কি রকম খেলি ?' দীন জবাব দিল—'বাবু! রোজ রোজ যদি এই রকম রসগোল্লা পাই, তাহলে কোন শালা আর ছাতু খায়! ছাতুর বাপের মুখে···করি।'

ছাতুবাবু বুঝলেন, দীন তাঁর বাপ-তোলার জবাব দিল। কেবল বললেন—'গা টেপ্'।"

এতক্ষণে যমদত্ত থামলেন। আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম। যমদত্ত বিন্দুমাত্র হাসলেন না, কেবল আড্ডার অধিকারীকে বললেন—'একটু চা আনতে হুকুম হোক্।'

অন্যদিনের আড্ডা। গুরু শিষ্য আছেন, আমরা কয়জন আছি। হাতে গরম সন্দেশ ও চা খাওয়া হল। চারুচন্দ্র বললেন, 'যতীন,

একটি গল্প বলো।" যমদত্ত আমার দিকে ফিরে বললেন,—'কি শুনবেন ? উত্তর দিলাম—'সাহিত্যের গল্প শুনব। যমদত্ত এবার তাঁর 'স্যরে'র দিকে ফিরে বললেন,—'স্যর। আমার দোষ দেবেন না। আজ আমি সাহিত্যের গল্পই বলব। চারুচন্দ্র হাসিমুখে মাথা নাড়লেন।

যমদত্ত উবাচ,

"পুরনো কলকেতার নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন রামত্নলাল দেব। তাঁরই ছেলে ছাতুবাবু! রামত্নলাল ছিলেন হাটখোলার মদনমোহন দত্তের শিপ-সরকার। রামত্নলালের অনেক গল্প আছে। আজ সে সব নয়। রামত্নলালের দৌহিত্রের নাম শ্যামলাল মিত্র। বাপ দাদামশায়ের মত তিনিও ব্যবসা করতেন, বিভিন্ন হৌসের মুৎসুদ্দী ছিলেন। শ্যামলাল বেশ সুরসিক সুপুরুষ ছিলেন। শ্যামবাবুর স্ত্রী রতনমণি সুন্দরী ও শিক্ষিতা। তিনি ইংরেজীও পড়তে পারতেন। এঁর পিতা রাজেন্দ্র দত্ত সেকালের অরিয়েণ্টাল সেমিনারির একজন বিশিষ্ট ইংরেজিনবীশ ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামবাবুর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্কিমবাবু অনেকবার শ্যামবাবুর বাড়িতে এসেছেন। শ্যামবাবুর পরিবার রতনমণির সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিল। এই সুখী দম্পতিকে বঙ্কিমবাবু পছন্দ করতেন। অনুমান, বিষবৃক্ষ'র শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা শ্যামবাবু ও রতনমণিকে লক্ষ্য করে। নাম ও সময়-সাদৃশ্য দেখে এই অনুমান একেবারে বাজে নয় বলেই মনে হয়।"

একথা শুনে আড্ডাধিপতি চারুচন্দ্র বললেন, "রবিবাবুর কাছেও এ-ধরনের কথা শুনেছি। উনি আমাকে একদিন বললেন,—গোরার হরিমোহিনী ও হারাণবাবু চরিত্র ছুটি নিছক কাল্পনিক নয়। হারাণবাবুকে আমাদের সমাজেই দেখেছি। আর হরিমোহিনীকে দেখিনি। তবে খানিকটা শুনেছি। আমি প্রশ্ন করলাম—হারাণবাবুটি কে ? রবিবাবু মুখ টিপে হাসলেন, বললেন,—সেটি বল্‌ব না, আপনি অনুমান করুন।"

যমদত্ত পুনরায় মুখ খুললেন। বললেন "আপনারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার অনেক গল্প জানেন। ভূদেব মুখুজ্জের গল্প জানেন? শুনুন। ভূদেববাবু স্কুলসমূহের পরিদর্শক ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে সারা বাংলা-বেহার ঘুরে বেড়াতে হ'ত। সময়ে সময়ে বিভিন্ন সরকারী ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিতে হ'ত। ভূদেব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ডাকবাংলোর বাবুর্চির হাতে খেতেন না, নিজেই পাক্-শাক্ করে কলাপাতায় খেতেন।

"একবার সায়েব ডি-পি-আই-এর সঙ্গে এক ডাকবাংলোয় উঠেছেন। সায়েবের জল-তেষ্টা পেয়েছে। ভূদেববাবুকে জলের কথা বললে ভূদেববাবু চাপরাসীকে বুঝিয়ে দিলেন। চাপরাসী কাচের গেলাসে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। সায়েব জল পান করে তৃপ্ত হয়ে চাপরাসীকে বললেন—"থ্যাঙ্ক ইউ"। চাপরাসী বুঝতে পারে না, ভাবল, সায়েব অন্য কিছু চাইছেন। ভূদেববাবু তখন বাংলায় বুঝিয়ে দিলেন, চাপরাসী সায়েবকে সেলাম করে চলে গেল।

"তখন সায়েব ভূদেববাবুকে বললেন, 'গ্যাখো, ইংরেজি ভাষা কত ভালো। আমাদের 'থ্যাঙ্ক্ ইউ'-এর প্রতিশব্দ বা এরূপ ব্যবহার বাংলায় বা হিন্দীতে নেই।"

ভূদেববাবু বললেন,—'সায়েব, আপনি যা বলেছেন, তা যথার্থ। আমাদের বাংলায় আর-একটি ইংরেজি কথার প্রতিশব্দ তো নাই-ই, এমনকি তার ভাব বুঝবার মত শব্দও নাই।

সায়েব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন—কী সেই শব্দ। ভূদেব বাবু উত্তর দিলেন 'Humbug'। সায়েব জবাব শুনে মুখ লাল করে চুপ করে রইলেন।"

গল্প শুনে নিঃসন্দেহে শ্রোতারা খুশী হলেন।

আর-এক দিনের আড্ডা। যথারীতি চা-সন্দেশ এসেছে। আমি একটু দ্বিধা করি। চারুচন্দ্র বলেন, "দ্বিধা করো না। খেয়ে নাও।

এমন হাতে-গরম সন্দেশ পাবে কোথায় ?" বিব্রত হয়ে বলি,—"স্যার, শরীরটা বিশেষ ভালো নয়।"

যমদত্ত এতক্ষণে মুখ খুললেন,—"তা হলে একটা গল্প শুনুন। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর K. C. S. I. পেটরোগা ছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ যতীন্দ্রমোহনকে তাঁর রাজবাড়ির ল্যাংড়া আম খেতে দেন। এইরূপ সুগন্ধি, সুস্বাদু ল্যাংড়া আম ভূ-ভারতে নেই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ল্যাংড়া আম কেটে সাবুর বাটিতে ডুবিয়ে, সেই সাবু খেয়ে বুঝলেন যে, ল্যাংড়া কিরূপ সুগন্ধি!"

গল্প শুনে আড্ডার সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। করজোড়ে নিবেদন করি,—"আপনিও তো যতীন্দ্রমোহন। তবে সে ল্যাংড়া আপনার ভোগে এলো না কেন ?"

যমদত্ত উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন,—"কে বলে তা আমি খাই নি ? এই ল্যাংড়ার আঁটি থেকে উৎপন্ন ল্যাংড়া আমের যে-গাছ, তাব ফল খেয়েছি।"

চারুচন্দ্র বললেন,—"সাধু, সাধু।"

আড্ডার প্রথম ধুয়োটা তুলে দিতেন আমাদের 'স্যর' চারুচন্দ্র। আমরা দোয়ারকি করি। যমদত্ত উদ্দীপ্ত হলে আর চিন্তা ছিল না। আর-এক বিকেলের কথা। বাইরে ট্রাম-বাস-জনতার কোলাহল, এখানে একটি পার্টিশন-দেওয়া ঘরে বসে রাজা-উজীর বধ। সে দিনের প্রসঙ্গ ছিল ইংরেজি ভাষার ব্যবহার। আড্ডার সকলে একমত হবেন, এমন দুরাশা আমরা পোষণ করি না। তুমুল তর্ক। একজন বললেন, "যখন যেটা রাজভাষা সেটারই জয়জয়কার। তার আবার ভালো মন্দ কি! আগে ছিল ফার্সী, তারপর হল ইংরেজি, এখন হয়েছে হিন্দী। সুতরাং ইংরেজি আজ আর চলবে না।"

যমদত্ত এতক্ষণ সন্দেশগুলিকে আয়ত্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। সে

কাজ শেষ করে মুখ খুললেন। ধীরে সুস্থে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "তা যদি বলেন ইংরেজিই ভালো। ফার্‌সী, হিন্দী—সব বাজে।"

সকলে প্রশ্নমুখর হয়ে উঠলেন—কেন, কেন?

যমদত্তের উত্তর।—"তা হলে শুনুন। কলকাতা ছোট আদালতের ভাষা ইংরেজি। এই আদালত দু হাজার টাকার ওপর বিচার করতে পারে না। আর যেখানে লাখ লাখ টাকার বিচার হয়, সেই মফস্বলের আদালতের ভাষা বাংলা। কেন হল জানেন? কলকাতা-ছোট আদালতের ভাষা আগে ছিল ফার্‌সী।

"নন্দলাল তাঁতী এক নালিশ দায়ের করেছেন। বিচারের দিন সকাল থেকে আদালতে হাজির আছেন, তাঁর মামলার আর ডাক হয় না। শেষবেলায় ডাক হ'ল। 'বন্দ বুতাম বাতি হাজির,' 'বন্দ বুতাম বাতি হাজির' কেউ সাড়া না দেওয়ায় 'বন্দ বুতাম বাতি'র মামলা খারিজ হ'ল। সায়েব জজ উঠে যাবেন, এমন সময় নন্দলাল হাতজোড় করে বললেন, 'হুজুর, আমার মামলা?'

"পেশকার তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করল; লিস্ট দেখল; বলল, নন্দলাল তাঁতীর কোনো মামলা আজকের দিনে নেই। অমুক নম্বর মামলা ত বন্দ বুতাম বাতির। সায়েব সব শুনে একেবারে 'থ'। আর্জিতে নন্দলালের বাংলা সই দেখে বুঝলেন যে, 'নন্দলাল তাঁতী' ফার্‌সীতে নোক্তার হেরফেরে 'বন্দ বুতাম বাতি' হয়েছেন। সায়েব তখন নন্দলালের মামলার পুনর্বিচার করলেন। আর সেইদিনই বাংলার ছোটলাটকে সব কথা বললেন। তখন থেকে ছোট আদালতের ভাষা ফার্‌সী থেকে ইংরেজী হয়ে গেল। তাই বলছিলাম, ফার্‌সী অচল সমগোত্রীয় হিন্দীও অচল।"

আমরা একবাক্যে বললাম, 'বন্দবুতাম বাতির জয় হোক্।'

যমদত্তের গল্পের শেষ নেই, আমাদেরও গল্প শোনায় ক্লান্তি নেই।

সব কিস্‌সা এখানে বলা সম্ভব নয়। যমদত্তের বকলমে আর একটি গল্প বলি। এদিনের আসর খুব জম-জমাট। যথারীতি চা-সন্দেশ-পান সেবনের পর যমদত্তের কথকতা শুরু হ'ল। সামনেই পুজার ছুটি। কে কোথায় যাচ্ছেন বা যাবার সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে কথা হচ্ছিল।

যমদত্ত শুরু করলেন,—"সে কি আজকের কথা! আজ থেকে এক শ' বছর আগেকার কলকেতার ছবি মনে মনে দেখুন। সিপাহী যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। তখনো আমাদের দেশে রেলপথ বসে নি, লর্ড ডালহৌসী-প্রবর্তিত সরকারী ডাকে পোস্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা, খাম দু পয়সা। তখন গঙ্গার ধারে আগ্রা প্রেসিডেন্সীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল ফরাক্কাবাদ। আগে এখানে সরকারী টাঁকশাল ছিল, ফরাক্কাবাদী টাকা বা মোহর কলকাতায় চলত। ফরাক্কাবাদ থেকে কলকাতায় বড় বড় নৌকা বা কিস্তিতে কলকাতায় মালামাল আমদানী রপ্তানী হ'ত। তখনকার দিনে বড় বড় কিস্তিতে আট-দশ হাজার মণ মাল ধরত। পশ্চিম থেকে আসবার সময় ভাঁটার টানে ও পালের সাহায্যে কিস্তি শীঘ্র শীঘ্র কলকাতায় পৌঁছুত। যাবার সময় ত্রিবেণী পর্যন্ত জোয়ারের টান পাওয়া যেত। তারপর থেকে পালের সাহায্য ও লম্বা লম্বা 'দো-টানা ঝাপান' দাঁড়—প্রত্যেক দাঁড় দুজন মাল্লায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টানত—এইরূপে সারা পথ দাঁড় টেনে বাড়ি ফিরত। নৌকার ছইয়ের ভিতর যাত্রী-সওয়ার নিত। রান্নাবান্না সঙ্গের ডিঙ্গিতে বা কোনো গঞ্জে নৌকা লাগলে সেখানেই হ'ত।

"কলকেতার নিমতলার ঘাটে এইরকম এক ফরাক্কাবাদী কিস্তি ভিড়েছে; মালামাল মহাজনেরা খালাস করে নিয়েছে; যাত্রীরা যে যার গন্তব্যস্থলে চলে গিয়েছে। পশ্চিমে যে মালটাল যাবে তা বোঝাই শেষ হয়েছে। কিস্তি ছাড়ার দিন-ক্ষণ স্থির হয়েছে; দুজন যাত্রী পেলেই হয়।"

গল্প থামিয়ে যমদত্ত চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আমরা উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। চা শেষ করে যমদত্ত আবার শুরু করলেন,—

"একজন যাত্রী পাওয়া গিয়েছে, আর একজনের জায়গা আছে। মাল্লারা জোরে জোরে হাঁকছে—"ফরাক্কাবাদ যাবে—" "ফরাক্কাবাদ যাবে"। গঙ্গার জোয়ার এলেই কিস্তি ছাড়বে—কিন্তু বাকি একজন যাত্রী আর জোটে না। এদিকে বেলা বাড়ে, জোয়ার আসন্ন। মাল্লারা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁকতে লাগল—"সস্তায় ফরাক্কাবাদ যাবে?"—"সস্তায় ফরাক্কাবাদ যাবে?" আরও বেলা বাড়ল, গঙ্গার জল থম্‌থমে হয়ে এলো; এইবার জোয়ার আসবে; মাল্লারা "মুফৎসে ফরাক্কাবাদ"—"মুফৎসে ফরাক্কাবাদ"—"এক রুপিয়ামে ফরাক্কাবাদ" হাঁকতে লাগল।

"টেকচাঁদ ঠাকুরের নাম শুনেছেন তো? ঐ যাঁর লেখা 'আলালের ঘরের তুলাল'—তাঁর আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। এক ভদ্রলোক টেকচাঁদ ঠাকুরের বাড়ি থাকতেন। মাঝে মাঝে দালালী করে টু-পাইস্ করতেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের কলকেতার বাড়ি তখন নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে ডফ্ সায়েবের কলেজের বড় বড় থামওয়ালা বাড়ির—এখনকার জোড়াবাগান পুলিশ-থানার সামনে। বাড়ি থেকে নিমতলার ঘাট কাছেই। ঐ ভদ্রলোক গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছেন। ট্যাকে তিন-চারটি টাকা। 'সস্তায় ফরাক্কাবাদ', 'এক টাকায় ফরাক্কাবাদ' শুনে তাঁর পশ্চিমে বেড়াবার সখ হ'ল। মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান, কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান, বিন্ধ্যাচল-চুনারে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নানের পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ, এবং কাশী-প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শনের লোভ হ'ল। কিস্তিতে চড়বেন স্থির করে মাঝির হাতে একটি টাকা দিলেন ও স্নান সেরে কিস্তিতে চড়ে বসলেন। বাড়িতে খবর দেবার কথা আনন্দের চোটে ভুলে গেলেন। জোয়ার এলে মাঝিরা যখন নোঙ্গর

তুলতে ও পাল খাটাতে লাগল—তখন বাবুর বাড়িতে খবর দেবার কথা মনে হ'ল। গঙ্গার ঘাটে পাড়ার এক বুড়ী আহ্নিক করছিলেন। বাবু চেঁচিয়ে তাঁকে বললেন, 'টেকচাঁদ ঠাকুরের বাড়িতে খবর দিও যে আমি ফরাক্কাবাদ যাচ্ছি।' বুড়ী শুনতে পেল কিনা কে জানে, মাথা নাড়ল। কিস্তি ছেড়ে দিল, ভরা জোয়ারে কিস্তি এগিয়ে চলল।"

যমদত্ত থামলেন। শ্রোতাদের একজন বিস্ময় প্রকাশ করলেন—'বলেন কি, সস্তায় পেয়েছে বলে বেড়াতে চলে গেল?'

যমদত্ত বললেন, "ওই তো আপনাদের দোষ। সবটি না শুনেই ভ্যাজর্-ভ্যাজর্ করেন। আগে শুনুন। বাবু স্নান করতে গিয়েছেন, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ফিরছেন না দেখে এদিকে বাড়ির লোক গঙ্গার ঘাটে খোঁজ নিল; দেখতে না পেয়ে, দোকানী-পসারী ও ঘাটের লোকজনের কাছে খোঁজ নিল। কেউ কিছু বলতে পারে না— বাবু কোথায় গিয়েছেন। থানা-পুলিশ করা হ'ল; ডিঙ্গী নিয়ে গঙ্গার তীরে তীরে খোঁজ করা হ'ল; বাবুকে পাওয়া গেল না। বাবু বোধহয় জলে ডুবে গিয়েছেন।

"একদিন গেল। দুই দিন গেল, তিন দিন গেল—সকলেরই স্থির বিশ্বাস, বাবু জলে ডুবে গিয়েছেন। বাড়িতে কান্নাকাটি। একমাস পরে বাবুর কুশপুতুল দাহ করা হ'ল, শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল।

"বাবু কিস্তিতে যাবেন কি! সঙ্গে ত পুঁজি তিন চারটে টাকা। দু-চারদিনে টাকা ফুরিয়ে গেল। খাবেন কি? তখন বাবু দাঁড় টেনে খোরাকী যোগাড় করলেন। ক্রমে এক মাস বা পঁয়ত্রিশ দিনে ফরাক্কাবাদ এলেন। এইবার সমস্যা, থাকবেন বা কোথায়, আর খানই বা কি? এক মহাজন দয়া করে তাঁকে থাকতে দিলেন ও পেট-ভাতার কাজ দিলেন। দিনের মধ্যে দশ-বারো ঘণ্টা খাটুনি। বাবু বাড়িতে চিঠি লিখবেন—পয়সা কোথায়? তখনকারদিনে নিয়মিত ডাকের ব্যবস্থা ছিল না। চিঠির মাশুল দূরত্ব ও চিঠির ওজনের ওপর

নির্ভর করত। কলকেতায় চিঠি পাঠাতে প্রায় এক টাকা লাগত। বাবু দুমাস বাদে কলকেতায় বাড়িতে চিঠি লিখলেন—সস্তায় কিস্তি পেয়ে ফরাক্কাবাদ এসেছি ; এখন এত টাকা পেলে বাড়ি ফিরতে পারি। মহাজনের নাম ও ঠিকানা দিলেন। বাড়ির লোক চিঠি পেয়ে বাবু বেঁচে আছেন জেনে খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু তখনকার দিনে টাকা পাঠানো সহজসাধ্য ছিল না ; হুণ্ডী কেটে টাকা পাঠানো হ'ল। মাস কয়েক বাদে বাবু হাঁটতে হাঁটতে প্রয়াগ, কাশী, গয়া হয়ে বাড়ি ফিরলেন,—নানা দেশের নানা গল্প করতে লাগলেন।

"টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর বন্ধুবান্ধবের 'সস্তায় কিস্তি পেয়ে ফরাক্কাবাদ' যাবার ঘটনা শোনালেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবুটিকে দেখা মাত্রই সবাই ফরাক্কাবাদ-ভ্রমণ কাহিনী শুনতে চাইতেন, তিনিও সবিস্তারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। এই থেকে 'সস্তায় কিস্তি পেয়ে ফরাক্কাবাদ' প্রায় প্রবাদে পরিণত হল।"

যমদত্ত এতক্ষণে থামলেন। হাস্যরোলে ঘর মুখরিত হ'ল। আড্ডাধারীদের তরফ থেকে চারুচন্দ্র বললেন, 'যতীন, তুমি কিস্তি মাৎ করলে।'

যমদত্ত হাতজোড় করে বললেন, 'তাই বলে আমায় ফরাক্কাবাদ পাঠাবেন না।' পুনরায় হাস্যরোল।

যমদত্তের লেখা ও বচন, দুই-ই সরস, সে-পরিচয় পাঠকেরা জানেন। এই ছবি দেখবার পর পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ঐ আড্ডার আরো গল্প কই ? তার উত্তরে বলি, আড্ডাধিপতি চারুচন্দ্র যেদিন ইহলোকের খেলা শেষ করে চকিতে অন্তর্ধান করলেন, সেদিন থেকে আড্ডা আর জমে না। সে যদুপতিই বা কোথায়, মথুরাই বা কই! সে রঘুপতিই বা কোথায়, উত্তর-কোশলই বা কই!

বনফুল

এক সময় 'শনিবারের চিঠি'তে বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার আগেই লিখেছি বাংলা ব্যঙ্গ-কবিতা সম্পর্কে প্রবন্ধ। দুটি ক্ষেত্রেই 'বনফুলে'র সম্পর্কে আলোচনা ছিল। তখনো তাঁকে চাক্ষুষ দেখি নি, আলাপ ত' দূরের কথা।

ব্যঙ্গকবিতায় বনফুল যে তীর ছোঁড়েন তা প্রাণঘাতী। আমাদের জীবনে আজ যত ভণ্ডামি ও ন্যাকামি দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে বনফুলের জেহাদ। বাঙালির প্রতি কবির উক্তি "পরশুরামের শেষ উক্তি (একশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর)" কবিতায় পাই—

অনেক কিছু বলিস তো,—দেখছি এবং যাচ্ছি সবই শুনে—
হাত পা নেড়ে নানান চালে অঙ্গভঙ্গি করিস্ নানা রকম,
কিছু তবু বলব নাকো, বাণগুলি সব রাখছি পুরে তূণে,
আর যা করি আঘাত হেনে করব নাকো আর পোকাদের জখম,
কুঠার দিয়ে মাছি কিংবা গদাঘাতে মারি না মৎকুণে,
যত ইচ্ছে ঘুরে ফিরে যতই খুশি করে যা বক্‌বক্‌ম!
আগে আগে চটে যেতাম, অনেক ঠেকে শিখেছি ভাই আমি,
তোদের পিঠের চেয়ে আমার জুতো জোড়া অনেক বেশী দামী।

বন্ধুর কাছে গবু ওরফে গোবর্ধন মিত্র তার জীবনের ট্রাজেডির বর্ণনা করেছে এইভাবে ("ট্রাজেডিবৃক্ষের আর একটি ফল")—বেহালার বাসে জনৈকা বীণা রায়কে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করছিল; বিয়ের পর গবুর মোহভঙ্গ হল—

সে কহিল, 'স্ত্রীর মোর বয়স চল্লিশ!
১৯০৯ সনে,
সে মোর বাবার সনে
করেছিল 'এন্ট্রান্স' পাস্।

বিয়ে করে শেষে দেখি আরে সর্বনাশ !'
কিছুক্ষণ পরে গবু কহিল আবার,
'এখন কেবল ভাই সান্ত্বনা আমার
এই দেখ্—' বলিয়া সে একখানি রুমাল খুলিয়া
সম্মুখেতে ধরিল তুলিয়া,
এবং কহিল পুন—'এমব্রয়ডারি ভাল করে,
ওইতেই আছি ভর্রপুর !'
দেখিলাম, রুমালেতে আঁকা এক কুব্জ ময়ুর !

আধুনিক জীবনে ঐ কুব্জ ময়ূর সম্বল—বাকি সবটাই ছলনা। ব্যঙ্গকবিতার দর্পণে এই ছবি কবি দেখিয়েছেন। বনফুলের ব্যঙ্গ-কবিতা আলোচনায় এই সব কথাই লিখেছিলাম মনে পড়ে।

আর বনফুলের ছোট গল্প ? Here is God's plenty—যত খুশি কুড়িয়ে নেবার সুযোগ পড়েই আছে। কেবল গল্পে ও ব্যঙ্গকবিতায় নয়, বনফুলের সকল রচনাতেই সাদর আমন্ত্রণ। নিত্য নবনব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন। বনফুলের গল্প পড়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে 'to open out the soul of little and familiar things'—এই ক্ষমতা আয়ত্ত করা বহু তপস্যাসাধ্য। দুটি গল্পের নমুনায় এই ক্ষমতার পরিচয় পাই।

প্রথম গল্প—'নিমগাছ'—সম্পূর্ণ ও অপরিবর্তিত রূপ—

"কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ ভাজছে গরম তেলে। খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই—কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে। যকৃতের পক্ষে ভারি উপকারী। কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক—দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশী হন। বলেন—

'নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।' কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না। আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে। শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর এক আবর্জনা। হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল,—'বাঃ, কী সুন্দর পাতাগুলি —কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কী বাহার—এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ —' খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে গেল। কবিরাজ নয়, নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে। ওদের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা!"

ব্যস্। গল্প শেষ। মাত্র আটাশটি ছোট বাক্যে গল্প খতম্। অন্য-একটি গল্প—'পরিবর্তন'—সংক্ষিপ্ত সার দিলাম।

যক্ষারোগাক্রান্ত হরিমোহনের স্ত্রী সরমার পতিসেবা ত্রুটিহীন। কিন্তু সেবাযত্ন সত্ত্বেও হরিমোহন মৃত্যুর দিকে ধীরে নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সরমা যেদিন বুঝতে পারল, হরিমোহনের জীবনের আশা কম, সেদিন সরমার এক অদ্ভুত আচরণ ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ল। সরমা গোপনে হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ খেয়েছে। তার যুক্তি—যদি স্বামী না বাঁচেন তবে তারই বা বেঁচে লাভ কি? এর ফলে সরমার দুটো লাংসই যক্ষাবীজের দ্বারা আক্রান্ত হল এবং তার মৃত্যু হল। এদিকে হরিমোহন কিন্তু মরল না। ধনী হরিমোহন সুইজারলাণ্ডে গিয়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে রোগমুক্ত হল। দেশে ফিরে আর-একটি বিয়ে করল। অবশ্য পতিব্রতা সরমাকে সে ভুলে যায়নি—ততটা হৃদয়হীন হরিমোহন নয়। তাই বেছে বেছে সরমা নামধেয়া একটি মেয়েকেই সে বিবাহ করে।

পতিব্রতার জীবনদানের কী পুরস্কার!

"নিমগাছ" আর "পরিবর্তন" গল্পদুটি থেকেই জীবনশিল্পী বনফুলের সম্যক্ পরিচয় পাই। কারুণ্যে নির্মমতায় বেদনায় মোহমুক্তিতে বনফুল যে কত বড় শিল্পী তার পরিচয় আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

'শনিবারের চিঠিতে (১৯৫৯) ঐ-সব আলোচনা পড়ে 'বনফুল' আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। 'চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বনফুলের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি বললেন,—'ওহে, অরুণ, বলাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। সে কলকাতায় আসছে। এলে তোমায় খবর দেবো।'

সেটা ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়াবি মাস। শীতেব সকালে বেলগাছিয়ায় সজনীদার বাড়ি সকাল আটটায় যেতে হবে, ডাক এলো। 'বনফুল' দেখার আগ্রহে রাজি হলাম। সজনীদা বললেন, "সাক্ষাৎকার আমার এখানে হবে না, হবে বলাইয়ের বড় ছেলের বাড়িতে। বাসে চলে যাও, সোজা গিয়ে নামবে সিঙ্গীবাগানে। সেখানে সি আই টি-র ফ্ল্যাট বাড়ি আছে এক সারি। চিনতে কোনই অসুবিধে হবে না। কোনো দ্বিধা করো না, সারা সকালটা বলাই তোমার জন্য রেখেছে।' আর দেরী নয়, এখনি যাও।"

অচেনা রাস্তায় অচেনা বাড়িতে অ-দেখা জনেব কাছে সজনীদা আমাকে ঠেলে পাঠালেন্। বাড়ি চিনতে খুব অসুবিধা হয়নি। সোজা চার তলায় উঠে কড়া নাড়লাম।

—কাকে চাই?

—ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে।

—কী দরকার?

—দরকার কিছু নেই। তিনি আমায় দেখা করতে বলেছেন।

—দাঁড়ান, খবর দিচ্ছি।

পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে খবর এলো। ভেতরে গেলাম। দক্ষিণ-

খোলা ঘর। শীতের রোদ এসে পড়েছে। জানালার ধারে একটি তক্তাপোষে বিশালবপু বনফুল আধশোয়া অবস্থায় বই পড়ছিলেন। গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। নমস্কার করে নাম বলার আগেই বনফুল বললেন—

"আপনিই ডক্টর অরুণ মুখার্জী? আসুন, আসুন। সজনী বলেছিল আপনাকে পাঠিয়ে দেবে। তা এত দেরী হল?"

বললাম, আমাকে বেলগাছিয়া হয়ে এখানে আসতে হয়েছে।

উৎসাহের আতিশয্যে উঠে বসলেন। অবশ্য খানিকপরেই আবাব শুয়ে পড়লেন। সামনে একটা চেয়ারে বসলাম। শুয়ে শুয়েই তিনি গল্প শুরু কবলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে গেলেন। আমিও 'বনফুল' থেকে 'বলাইদা'তে চলে গেলাম।

শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হল। তারপরই প্রসঙ্গান্তর। বেশির ভাগই ইংরেজি বইয়ের কথা। তাঁর হাতে ছিল একটি মার্কিন বই—ভৌগোলিক অভিযানের কাহিনী। খাটের চার পাশে নানা ইংরেজি প্রবন্ধের বই। চলতি বাংলা সাহিত্যের কথা প্রায় বাদই গেল।

খানিকটা গল্প করেই চিৎকার করে গৃহিণীকে ডাকলেন। বৌদিও দাদার মতই স্নেহশীলা ও আলাপী। তিনি হেসে বল্‌লেন, —"উনি বাইরে বাইরে সভাপতিত্ব করে বেড়াচ্ছেন, আর আমি ঘরে পত্নীত্ব করছি। মাঝখান থেকে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা দেখা হচ্ছে না।"

বলাইদা অভিযোগটা অগ্রাহ্য করে বললেন,—'অরুণের জন্যে সন্দেশ আনো'। সন্দেশ এলো, না না করেও খেতে হলো। মিনিট পাঁচেক গল্পের পর দাদার হঠাৎ খেয়াল হলো। বললেন— 'কই তোমায় সন্দেশ দিল না?' বললাম—'এই ত খেলাম।'

—কই খেলে? আমি ত দেখলাম না।

আশ্চর্য হয়ে বলি,—কয়েক মিনিট আগেই খেয়েছি।

দাদা বললেন,—না, না, ও-সব শুনছি না। কই গো, সন্দেশ আনো। শেষে বৌদি ও আমি দুজনেই শপথ করলাম। তখন দাদা বললেন,—আচ্ছা, তাহলে দু কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

ফের শুরু হল আড্ডা। বনফুল এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আমি কতকালের চেনা মানুষ। বিশালবপু বনফুলের দরাজ দিলের বাতায়নগুলি একে একে উন্মুক্ত হতে লাগল।

কখনো ক্ষোভ, কখনো ক্রোধ, কখনো হাসি, কখনো ব্যঙ্গ—বিচিত্র মানবিক অনুভূতিতে দোলায়িত বনফুল নানাবিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

হাতের বইটি দেখিয়ে বললেন,—'দেখেছ, এইসব পাশ্চাত্ত্য লেখকরা জীবনকে কত গভীর ও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। এদের মত তৃষ্ণা ও অভিজ্ঞতা পেলে আমাদের সাহিত্যের দৈন্য ঘুচে যেত।' কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কী কী বই পড়েছ?'

উত্তর দিলাম—পড়েছি অনেক, তবে সব বই আমার নেই।

—'ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি। একটা কথা আমার, দুটি বই খুব খেটে লেখা। 'স্থাবর' আব 'ডানা'। দুটিই আমাব প্রিয়। এই দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখি নি। কি জানি পাঠক ও সমালোচকের কেন এই ঔদাসীন্য?'

হেসে বললাম—'ওই দুটি বই বিজ্ঞানভিত্তিক। 'স্থাবব' গুহামানবের আদিম প্রবৃত্তি ও জীবনেব আলেখ্য আর 'ডানা' পক্ষিজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস। এ দুটোর কোনোটাই বগ্ রগে ঝালমশালাদার রমণীমোহন মিষ্টি কাহিনী নয়। অনেকে তো এ দুটিকে দুষ্পাচ্য তত্ত্ব বলেন। আসলে আমাদের মানসিক প্রবণতা মনন যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরোধী। তার ফলেই এই অনাদব।'

বনফুল গম্ভীর হয়ে বললেন,—'হয়ত তাই। কিন্তু কি জানো, বহুদিনের পড়াশুনার পর 'স্থাবর' লিখেছি। এব জন্যে কম বই

পড়েছি? আর 'ডানা' লেখার জন্য পক্ষিজীবন কেবল গ্রন্থে নয়, বিহারের গ্রাম অরণ্য নদীতীরে দেখে বেড়িয়েছি। এ দুটি তুমি যত্ন করে পড়ো। বিদ্যুৎ আবিষ্কার আর বিয়াল্লিশের আন্দোলন নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস আরো একটি লিখেছি 'অগ্নি'। ওটিও পড়ো।"

সেই দিনই বলাইদা আমাকে এক সঙ্গে দশখানি বই উপহার দিলেন—'স্বপ্ন সম্ভব', 'বৈতরণী-তীরে', 'বনফুলের গল্প সংগ্রহ', 'ওরা সব পারে', 'অগ্নীশ্বর', 'মহারাণী', 'তন্বী', 'ডানা' ঃ তিন খণ্ড। প্রথম আলাপে দশখানি বই উপহার পাওয়া যায়, একথা বললে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আমার জীবনে তাই ঘটল, বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম, কেননা টেবিলের উপর এই মুহূর্তে বইগুলি রয়েছে, লেখকের স্বাক্ষর রয়েছে—"ডাক্তার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—করকমলেষু। বনফুল। ২১-২-৬০॥"

আত্মপ্রচারের জন্য একথার উল্লেখ করছি না, বনফুলেব বিশাল হৃদয়ের ঔদার্য ও স্নেহের পরিচয়ের জন্যই সসঙ্কোচে এই ঘটনাব উল্লেখ করলাম।

কথায় কথায় বনফুল বললেন, 'একবার ভাগলপুর এসো।' হেসে বলি, 'দাদা, আমরা তো আপনার মত স্বাধীন নই। সরকারের দাসানুদাস। ছুটি কই, উপলক্ষ কই?'

দাদা গম্ভীর হয়ে বললেন,—'উপলক্ষ হবে।'

ঘণ্টা তিনেক আড্ডা মেরে যখন উঠলাম তখন শীতের দুপুর। দাদা বললেন, 'কিছুদিন কলকাতায় আছি। আবার এসো। গল্প করা যাবে।'

পরের বছর গ্রীষ্মকালে দেখা। সকালে গিয়েছি। খালি গায়ে পরনে লুঙ্গী, হাস্যোদ্ভাসিত আনন। বলাইদা বললেন, "এসো ভাই। তুমি ত ভাগলপুর গেলে না। আশা ছিল ওখানেই গল্প হবে। তোমাদের জন্যে জরদালু আম আর গো- -লভোগ মিষ্টি এনেছি। কই গো—"

স্নেহশালিনী বৌদি এলেন, কোনো আপত্তির অবকাশ দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে প্লেট এসে পড়ল। জরদালু আমের গুণব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আম খেতে হ'ল। সেই সঙ্গে আমের গল্প।

বনফুল বললেন, "জানো ভাই, সেকালে লোকে আমের জন্য কত কষ্ট করত। আমাদের বাড়ি মনিহারীতে।. সেখানে আমাদের চল্লিশ বিঘের আমবাগান আছে। আমাদের ছোটবেলার কথা। আমার পিতৃবন্ধু পুলিনবাবু ছিলেন আম-বিশেষজ্ঞ। অমন বন্ধু একালে দেখা যায় না। তিনি বাবাকে পরামর্শ দিলেন, আমবাগান করো। আমাদের জমি-জমার মাঝে চার বিঘে ছিল রাজু নাপিতের। সেটা পেলে টানা চল্লিশ বিঘে আমবাগান হয়। বাবা সেটা কিনতে চাইলেন। রাজু নাপিত বলল, 'ডাক্তারবাবু চাইছেন, তাঁকে আমি এমনই দেব। তিনি নিলে আমি ধন্য হব।' রাজু নাপিতের হৃদয়বত্তার কাছে আমরা পরাজিত হলাম। তারপর পুলিনবাবু মাল্‌দা থেকে পাঁচ-ছ'শ আমের চারা নিয়ে এলেন। একটা ঘর বেঁধে নিয়ে একটা মালী নিয়ে মাসখানেক ধরে আমের চারা লাগালেন। কালে সেই সব চারা গাছ বৃহৎ আমবাগানে পরিণত হ'ল। পুলিনবাবুর কোনো স্বার্থ ছিল না, বন্ধুকৃত্য মাত্র। আজকাল পুলিনবাবুর মত বন্ধু আব রাজু নাপিতের মত মহৎ সাধারণ লোক কোথায় ?"

আম্রপর্ব শেষ হল তো লিচুপর্ব শুরু হল। বিহারের বিভিন্ন এলাকার লিচুর গুণব্যাখ্যা শুনলাম। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন হল। নানা কথার পর বললাম "দাদা, রবীন্দ্রনাথের কাছে আপনি যান নি ?"

"হ্যাঁ, গিয়েছি। সাক্ষাৎকারের আগেই তাঁর সঙ্গে আমার মসীযুদ্ধ হয়েছিল—অবশ্য একতরফা। সেটা বোধ হয় ১৯৩৭ সাল। রামচন্দ্র, ঝা নামে এক ভণ্ড কালীমন্দিরে বলিপ্রথা তুলে দেবার জন্য অনশন হৈ-চৈ করে। রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করে এক কবিতা লেখেন। সে লেখা খুব সম্ভব প্রবাসীতে বেরিয়েছিল।

পড়ে খুব রাগ হল। সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় প্রতিবাদ লিখে ফেললাম —একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধির কঠোর প্রতিবাদ করলাম। সে সময় আনন্দবাজারের মালিক সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে একদিন দেখা। তিনি দোলসংখ্যা আনন্দবাজারের জন্যে লেখা চাইলেন। ঐ কবিতা তাঁকে দিলাম,—দেখুন, এটা ছাপতে রাজী আছেন কি না। সুরেশবাবু ওটা পড়ে রাজী হলেন। ছাপা হয়ে গেল। এবং যথাসময়ে ওটা কবির হাতে পৌঁছে দেওয়া হল। লোকের ত অভাব নেই! পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ছেলেটির লেখার ক্ষমতা আছে। কই সে ত কখনো আমার কাছে আসেনি?"

"শান্তিনিকেতনে পড়ত আমার এক বন্ধু। সে আমাকে বলল, 'জানিস, গুরুদেব তোর সম্পর্কে এই কথা বলেছেন।'

"আমি তোকে ঠাট্টা করে উত্তর দিলাম, "আমি একে ব্রাহ্মণ, তায় ডাক্তার, বিনা Call-এ কোথাও যাই না।'

'আমি কি আর জানি যে সে ছেলেটি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে কবিকে এই কথা বলে দিয়েছে! তার দু'দিন পরেই কবির স্বহস্ত-লিখিত চিঠি পেলাম—

"কল্যাণবরেষু, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবে। আগামী বসন্ত-উৎসবে শান্তিনিকেতনে আসিলে সুখী হইব। সস্ত্রীক আসিও। শান্তিনিকেতন দেখিয়া যাইবে। ইতি—আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"কী লজ্জা! ছি-ছি! কবি কি ভাবলেন!

"পত্রপাঠ বোলপুর রওনা হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। তারপর কত চিঠি তিনি লিখেছেন। তিনি যে কী রকম পরিহাসপ্রিয়, স্নেহশীল ও সমজদার লোক ছিলেন, তা বলে শেষ করা যায় না।

"একবার রাতে শুয়ে আছি। হঠাৎ কবির ভৃত্য বনমালী এসে হাজির! কি ব্যাপার? 'বাবুমশায় পাঠালেন, দেখে

আয়, বলাইয়ের মশারিটা গোঁজা আছে কি না, এখানে বড় মশা! তখন রাত দশটা। বলো এত স্নেহ, এত উদ্বেগ, এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, একি সাধারণে সম্ভব?"

বনফুল থামলেন। হয়ত সেদিনের সুখস্মৃতিচিত্রটি মনশ্চক্ষুতে দেখলেন।

প্রশ্ন করলাম—লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো উপদেশ কি আপনি পেয়েছেন?

সোজা হয়ে বসলেন বলাইদা। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। বললেন, "হ্যাঁ, তাঁর কাছে লেখা সম্পর্কে উপদেশ চেয়েছি। তিনি বলেছিলেন, 'নব্য লেখকদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ' সবচেয়ে ভালো, ওটা পালনের চেষ্টা করো। প্রতিদিন একটা নিয়মিত সময়ে লিখতে বসবে। লেখা আসুক আর না-আসুক। টেবিলে বসবে। লেখার চেয়ে বেশি পড়বে। আর কোনো মতবাদে আবদ্ধ হবে না।

"অন্য একদিনের কথা। যথারীতি চা-সন্দেশের পর গল্প শুরু হল। বনফুলের গল্প-উপন্যাসে বিহার রাজ্যের যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে তার কথা হচ্ছিল। মুঙ্গের, মনিহারি, কহলগাঁও, সাহেবগঞ্জ জামালপুর—এই সমস্ত নাম ঘুরে ফিরেই আসে। হবে না কেন, এই সব জায়গায় সঙ্গে তাঁর জীবন অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে আছে। মনিহারিতে জন্ম, সাহেবগঞ্জে স্কুলের জীবন, আর ভাগলপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চিকিৎসা ব্যবসা।

বনফুলের পরিচয় কি? তিনি ডাক্তার, তাঁর বাবা ডাক্তার, তিন ভাই ডাক্তার, ছেলে ডাক্তার। বনফুল ভোজনরসিক। বনফুল পুষ্পবিলাসী। বনফুল কুকুর ও পাখি পুষতে ভালবাসেন। বনফুল দুর্দান্ত পাঠক—প্রচুর পড়তে পারেন। এই বাহ্য। বনফুল জীবন-শিল্পী।

জীবনশিল্পী বনফুলের অপর পরিচয় বাক্‌কুশলী বনফুল। জমিয়ে আড্ডা তিনি দিতে পারেন। আনন্দ দিতে ও পেতে তাঁর সমান

আগ্রহ। বনফুলের গল্প বলার ঢঙটা আকর্ষণীয়। আরম্ভটা স্তিমিত, শেষটা চমকে দেবার মতো, নাটকীয়। আমার মনে হয় পক্ষি-বিজ্ঞানী অমরেশবাবু ও কবি আনন্দমোহনবাবুর মধ্যে বনফুল নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন—'ডানা' উপন্যাসের কবি ও বিজ্ঞানী, লেখকেরই দুই রূপ। গল্পবলিয়ে বনফুলের হাতে বিজ্ঞানীর দূরবীণ —এক এক সময় এক এক সীমাবদ্ধ বৃত্তের প্রতি তাঁর নজর। কাটা কাটা ছবিকে শেষকালে এক রঙীন আলোয় অখণ্ড জীবনচিত্রে পরিণত করেন।

নানা গল্পের মধ্যে জিজ্ঞাসা করলাম,—'১৯৩৪ সালের বিখ্যাত ভূমিকম্পের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? মুঙ্গেরে, না মনিহারিতে?'

বনফুল বললেন,—"তখন আমি ছিলাম ভাগলপুরে। ভূমিকম্পে মুঙ্গের প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভাগলপুর অতটা না হলেও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে সময় একটা একতলা বাড়িতে থাকতাম। ছোট সংসার, স্ত্রী, একটি মেয়ে, একটি ছেলে। ছেলেটি বাচ্চা। সামনের ঘরে ছিল আমার ল্যাবরেটরি, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি থাকত। পিছন দিকের ঘরে আমরা চারটি প্রাণী থাকতাম। ভূমিকম্প যেদিন শুরু হল সেদিনের দৃশ্য আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে। দুপুরবেলা। তখন ক'টা হবে? দুটো আড়াইটে। হঠাৎ সব ঘরবাড়ি মাটি কাঁপতে শুরু করল। দরজা জানালা খাট টেবিল উঠছে পড়ছে—কোন নির্মম অদৃশ্য হাত সেগুলিকে আছড়ে ভাঙতে চাইছে। তক্ষুণি স্ত্রী, মেয়ে আর বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে এক বস্ত্রে ছুটে বেরিয়ে গেলাম সামনের ফাঁকা মাঠে। তাতেই কি রক্ষা আছে? মাঠে কম্পনের তীব্রতা এত বেশী যে দাঁড়াবার উপায় নেই, আছড়ে ফেলে দেবে। পা টলছে। আমরা সবাই মাটি আঁকড়ে সেই মাঠে পড়ে রইলাম। চোখের সামনে দেখলাম আমার বাড়িটা ফেটে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভগ্নস্তূপে

পরিণত হল। নোতুন দামী যন্ত্রপাতি কিনে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি করেছিলাম, তা গেল। সংসারের সমস্ত জিনিসপত্র আসবাব গহনা—যা কিছু ছিল সবই ভগ্নস্তূপে চাপা পড়ল। চারদিকে হাহাকার। কান্নার রোল। পাগলের মতো লোক দৌড়াদৌড়ি করছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে চলে গেলাম আমার ছোট ভাই ভোলানাথের বাড়িতে। সে পাঁচমাইল দূরে বারারিতে থাকত। সে-ও ডাক্তার। দেখলাম তার বাড়িটা ভাঙে নি। সেইখানেই আশ্রয় নিলাম। পরদিন সকালে আবার এলাম। জিনিসপত্র যন্ত্রপাতি, গহনা, সব চাপা পড়েছে ভগ্নস্তূপে। যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। কুলি সংগ্রহ করে ঐ ইঁট কাঠ সরিয়ে যদি জিনিসপত্র উদ্ধার করতে পারি, এই কথা ভেবে বেরোলাম। আগের দিন এক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, গায়ে ছিল যে-পাঞ্জাবী, তার পকেটে মাত্র দুটি টাকা ছিল। তাই সম্বল। আর টাকা কোথায় পাব? কে দেবে? পোষ্টাপিস ভেঙে পড়ে আছে। কে টাকা তুলছে আর কে দিচ্ছে? ঐ দুটি টাকার কড়ারে চারটি কুলি সংগ্রহ করে গেলাম ভগ্নস্তূপ থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে। শীতের সকাল। গায়ে নেই গরম জামা। কুলিরা অনেক কষ্টে ইঁট কাঠ কড়ি বরগা রাবিশ সরাচ্ছে, আমি অদূরে একটা সাঁকোর ওপর বসে আছি, দেখছি আর শীতে কাঁপছি। এত কষ্ট করে ল্যাবরেটরি করেছিলাম—সব গেল—খালি এই কথা ভাবছি। অনেক কষ্টে মাইক্রসস্কোপ আর কোলোরিমিটারটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হল, কিন্তু কেমিক্যাল ব্যালান্সটা ভেঙে চুরমার। ওটা পাঁচ শ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। দুঃখে হতাশায় মনের মধ্যে শ্মশান-বৈরাগ্য দেখা দিল। চুপ করে সেই সাঁকোর ওপর বসে আছি, কুলিদের কাজ দেখছি, আর ভাবছি—এবার কী হবে?

"হঠাৎ এক মাতাল এসে হাজির। রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। পা টলছে, মুখে মদের গন্ধ, খালি গা, প্রায় উলঙ্গ।

টলতে টলতে এগিয়ে এলো, বিড়বিড় করে কি-যেন বলল। বুঝতেই পারি না। অনেক কষ্টে বুঝলাম ও আমার কাছে টাকা চায়, আরো মদ খাবে। মাতালকে কি বলি? বললাম, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। মাতাল বিশ্বাস করল না। জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল—'ঝুঠ্ বাত্। তুমহারা জেব মেঁ দোঠো রুপাইয়া হ্যায়, হামকো দো, শরাব পিউঙ্গা।' শুনে ত আমি অবাক। মাতালটা জানল কি করে আমার পাঞ্জাবীর পকেটে টাকা আছে। কী আর বলি? মাতালটা টলছে আর বলছে—'হামকো রুপিয়া দো।' টাকা দুটো পকেট থেকে বার করে দেখিয়ে বললাম, 'আর নেই, এই সম্বল, কুলিদের দুটো টাকাই দিতে হবে।' সে শোনে না। তারপর বলল—'অভী তুমকো বত্তীস্ রুপাইয়া মিল যায়েঙ্গা। তব মুঝকো দো রুপাইয়া জরুর দেনা পড়েগা। হম শরাব পিউঙ্গা।'

"লোকটা বলে কি? মাতাল এলোমেলো বকছে। এখন এই শ্মশানপুরীতে কে আমাকে টাকা দেবে? তবু রাজী হলাম তার প্রস্তাবে। লোকটা বিড়বিড় করে বকতে বকতে এগিয়ে গেল। টলতে টলতে সামনের ভাঙা বাড়ির আড়ালে চলে গেল।

"তারপর মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখি স্টেশনের দিকে রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ারগাড়ি এসে ঠিক আমার বাড়ি অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল আমারই কাটিহারবাসী পরিচিত এক রোগীর পুত্র আর পুত্রবধূ। ছেলেটি বলল—'ডাক্তার বাবু, আপনার কাছেই এসেছি। যাচ্ছিলাম কাটিহারে, ট্রেন আজ আর যাবে না, ভাগলপুরেই নামতে হল। জামালপুর মুঙ্গের লাইন ভেঙে গেছে। কাল সকালের আগে গাড়ি যাবে না।' মহা মুশকিল। আমি নিজেই স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে পথের ভিখারী, পরাশ্রয়ী। আমি এদের কোথায় আশ্রয় দিই। এ তো বড় ফ্যাসাদ হল।

"আমাকে চিন্তিত দেখে ছেলেটি বললে—'আমরা আশ্রয়ের জন্য

আসি নি। ট্রেন তো স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আর যাবে কোথায়? আমরা ট্রেনেই থাকব। আমরা এসেছি অন্য কাজে। আমরা ছজনেই ডায়বিটিসে ভুগছি। এসেই যখন পড়েছি আর একটা রাত আটকেই গেলাম, তখন আপনাকে দিয়ে ব্লাড আর ইউরিনটা পরীক্ষা করিয়ে নিই।' শুনে আমার কপালে করাঘাত করতে ইচ্ছে হল। ছেলেটির বাবা আমার রোগী। এরাও তাই। আমার উপর এদের আস্থা আছে। কিন্তু এখন এদের আস্থার মর্যাদা রাখি কি করে? যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার। কুলি চারটে তখনো ভগ্নস্তূপ সরাচ্ছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম—'দেখ আমার অবস্থা। রক্ত পরীক্ষার যন্ত্র মাইক্রসস্কোপটা উদ্ধার করেছি, কিন্তু আর সব তো ওই স্তূপের নীচে। তাই কি করে তোমাদেব কাজ করে দিই বল?'

"ছেলেটি শুনবে না। বললে—'যদি ইউরিনটা পরীক্ষা করা না যায় তবে অন্ততঃ রক্ত পরীক্ষাটা কবে দিন। আপনি আজ পারবেন না, ছু চার দিন বাদে ফলাফলটা ডাকে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।

"বললাম—'কবে আবার নোতুন করে প্যাথলজির কাজ শুরু করতে পারব জানি না।' ছেলেটি বলল—'ঠিক আছে, ছু' চাব দিন দেরী হবে তো কী আছে। আপনি আমাদের রক্তটা নিয়েই রাখুন।' ছেলেটি নাছোড়বান্দা। সেই ছুপুরে মাঠের মাঝে বসে ধ্বংসস্তূপের ধূলোবালি ঝেড়ে টেস্টটিউব আর অক্সেলেট বার করে ছু জনের রক্ত বার করে ব্যাগে ভরে রাখলাম। ওরা বত্রিশ টাকা ফী দিয়ে সেই গাড়িতে চড়েই স্টেশন ফিরে গেল।

"টাকাটা পেয়েই মাতালটাকে খোঁজ করলাম। কিন্তু, আশ্চর্য এই, চার পাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে আর দেখতে পেলাম না। লোকটা একেবারে নিশ্চিহ্ন।"

গল্প শেষ করে বনফুল একটু হাসলেন। বললেন, "তুমি না ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছিলে?"

বাধা দিয়ে বলি,—"এ তো অলৌকিক কাহিনী।

দাদা হেসে বলেন,—"এই তো ভূমিকম্পের কাহিনী—লৌকিক ধারণার ভিত্‌কে টলিয়ে দেয় এই অলৌকিকের ভূমিকম্প।"

আর-এক দিনের কথা। শীতের সকাল। আমরা দু চারজন সি আই টি ফ্ল্যাটের বাড়িতে বসে আড্ডা দিচ্ছি। সে দিন চায়ের সঙ্গে তেলেভাজা। বলাইদার সব রকম খাওয়ায় উৎসাহ প্রচণ্ড, তায় ডাক্তার। বললেন, 'গরম গরম তেলেভাজা খেলে অসুখ করে না। নাও খাও। হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন?' কি করি, গুরুজনের আদেশ শিরোধার্য।

বললাম—"দাদা, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা কী রকম ছিল? শরৎচন্দ্র, তাঁর মামা উপেনদা, আর আপনি—তিনজনেই ভাগলপুরবাসী। আপনাদের দানে বাংলাসাহিত্য—"

দাদা হাত তুলে বললেন,—"থাক, ও কথা। শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে থাকতেন তখন আমি ভাগলপুরে থাকি না। আর যখন ভাগলপুরে এলাম শরৎচন্দ্র তখন শিবপুর-সামতাবেড়ে-কলকাতা-বাসী। কাজেই দেখাসাক্ষাতের সুযোগ ছিল না। একবার শরৎ-চন্দ্র ভাগলপুরে গিয়েছিলেন তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তখন তিনি খ্যাতির মধ্যাহ্নে। আমি তখন ভাগলপুরে জো' প্র্যাকটিস করি। এখনকার মত নয়। রোগী দেখা ও বই লেখা—দুই-ই পুরোদমে চালাচ্ছি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মামার বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। উপেনদার বাড়ি এটাই। শরৎচন্দ্র এখানেই থাকতেন।

"শরৎচন্দ্রের কাছে যা গল্প শুনেছি, সে আর কী বলব ভাই। ও রকম গল্প-বলিয়ে দ্বিতীয়টি দেখলাম না। অরুণ, শরৎচন্দ্রের সেই বিখ্যাত গল্প—গুরুদেবের জা'হাজ ভক্ষণের গল্প—তুমি শুনেছ?"

বললাম, 'না।'

আড্ডার অন্য দু-একজন শুনেছেন। দাদা বললেন, "তাহলে গল্পটা আর একবার বলি।".

সেই খাটে দাদা আধশোয়া অবস্থায় আসীন। আমরা কেউ বা খাটের ধারে, কেউ-বা চেয়ারে, কেউ বা মোড়ায় চায়ের কাপ হাতে করে বসে। দাদা শুরু করলেন।

"তবে শোনো। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সকালে দেখা করতে গেছি। নানা কথার পর ভাগলপুরের কথা হল। শরৎচন্দ্রের কৈশোরে ভাগলপুর কী রকম ছিল। দুধ ঘি মাছ মাংস কত সুলভ ছিল, জলবায়ু কত স্বাস্থ্যদায়ক ছিল, এই সব কথা। শরৎচন্দ্রকে বললাম, আপনাদের সময়কার ভাগলপুরের গল্প বলুন।'

"শরৎচন্দ্র গুড়গুড়ির নল পরিষ্কার করছিলেন। বললেন, সে সময়কার কী গল্প তোমায় বলি বলত ? আচ্ছা, গুরুদেবের জাহাজ ভক্ষণের কাহিনীটা তোমায় বলি।

"আমরা তখন ছেলেমানুষ। ইশ্কুলে পড়ি। সে সময় ভাগলপুরে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, আদমপুরের ঘাটে এক সাধুবাবা এসেছে। তার কীর্তিকলাপ অসাধারণ। বেশবাসের দিকে আর পাঁচটা সাধুর মতই, সেই গেরুয়া আর জটাজুট। কিন্তু এই সাধুর নাকি অতি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ক'দিনের মধ্যেই তার খ্যাতি শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছে, কত জনের জীবনের কামনা সার্থক করে দিয়েছে। আবার কত কি আজগুবি কাণ্ডও দেখাচ্ছে। তখন আম কাঁঠাল-লিচুর সময় নয়। কেউ হয়ত গিয়ে বলল—সাধুজী, লিচু খাব। সাধুজী অমনি তার ঝোলার মধ্যে হাত পুরে এক ছড়া লিচু বার করে আনলেন। বললেন—লেও বেটা, খাও। এই সব অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড দেখে লোকে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে তাকে দেখতে যাচ্ছে। আদমপুর ঘাটে সব সময়ই ভীড়

হতে লাগল, অনেকে একান্ত ভক্ত হয়ে পড়ল, কেউ কেউ বা যথারীতি দীক্ষা নিয়ে শিষ্য হয়ে গেল।

হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার! শহরের লোক সব কিছু ভুলে গিয়ে সাধুবাবার কীর্তি দেখে আর অবাক হয়। একদিন সাধুবাবা তার শিষ্যদের বলল—'হম্ গঙ্গা মায়ী কো পূজা দেগা'! ভক্তরা শুনে ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে বলল—'সে আর এমন কি কথা গুরুদেব। আপনার অভিলাষ আমাদের কাছে আদেশ। পূজার যা কিছু নৈবেদ্য যা উপকরণ, সবই আমরা কাল এখানে হাজির করব। আপনি পূজার ব্যবস্থা করুন।'

"পরদিন সকালে ভক্ত শিষ্যেরা গঙ্গামায়ের পূজার প্রচুর উপকরণ এনে আদমপুরের ঘাটে হাজির করল। গঙ্গাতীরে বালির উপর একেবারে জলের কাছ ঘেঁষে বেদী তৈরী হল। থরে-থরে সব উপকরণ সাজানো হল। তখন প্রায় বেলা বারটা। সাধুবাবা এইবার পূজায় বসবে। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল। কার কোম্পানির বড় ষ্টিমারখানা তখন রোজই বেলা বারটার সময় আদমপুর ঘাট পাস্ করে যেত। প্রকাণ্ড জাহাজ, যেমন গুরু-গম্ভীর গর্জন, তেমনি ঢেউ তুলত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। সেই ঢেউ এসে গঙ্গামায়ের পূজার ফলমূল নৈবেদ্য চালকলা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শিষ্যেরা হায় হায় করে উঠল। সাধুবাবা গেল ক্ষে প। 'কী এত বড় স্পর্ধা সামান্য জাহাজের!' চিৎকার করে শাপ দিতে লাগল সাধুবাবা—'তোর এত সাহস বেড়েছে যে আমার পূজার উপকরণ ভাসিয়ে নিয়ে যাস! আচ্ছা, তোকে আমি মজা দেখাচ্ছি। কাল আয় বেটা তুই জাহাজ। এসেই ছাখ। তোর আমি কি করি! কাল তোকে আমি আস্ত গিলে খাব। কাল তোকে আর পালাতে দিচ্ছি না। আয় একবার!'

শিষ্যেরা সাধুবাবার কথা শুনে হতবাক্। গুরু বলে কি! অতো বড়ো একটা জাহাজ— তাকে আস্ত গিলে খাবে সাধুবাবা! এক

শিষ্য বলেই ফেলল—গুরুদেব, এ যে জাহাজ। সাধুবাবা ভীম গর্জনে বলল—হ্যাঁ, জাহাজ—জাহাজই আমি খাব। আমার এক কথা। কাল আমি ঐ জাহাজকে গিলে খাবই। ওর আর নিস্তার নেই।

"শিষ্যেরা স্তম্ভিত। মানুষ জাহাজ গিলে খাবে,—এও কি কখনো সম্ভব? শেষকালে এক শিষ্য বলল—'এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। গুরুদেবের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। সাধনার বলে গুরুদেব কী না করতে পারেন। জাহাজ ভক্ষণ তো তুচ্ছ! মহাপুরুষদের লীলাখেলা আলাদা রে ভাই!'

"তখন সবাই ভাবলে, তাহলে ত সম্ভব। এদিকে শহরময় এই উত্তেজক সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—আগামী কাল বেলা বারোটায় কার্ কোম্পানির বড় জাহাজখানা যখন আদমপুর ঘাটের কাছ দিয়ে যাবে, তখন সাধুবাবা ওটাকে আস্ত গিলে খাবে।

"এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা কে না দেখবে! শহর ছাড়িয়ে শহরের চার পাশের গ্রামে এই সংবাদ বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে গেল। পরদিন সকাল থেকেই আদমপুর ঘাটে লোক জমতে শুরু হয়ে গেল। দল বেঁধে আমরাও গেলাম। ও বাবা! এ কী ভীড়! বেলা যত বাড়ছে ভীড় তত বাড়ছে। অসংখ্য নরমুণ্ড। জনস্রোতের আর বিরাম নেই। ঘাটের আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় সবই নরমুণ্ডে ভর্তি। বড় বড় গাছ লোকে ভর্তি হয়ে গেল। শেষে জায়গা না পেয়ে অনেক দেহাতী লোক গঙ্গায় নেমে দাঁড়াল।

"এগারোটা হল। সাড়ে-এগারোটা হল। বারটা প্রায় বাজে। তখনো সাধুবাবার সাড়াশব্দ নেই। সে তখন গঙ্গাতীরে ধুনি জ্বালিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে। শিষ্যেরা লোক সরাচ্ছে —'হঠ যাও, হঠ যাও, সাধুবাবা ধেয়ানমে হৈঁ।' এদিকে লোকের ভয়-ভক্তি-উৎকণ্ঠা কৌতূহল যেন ফেটে পড়েছে।

"এমন সময়ে দূরে ধোঁয়া দেখা গেল। ঐ যে আসামী আসছে!

হৈ-হৈ করে উঠল সকলে। ঐ যে জাহাজ, ঐ যে জাহাজ। থেকে থেকে সেই বিশাল জনসংঘ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—গঙ্গামায়ী কী জয়। সাধুবাবাকো জয়!

"চিৎকার শুনে সাধুবাবার ধ্যান ভাঙল। তার পর গম্ভীর মুখে আসন ছেড়ে উঠে ধীর পদক্ষেপে নামল গিয়ে গঙ্গায়। বুক চিতিয়ে কোমরে দু হাত রেখে ডান পা এগিয়ে কোমর জলে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ভীম গর্জনে বলতে লাগল এগিয়ে-আসা জাহাজকে—'আজ তোর নিস্তার নেই। আয় বেটা। তোকে আজ খাই। তোর এত স্পর্ধা। আজ তোকে গিলেই খাব।'

"বলে আর গলা চড়ায়। সেই ভীম গর্জন শুনে তীরবর্তী কয়েক হাজাব লোক একেবারে চুপ। লোকের বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। কি অঘটনই না এখুনি ঘটবে। সমস্ত লোকে শ্বাসরুদ্ধ করে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে তো প্রপেলারে ভয়ংকর শব্দে প্রচণ্ড বেগে জল উৎক্ষিপ্ত করে জাহাজ এগিয়ে আসছে। এসে পড়ল জাহাজ। বড় বড় ঢেউ আছড়াতে লাগল আদমপুবের ঘাটে। অতিকায় স্টীমার অনিবার্য গতিতে এগিয়ে আসছে। সাধু হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'এসেছিস্ ?' এতক্ষণ কোমরে হাত রেখে বুক টান করে সাধুবাবা দাঁড়িয়েছিল। এখন গর্জন করে বলল—'আয় তবে। তোকে আজ খাই।' বলেই বিরাট এক হাঁ করে জাহাজের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

"ঠিক এমনি সময় হল কি জান? তীর থেকে দশ-পনেরো জন ভক্ত হঠাৎ হাউ-মাউ করে কেঁদে হুড়মুড় করে নেবে জলের মধ্যেই সাধুর পা জড়িয়ে ধরল।—'গুরুদেব, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন সাধুবাবা। নির্জীব অচেতন তুচ্ছ একটা পদার্থ এই জাহাজ। একটা অপরাধ করে ফেলেছে। গুরুদেব, আপনি দয়া করুন, মার্জনা করুন। এই জাহাজ কি আপনার ক্রোধের পাত্র? তার

ওপর রাগ করা কি আপনার সাজে। তা ছাড়া জাহাজে কত নিরপরাধ শিশু রয়েছে। ওরা তো আপনার চরণে কোন অপরাধ করে নি গুরুদেব! তবে কোন্ অপরাধে আপনি ওদের খাবেন?'

"শুনে সাধুর ভ্রূ কুঞ্চিত হল, হাঁ বন্ধ হলো। মুখ গম্ভীর করে খানিকক্ষণ কী ভাবল। তারপর এক গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে গম্ভীরস্বরে বলল—'আচ্ছা, ছোড় দেও। তুম্‌হারা বাত্ রহা বেটা।' তারপর জাহাজের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল—'যা বেটা, খুব বেঁচে গেলি আজ। তোর পুনর্জন্ম হয়ে গেল।'

জাহাজ ততক্ষণে সাধুকে ছেড়ে অনেক দূরে আপন গন্তব্য অভিমুখে চলে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উপস্থিত ভক্ত জনতা এক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—'সাধুবাবাকো জয় হো!'

বনফুল থামলেন। আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম। দাদা বললেন—'শরৎচন্দ্রের গল্প শুনতে চেয়েছিলে? কেমন লাগল?'

উত্তর দিলাম—'সাধুবাবার জাহাজ ভক্ষণের অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে কেবল শরৎচন্দ্র নয়, আপনিও জড়িত রইলেন। একেই বলে গল্প! দাদা, এবার উঠি।'

দাদা বাধা দিলেন—'না, না, বসো, এর মধ্যে যাবে কি?' ফের শুরু হল গল্প। কথায় কথায় বললাম,—'দাদা, জীবনে সবচেয়ে বড় কথা কী? আপনার লেখায় কোন কথাটাকে প্রধান বলে দেখাতে চেয়েছেন?'

শুনে দাদা গম্ভীর-মুখে বললেন—"তবে শোনো। একবার শাহান্-শা আকবর বেড়াতে বেরুবেন। রাজপুরুষেরা পথ সাফ করছে, লোক হঠিয়ে দিচ্ছে। কিছু দূরে পথের মাঝে এক ফকির শুয়ে আছেন। মহা মুশ্‌কিল। তাঁকে জোর করে সরানো যাবে না। তিনি অনুনয় শোনেন না। আকবরের কাছে খবর গেল— কী করা যাবে? তিনি বললেন, ঠিক আছে, বাধা দিও না। তারপর হাতীর পিঠে চড়ে শাহন্‌শা বেরুলেন। ফকির যেখানে

শুয়ে আছেন পথের মাঝে, সেখানে এসে আকবর হাতীর পিঠ থেকে নামলেন। কাছে গিয়ে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে বললেন —'আপনাকে আমি আগে দেখেছি রাস্তার পাশে বৃক্ষতলে। কবে থেকে আপনি পথের মাঝে এসেছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে ফকির বললেন, 'হাঁথ সমেটা জব্‌ সে।'—অর্থাৎ যে-দিন থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি, ভিক্ষা করি না, প্রত্যাশাও করি না, সেদিন থেকে বৃক্ষতলের আশ্রয়ও ছেড়েছি।' বুঝলে, এই হল আসল কথা। কোনো লোভ, প্রত্যাশা বা স্বার্থের আশায় নত হয়ো না। এর চেয়ে বড়ো কথা নেই।"

কথক থামলেন। বক্তব্যের গুরুত্ব ও কণ্ঠস্বরের গভীরতায় এই সত্য শ্রোতার চিত্তে দাগ কেটে গেল।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস ওরফে ব্রবি ও তার সহকারী শম্ভু ওরফে স্যাম্বো নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জরুরী ট্রাঙ্ককল পেয়ে সুপারসোনিক প্লেনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছল। কলকাতার ডিটেকটিভ ব্রজবিলাসের শিক্ষা এখানেই। তবে তার কর্মনৈপুণ্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বিলিতী ডিটেকটিভরাই তাকে খাতির করে ডেকে নিয়ে যায়। ইনসপেক্টর জন ব্রবিকে হীরে-চুরির কেস্ বুঝিয়ে দেবার আগেই ব্রবি জানতে চাইল, "ইয়ার্ডে টাইগার নামে কোনো কুকুর আছে? যদি থাকে তা হলে তাকে চাই।"

"কেস্ বুঝে নেওয়ার আগেই চাই?"

"আগেই চাই।"

তখন গোয়েন্দা-কুকুর টাইগারকে ব্রবির কাছে নিয়ে আসা হ'ল। জন বলল "অনেকগুলো ভাষা এ বেশ বুঝতে পারে। ইংরেজী ভিন্ন ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, এবং এশিয়ার ভাষার মধ্যে চীনে ভাষা খুব ভালই বোঝে। সংস্কৃত বললে মোটামুটি বুঝতে পারে। বাংল্যাও শিখেছিল কিছুদিন। তবে এখন হিন্দী শিখছে খুব যত্ন করে।"

শুনে ব্রবি খুশি হল। চুরি-কেস্‌টা শুনে ব্রবি এক পাইপ ওল্ড্ ইংলিশের সঙ্গে এক গ্রেন ভারতীয় গাঁজা মিশিয়ে নিল, তারপর পাইপ টানতে শুরু করল। কারণ এই মিশ্রিত তামাকে অধিকাংশ কঠিন সমস্যা সহজে সমাধান হয়ে যায়।

হীরে-চোর বারটনের সঙ্গে লড়াই করে কী ভাবে ব্রবি হীরে উদ্ধার করল ও ইংলিশ চ্যানেলের গভীর জলের নীচে কুস্তি করে

কী ভাবে স্যাম্বো বারটনকে বন্দী করে পুলিসের হাতে সঁপে দিল, সে কাহিনী আপনারা 'ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস' পড়লেই জানতে পারবেন।

হীরে-চোর বারটনের সঙ্গে ব্রবি-স্যাম্বোর প্রথম সাক্ষাৎকার অন্ধকার ঘরে। সেখানেই বারটন বিশেষ কৌশলে এদের পরাস্ত ও অজ্ঞান করে বড় থলের মধ্যে পুরে ফেলল। সেই সঙ্গে টাইগারকেও। পরে ব্রবি নিজেকে উদ্ধার করল। আর স্যাম্বো-বারটন কুস্তি করতে করতে ইংলিশ চ্যানেলের গভীর জলে গিয়ে পড়ল। তখন পকেটে তামাকের জন্য হাত ভরেই আঙুলে ঠেকল সেই চুরি-যাওয়া প্রকাণ্ড হীরে। টাইগার ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে ইঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল বাবটনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই যে লড়াই বেধেছিল. সেই সময় সে তার বুকপকেট থেকে ঐ হীরেটি পকেট সুদ্ধ ছিঁড়ে নিয়ে ব্রবিব পকেটে রেখেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব্রবি টাইগারকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করল।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দুদিন পরে ব্রবিকে অভিনন্দিত করা হয়। সেখানে ব্রবি জানাল, "টাইগার না থাকলে হীরক উদ্ধার অসম্ভব হত। টাইগার চোরের উপব বাটপাড়ি করেছে।" শুনে টাইগার লজ্জিত, নতলাঙ্গুল।

তখন সর্বসম্মতিক্রমে টাইগারকেই শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদক`টি দেওয়া হল.। পদক পেয়ে টাইগার বিষম বিব্রত, সে ছটফট করতে লাগল। এমন সময় আশ্চর্য কাণ্ড! টাইগার হঠাৎ মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের গলা থেকে পদকটি খুলে ব্রবির গলায় পরিয়ে দিয়ে তার কানে কানে বলল, "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।" এবং বলেই সভা থেকে পালিয়ে গেল।

একটি অতি উপাদেয় ব্যঙ্গকাহিনীর সারাংশ দিলাম। এর থেকেই কাহিনীকারকে চিনে নিতে পারি। তিনি বাক্‌কুশলী

আড্ডাধারী পরমরসিক শ্রীপরিমল গোস্বামী। তাঁর আড্ডায় যে বসে নি, তার জীবনই বৃথা। অগ্রজপ্রতিম গোস্বামীর কাছে দুদণ্ড বসলে মনের পরমায়ু বেড়ে যায়।

নির্মোহ বিজ্ঞানবুদ্ধি আর শাণিত ব্যঙ্গের সংযোগে তাঁর সরস মনটি তৈরি হয়েছে। সেই মনের আলো পড়ে তাঁর চারপাশে। সে-আলোয় আমরা সবাই পথ দেখেছি। 'যুগান্তর' আপিসে তাঁর বৈকালিক আড্ডা তাই মৌতাতের পরমতীর্থ। চায়ের অনুপান সরস গল্প, না, সরস গল্পেব অনুপান চা, বলা কঠিন। কিন্তু একথা বলতে পারি, তার ফলে পরিবেশ হয়ে ওঠে পবম উপভোগ্য।

পরিচ্ছন্ন মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট। চশমাব ভেতব দিয়ে শাণিত জিজ্ঞাসা-মুখর দুটি চোখ। মৃদু সস্মিত হাসি আর সুনির্বাচিত সংযত অব্যর্থলক্ষ্য সবস মন্তব্য : এ সব নিয়েই শ্রীপবিমল গোস্বামী।

মাঝে কয়েক সপ্তাহ যেতে পাবি নি। তাবপর এক বিকেলে তাঁর আড্ডায় উপস্থিত হলেম। তখন তিনি আসেন নি। তাঁব দুজন সহকারী সবে ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে আসব সাজাচ্ছেন। একটু পরেই তিনি এলেন। প্রশ্ন কবলেন, "কি, অনেকদিন আসো না কেন?"

"আজ্ঞে, শরীবটা খারাপ, তাই বেরোতে পারি নি।" গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এলো, "হুঁ, লেখক বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, এদিকে প্রতি সপ্তাহে একখানি করে বই বেরোচ্ছে।" অপরাধের মধ্যে ঐ সময়ে আমার খানতিনেক বই মাস খানেকের মধ্যে বেরিয়েছিল।

টেবিলের অপর দিকে সহকারীকে উদ্দেশ করে বললেন, "অটোগ্রাফ বুক্‌টা দাও।"

অটোগ্রাফ-বুক্? একটু বিস্মিত হলেম। সহকারী কোনো কথা না বলে অ্যাটেনডেন্স-রেজিষ্টার এগিয়ে দিলেন। সেটি খুলে সেদিনের তারিখে বড়ো অক্ষরে লিখলেন, 'পি জি।' হ্যাঁ। তাঁকে

বাংলার পি. জি. ওডহাউস মনে করতে পারেন। তারপর শুরু হল তাঁর সরস আড্ডা।

অন্যদিনের কথা। গোস্বামীজি বাড়ি বদলেছেন, সুকিয়া অঞ্চল থেকে উঠে গেছেন সিঁথিতে। বাড়ি বদলানোর ও যাওয়া-আসার হাঙ্গামা সেদিনকাব আলোচ্যমান বিষয়।

গোস্বামিজী গম্ভীর হয়ে বললেন, "কলকাতা শহরে বাড়ি পাওয়ার সমস্যা চরমে উঠেছে। অনেকে শুনেছি আত্মীয়বাড়িতে থেকে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ যৌবন বয়সে খুঁজতে আরম্ভ করে বুড়ো হয়ে পড়েছেন। এখনও বাড়ি পান নি।"

শুনে শ্রোতাবা মুচকে হাসলেন। কথক তা গ্রাহ্য না করে বলে চলেন, "বুদ্ধিমানবা দেখেছেন বাড়ি খোঁজাব চেয়ে বাড়ি করা ঢেব সোজা। তাই কলকাতার বাইরে বহু দূরেও অনেকে বাড়ি করেছেন যাতায়াতের কষ্ট স্বীকাব কবেও। কিন্তু যাতায়াতে কষ্টও এখন এমন চরমে উঠেছে যে, বাড়ি পাওয়ার মতোই বাসে বা ট্রেনে একটুখানি স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।"

এই সত্য আমরা প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। সুতরাং এক বাক্যে উপস্থিত সকলেই ঘাড় নাড়েন।

আড্ডার প্রধান গোস্বামিজী বলতে থাকেন, "বুদ্ধিমানেরা এখানে হার মেনেছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ট্রেনে বা বাসে স্থান খোঁজার চেয়ে মোটরগাড়ি কেনা সহজ। কিন্তু এখন দেখছেন এখানে টাকা এবং বুদ্ধি দুই-ই প্রায় হার মানছে। যুদ্ধের সময় কলকাতায় ট্রামে বাসে যেমন ভিড় হয়েছিল এখন আবার সেই রকম হতে শুরু করেছে।"

শুনে এক শ্রোতা আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, বললেন, "কলকাতা এখন একটা নরক হয়ে উঠেছে। একে ছেড়ে যাওয়াই ভালো।"

উনি বললেন, "আহা, কথাটা শুনুন। সে সময় আমি ট্রামে বাসে নিজে যাতায়াত করেছি। বহু রকমের বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছি। তার মধ্যে চরমতম মনে হয়েছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বিপর্যয়। তখন আপিসের বেলা। ঘটনাস্থল—ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস। আমি সেই গাড়িতে ছিলাম। খুব ভীড়। কোনো রকমে চাপ সহ্য করেও দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রাম চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। বেচু চাটুজ্জে ষ্ট্রীটের মোড়ে ভদ্রলোক নামবেন। কোন রকমে ঠেলেঠুলে চেঁচিয়ে, অন্য যাত্রীকে চেপে এবং নিজে তাদের চাপ সহ্য করে এসে নামলেন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর। কিন্তু তার পরে যা ঘটল তা অবর্ণনীয়। দেখা গেল, ভদ্রলোক যে লম্বা গলাবন্ধ কোটটি পরেছিলেন সেটি গায়ে ঠিকই আছে—কিন্তু পরনে ধুতিটি নেই। অনেকের চাপে আটকা পড়ে নামবার সময় সেটি খুলে কখন বেরিয়ে গেছে তিনি টের পান নি. পথে নেমে টের পেলেন। তারপর চিৎকার। ট্রাম তখন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সে চিৎকার এমনই ভয়ংকর যে, তাতে কাজ হল, ট্রাম থামল এবং যাত্রীরা অনেক কষ্টে তাঁর ধুতি উদ্ধার করে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। সে ট্রাজেডি সম্পূর্ণ কমিক এবং প্রত্যেকটি যাত্রী সেদিন দেহের চতুর্দিকে অসম্ভব রকমের চাপ সহ্য করেও যে পরিমাণ হেসেছিলেন তার সম্ভবত তুলনা নেই।"

শুনে শ্রোতারা যে পরিমাণ হাসলেন তাও নিতান্ত কম নয়।

আগেই বলেছি, উনি সিঁথিতে নোতুন বাড়িতে উঠে গেছেন। পুরনো বাড়ির চেয়ে নোতুন বাড়ি কতটা ভালো, এ কথাই একজন গোস্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। উনি একটু হাসলেন। আজকের দিনে ভাড়া বাড়ির ভালো-মন্দর কোনো প্রশ্ন না তোলাই উচিত, সম্ভবত একথাই ইঙ্গিত করলেন।

আড্ডা তখন ভাড়াবাড়ি ও নিজের বাড়ির সুবিধা-অসুবিধা এবং

বাড়ি ভাড়ার সমস্যা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো। নানা জনে নানা মত দিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা বলি, দাদা, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

দাদা তখন চা আনবার হাঁক দিলেন। তারপর বললেন, "বাড়ি ভাড়ার সমস্যা আধুনিক জগতের সর্বত্রই এক। বিলেতে এ নিয়ে মজার গল্প আছে। এক বাড়ির মালিক ভাবী ভাড়াটেকে ঘর দেখাচ্ছেন। ঘর পাওয়াই দায়, পছন্দের আর সুযোগ কোথায়? তাই যে ঘর দেখালেন, তাই তাঁর পছন্দ হল—তবু বিনীতভাবে বাড়িওয়ালাকে বললেন, এই ঘরটা অবশ্যই নেব, তবে একটি অনুরোধ রাখতে হবে—পাশের ঐ ইঁদুরের গর্তটা বুঁজিয়ে দিতে হবে। বাড়িওয়ালা বিস্মিত। বললেন—সে কি কথা, এইটেই তো হচ্ছে গিয়ে রান্নাঘর।"

হাসির মধ্যেই চা এলো। চা খেতে খেতে বললেন, "এক ইংরেজ রসিক ব্যক্তি বলেছেন, বাড়ি ভাড়া পাওয়া যখন সমস্যা হয়ে ওঠে, তখন শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে বাড়িওয়ালিকে বিয়ে করা। ওদের দেশে তবু এই একটি পথ খোলা আছে। আমাদের দেশে এ সুযোগও নেই।"

আড্ডায় একজন টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাল্‌তু থেকে হাওড়া পাগলের মতো বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কথাটা তাঁর বেদনার তারে ঘা দিল। ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক বলছেন, দাদা। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী।"

দাদা তাঁর দুঃখভার লঘু করার অভিপ্রায়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন "তোমার মতো হতভাগ্য বিলেতেও আছে। সন্ধ্যার কুয়াশায় টেমস নদীর ধারে একটি লোক ক্লান্তভাবে বসেছিল। সে সারা দিন বাড়ি খুঁজেছে, পায় নি। এমন সময় দেখে তার পরিচিত একটি লোক জেটির উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে হঠাৎ যেন জলে পড়ে গেল। পরিষ্কার দেখা গেল না, তবু মনে হ'ল পড়েই গেছে। সে কোথায়

থাকত তা তার জানা ছিল। সেখানে ছুটে গিয়ে সে বাড়িওয়ালাকে বলল, 'এ বাড়ির একটি ঘরে যে লোকটি থাকত সে আমার পরিচিত। সে জলে পড়ে গেছে, তার ঘরটা আমি ভাড়া নিতে চাই।' বাড়িওয়ালা গম্ভীর ভাবে বলল, উপায় নেই, যে লোকটা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, সে-ই ও ঘরটা কয়েক মিনিট আগে নিয়ে নিয়েছে।"

হাস্যরোলের প্রবাহে অনিকেত জনেব দুঃখ ভেসে গেল।

আব এক দিন বক্তৃতার কথা হচ্ছিল। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসবে বক্তৃতার বায়না যে পরিমাণ বেড়েছে তা চিন্তাব বিষয়। যাঁরা বক্তৃতা কবে থাকেন, তাঁদের প্রাণান্ত। রায়না থেকে রায়গঞ্জ, কার্শিয়ং থেকে কুল্‌পি পর্যন্ত রবীন্দ্র-শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জোয়ার।

আড্ডার এক প্রবীণ সদস্য আব এক প্রবীণ বক্তাব দুঃখেব কাহিনী নিবেদন করলেন। ধরুন, শেষোক্ত জনের নাম—ক বাবু। ক—বাবু একটা সভায় গিয়েছেন। সঙ্গে আছেন খ—বাবু। একজন সভাপতি, অপর জন প্রধান বক্তা। দুজনেই ভেবে-চিন্তে সাত আটটা 'পয়েন্ট' তৈরি করে গেছেন। সভাব উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এই দুজনের পরিচয় দিতে উঠলেন। এঁদের পরিচয়দান বাহুল্য মাত্র, এই ভূমিকা করে সে দিনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সামান্য দুটি কথা বলে ক্ষান্ত হবার সংকল্প জানালেন। তারপর ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে "দুটি কথা" বললেন। এদিকে ক—বাবু ও খ—বাবু, উভয়েরই সংকট ঘনিয়ে এসেছে। কারণ তাঁরা ভেবে-চিন্তে যে ক'টা 'পয়েন্ট' তৈরি করে এসেছিলেন, সব ক'টাই এই ব্যক্তি বলে ফেল্‌লেন। ক—বাবু আর খ—বাবু পরস্পরকে ইশারা করছেন আর আঙুল নেড়ে জানাচ্ছেন 'আমার একটা পয়েন্ট গেলো', 'আমার দুটো পয়েন্ট গেলো'—'ইশ্‌ শ্‌—আমার আর একটা পয়েন্ট গেলো।'

ঘর্মাক্ত পরিচয়দাতা যখন থামলেন, তখন ক—বাবুর পালা। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সবিনয় নিবেদন করলেন, "দেখুন, এ বিষয়ে আমি ও আমার বন্ধু কয়েকটি পয়েন্ট ভেবে তৈরি হয়ে এসেছিলাম। তা দেখুন, উনি সব কটাই বলে দিয়েছেন। আমার জন্য আর কিছু বাকি নেই। তাই আমার ভাষণ এখানেই শেষ করছি।"

গল্পটা শুনে গোস্বামীজি মৃদু হাস্য করলেন। তারপর মুখ খুললেন।

"বিলেতে এর চেয়ে ভাল গল্প চলতি আছে। এক সভায় দুজন বক্তা ভাষণদানের জন্য আহূত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম জন কুশলী বক্তারূপে বিশেষ খ্যাতিব অধিকারী। দ্বিতীয় জন এঁর পাশে বক্তৃতায় দাঁড়াতেই পারেন না। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট, কিন্তু খুব চতুর।

প্রথম ব্যক্তির সুন্দর ভাষণ শুনে সভাস্থল নিস্তব্ধ, সভাজন মন্ত্রমুগ্ধ। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির পালা। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীরভাবে শুরু কবলেন, 'লেডীস্ অ্যাণ্ড জেণ্ট্‌লমেন, আজ সভাস্থলে আসার আগে আমরা দুজন চুক্তি করে এসেছিলেম যে, আজ আমার বক্তব্য উনি বলবেন'—বলে সদ্য-বক্তৃতা-সমাপনকারী বিজয়-গর্বিত প্রথম বক্তার দিকে ইঙ্গিত করলেন,—'আর ওঁর বক্তব্য আমি বল্‌ব। আমি সেজন্যেই তৈরি ছিলাম। দুঃখের বিষয়, ওঁর দেওয়া বক্তৃতার সারাংশ-লেখা চিরকুট্‌টি এইমাত্র হারিয়ে ফেলেছি। তাই ওঁর বক্তৃতাটা আর আমি আপনাদের শোনাতে পারলাম না'।"

আড্ডার হাস্যরোলের মধ্যেই বক্তৃতা-গবেষণা শেষ হলো।

আর এক দিনের কথা বলি। সেদিনের আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল, পাগল। বস্তুতঃ ধীরভাবে বিচার করলে সবাইকে পাগল বলা যায়। কেউ বই-পাগল, কেউ বৌ-পাগল। কেউ নেশা-

পাগল। কেউ-বা লেখা-পাগল। বিচিত্র সংসারে পাগলের অভাব নেই। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই পাগল দেখতে ও শুনতে পাবেন। যে লেখে আর যে পড়ে, দুই-ই পাগল। তবে শুনেছি, লেখক-পাগল অথবা পাগল-লেখকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পাঠকমাত্রেই পঠিত গ্রন্থের লেখকের উদ্দেশে দু'একবার বলেছেন, 'লোকটা পাগল। কী যা-তা লিখেছে!' কিন্তু তাই বলে পাঠক-পাগল বা পাগল-পাঠকও কম নয়।

যুগান্তর সাময়িকী দপ্তরে মাঝে মাঝে পাগলের আবির্ভাব হয়। অগ্রজ গোস্বামী সেদিন তাদের কথাই বলছিলেন।

আমরা উৎসুক হয়ে বসি। এইবার গল্প-পাগলের আবির্ভাব হবে।

গোস্বামীজি বাহ্যতঃ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শুরু করেন—"একবার একটি চিঠি পাই, এবং সে চিঠি পড়েই বোঝা গেল পাগলের লেখা। ঐ একই পত্রলেখকের লেখা একই বিষয়েই চিঠি পর পর কয়েকদিন ধরে এলো। তার একটা বিশেষ আদেশ ছিল যা সাময়িকী-সম্পাদকের অবশ্য পালন করতে হবে। আদেশ এই—সাময়িকী বিভাগ থেকে যেন 'পামেলার হৃদয়' অন্য কোথাও সরানো না হয়, যেখানে আছে সেইখানেই যেন থাকে।

"ভিয়েনা থেকে ডাক্তার অশোক বাগচী একটি লেখা পাঠান, লেখাটির নাম 'পামেলার হৃদয়'। পামেলা একটি মেয়ে। তার হৃৎপিণ্ডে কী ভাবে একটি বিশেষ ধরণের অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয়, তার বিবরণ। লেখাটি শল্য চিকিৎসার অগ্রগতির পরিচায়ক। এই লেখা ছাপা হওয়ার পর পাগলের ঐ চিঠি আসে। কয়েকখানা আদেশপত্র লেখার পর কোনো জবাব না পেয়ে সে নিজেই এসে হাজির হলো একদিন। নাম শুনে পত্রলেখককে চিনলাম। বয়সে তরুণ। এসেই জানতে চাইল তার লেখার উত্তর দেওয়া হয়নি কেন। কোনো কৈফিয়তেই সে সন্তুষ্ট নয়। রুষ্ট ও গম্ভীর এই ছেলেটিকে

দেখে খুব ভরসা পাচ্ছিলাম না। একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করে, আরো গম্ভীর হয়ে যায়। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটার আশংকা। খানিক পরে সে জানতে চাইল, 'ইতশ্চেতঃ কে লেখেন?' আমি খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, 'ওতো কোনো একজন লেখেন না। আপাততঃ পালা করে দুজন লিখছেন। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট্ পুলিশ কমিশনার পঞ্চানন ঘোষাল, আর একজন ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ।'

"ছেলেটি গম্ভীবভাবে কিছুক্ষণ আমাব দিকে তাকিয়ে বইল। তারপর হঠাৎ উঠে চলে গেল। সেই থেকে আর আসেনি বা চিঠি লেখেনি।"

সংকটমুক্তিব স্বস্তিতে শ্রোতাবা এতক্ষণে প্রাণখুলে হাসলেন। কথক গম্ভীবভাবে বললেন, "এব চেয়ে ভালো পাগল এই দপ্তবেই দেখেছি।"

নোতুন বসেব আশায় আমবা উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

কথকতা শুরু হলো।

কয়েক বছর আগে এক প্রৌঢ় এবং সদাশয় পাগল ছড়ি হাতে মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে সাময়িকী বিভাগে এসে প্রবেশ কবলেন এবং একখানা চেয়াবে বসেই বললেন,—'আমি যুগান্তবের মালিক, আমাকে চা খাওয়ান।' বলে মুখে তৃপ্তিব হাসি ফুটিয়ে আনন্দে হাঁটু নাচাতে লাগলেন।

"চা তখনই এসেছিল, খুব তৃপ্তির সঙ্গে তা খেয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দিন দিন, সিগাবেট দিন।' তাও তাঁকে দেওয়া হলো। আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি যুগান্তবেব ষোল আনা মালিক?' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আগন্তুক বললেন, 'আজ্ঞে, হাঁ, আমি ষোল আনা মালিক।' বললাম, 'তা হলে তো আপনার সঙ্গে এতদিন আমাদেব পবিচয় না হওয়ায় বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, 'হাঁ হয়েছে।'

"বললাম, 'অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি উপরে যান, সেখানে খোদ সম্পাদক আছেন, তাঁর সঙ্গে আগে পরিচয় করে আসুন।' আগন্তুক খুব খুশি হয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। তারপর কি হয়েছে আর জানি না।"

শ্রদ্ধেয় কথক থামলেন। শ্রোতারা এতক্ষণে প্রাণখুলে হাসলেন। আড্ডা শেষ হবার আগে গোস্বামীজি শেষ অস্ত্র ছাড়লেন, —"এক পাগলের কাছেই শুনেছি—পাগল এন্তার পাওয়া যায় এখন।"

সজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথের ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় মহর্ষি বাল্মীকির অলৌকিক কাব্যপ্রেরণা লাভের যে অনুপম দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে, তা পাঠক-মাত্রেই জানেন। এই কবিতার সূচনাংশে আছে—

‘যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল
তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেই মতো বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি—

সজনীকান্ত দাসের প্যারোডি শুরু হয়েছে এই কবিতার অনুকরণে—

‘যে দিন তিব্বত হতে নামি আসে অশ্বতর দল
পার্বত্য ভেড়ার লোমে কুব্জ পৃষ্ঠ, চরণ বিকল,
অতিক্রমি সুদুর্গম গিরিশৃঙ্গ, কালিমপন ধাপে,
রংফুরে পশ্চাতে রাখি, ভুটান পাহাড়ে রাখি বামে,
একে একে দেখা দেয় উলের গুদাম সন্নিকটে,
অশ্বতর ক্ষুরাঘাতে ধূলিজাল গগনের পটে যেমনি
আবর্তি উঠে আঁধারিয়া দিক্‌চক্রবাল ধূলি সমাচ্ছন্ন
গিরি··· ··

সেই মতো কবি ভূতনাথ
উত্তপ্ত প্রভাতবেলা, পটল ডাঙ্গার পূর্ব মোড়ে

অশান্ত উদ্বেগ ভরে ভ্রমিছেন পীতলুঙ্গি পরে
নিতান্ত একাকী—একা।'

তিরিশের দশকের তরুণ বাংলা সাহিত্যের রুচিহীন দেহ-ধর্ম ও অশ্লীলতার আস্ফালনকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছিলেন সজনী-কান্ত। উপরোক্ত প্যারোডি তারই নমুনা। গভীর-গম্ভীর রোমান্টি-কতার স্থানে এসেছে লঘু চটুল অসঙ্গতি, অতিরঞ্জনের ফলে মূল কবির বিশিষ্ট চিত্রপ্রবণতা সম্পূর্ণ অন্য কর্মে প্রযুক্ত হয়েছে, আর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল তরুণ কবি 'ভূতনাথ' এক আঘাতে হয়েছেন চিৎপাৎ। এই অব্যর্থলক্ষ্য সব্যসাচী সজনীকান্ত তাঁর ইহলোকের খেলা শেষ করে অন্য দুনিয়ায় খেলা দেখতে চলে গেছেন, রয়ে গেছে তাঁর অজস্র স্মৃতি।

সজনীদাকে সাত বছর ধরে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনেছি। দিনের পর দিন তাঁর বাড়িতে আড্ডা দিয়েছি। সেই বেলগাছিয়ার বাড়ির দোতলার ঘরে পশ্চিম দিকের শার্সীবদ্ধ জানালা দিয়ে অপরাহ্নের রোদের আলো এসে পড়েছে। পূর্বাস্য হয়ে লুঙ্গী পরিহিত সজনী-কান্ত চেয়ারে বসে আছেন। হাতে ধূমায়মান গোল্‌ড্‌ফ্লেক, বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে কৌতুক-উজ্জ্বল মুখে গল্প করছেন, সস্নেহ উদার কণ্ঠে 'এসো ভাই' বলে ডাক দিচ্ছেন।

এই ছবিটি আজো চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই চড়া গলায় ডাক—'সুধা, সুধা, অরুণ এসেছে, চা দাও।' স্নেহশালিনী হাস্যমুখী বৌদি এগিয়ে এসেছেন, বসতে অনুরোধ করেছেন।

এক দিন কলেজ-ফের্তা সজনীদার বাড়ি গিয়েছি। সেদিন পাটুদাও (শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ছিলেন। সুধা-বৌদি এসে জানিয়ে গেলেন,—'বসুন, বেগ্‌নী করছি।' সজনীকান্ত শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। গল্প হচ্ছে, সজনীদা মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছেন—'কতদূর?' সুধা-বৌদি একটি কচি ভুট্টা নিয়ে এসে সজনীদাকে বললেন—'তুমি, ততক্ষণ এইটা খাও।' সজনীদা চেয়ারে উঠে

বসলেন—'কোথায় পেলে?' বৌদির উত্তর—'মার্কেটে গিয়েছিলাম, সত্ত বাজারে উঠেছে দেখে তোমার জন্তে এনেছি। কেমন, ভাল না?'

ছু'কামড় দিয়ে সজনীদা উত্তর দিলেন—'হুঁ, ভাল। বেশ কচি। কী রকম কচি জান? তোমাকে যখন প্রথম বিয়ে করে নিয়ে আসি, সেদিন তুমি যেমন কচি ছিলে, এই ভুট্টা তেমনই কচি।' বলেই ভুট্টায় আর-এক কামড়। বৌদি লজ্জায় অন্তর্ধান করলেন। আব আমরা? আমরা তখন মনোযোগের সঙ্গে দেওয়াল-ঠাসা আলমারির বইগুলি নিরীক্ষণ করছি।

সজনীদা হাড়ে-হাড়ে রসিক ছিলেন। আড্ডায় তাঁর মুখ খুলত। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতায় তিনি ততটা সফল নন, যতটা মজলিশী আড্ডায়। আশ্চর্য তাঁর স্মরণশক্তি। নিজের সমগ্র রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বহু তথ্য সাল তারিখ তাঁর করায়ত্ত ছিল, মুহূর্তের মধ্যেই তা ব্যবহার করতেন। গভীর লঘু গম্ভীর তরল—কতরকম বিষয়েই তিনি গল্প করতেন।

সজনীদা'র এমন বেডি উইট ছিল যে আক্রমণের লক্ষ্য যে ব্যক্তি, সে-ও ঠিক ঠাহর করতে পারত না। উনি তৈরী হবার সময় দিতেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভার পরিবেশ সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর। তারই মাঝে মাঝে সজনীদা ছু-একটি বাণী ছাড়তেন। একদিন কা-নি-স-র অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। তখন শীতকাল। কুমারেশ ঘোষ মশায় পাঁচ মিনিট দেরীতে এলেন গায়ে শাল চড়িয়ে। সম্পাদক পাটুদা মাসিক আয়-ব্যয় বিবরণ পড়ছেন। আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনছি, বা শোনাব ভান করছি। দীর্ঘ বিবরণ—কুমারেশবাবু ঢুকতেই সবাই একবার মুখ তুলে আবার আয়-ব্যয় বিবরণে মনোনিবেশ করলেন। সজনীদা হঠাৎ বলে উঠলেন—'এই যে, কুমারেশ, খুব শালিয়েছ দেখছি।' কুমারেশবাবুর তৎপর উত্তর—'এ যে শালীর বাবার দেওয়া শাল।'

সবাই হেসে উঠলেন, আয়ব্যয় বিবরণীর শুকনো পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আরেক দিনের কা নি-স সভা। সভা আরম্ভ হতে মিনিট কয়েক দেরী আছে। কে একজন বললেন—'সজনীদা, আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, পেয়েছেন তো?' সজনীদা বল্লেন—'না, পাই নি, কি ব্যাপার জানো, আজ কাল, খোকন (সজনীদার পুত্র) আর সব চিঠি কাগজ পত্র আমায় দেয় না। আজ আমি বৃদ্ধ শাজাহান।'

সেদিনের সভার সভাপতি ছিলেন কবি শ্রী নরেন্দ্র দেব। নরেনদা গম্ভীরভাবে বললেন—দেখো ভাই সজনী, লাফ দিওনা যেন।

সজনীদা উত্তর দিলেন—'দোতলা থেকে লাফ দিলে হাড় গোড় ভেঙ্গে যাবে। কঠিন ফুটপাথ সম্রাট সাজাহান বলে খাতির করবে না।' নরেনদা সজনীদার রসিকতায় সবাই পুলকিত হলেন।

আরেক দিনের কা-নি-স সভা। পরিষৎ-সভাপতি ডক্টর সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগমন প্রতীক্ষায় আছি। সভা আরম্ভ বিকেল পাঁচটায়। দু মিনিট বাকি। ঠিক পাঁচটায় সুনীতিবাবু ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন—'আমার দেরী হয়নি। থর্ণ টু থর্ণ এসেছি।' (অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় এসেছি)। শুনে সবাই হাসলেন। সজনীদা বললেন—'এটা খুব ভালো ইংরেজি। আমিও দুয়েকটা জানি। বিফোর্ ক্লাইম্ব ট্রি, ওআন্ বাঞ্চ্।'

একজন প্রশ্ন করলেন—তার অর্থ?

সজনীদার উত্তর—'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।'

হাস্যরোলের মধ্যেই সভার কাজ শুরু হলো।

সজনীদার দোতলার ঘরে বসে সাহিত্যঘটিত ও অ-সাহিত্যঘটিত নানা বিষয়েই গল্প হতো। ডান হাতে সিগারেট, বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে ভরা গলায় কথা বলতেন। বাদামী চোখের তারায় আলো ঝিলিক দিয়ে উঠত। অনেক সময় তাঁকে রহস্যময় বলে আমার

মনে হয়েছে। ভেবেছি সজনীদা রহস্যের আবরণ পরে আছেন। একদিন প্রেততত্ত্বের কথা উঠল।

সজনীদা প্রশ্ন করলেন—অরুণ, তুমি ভূত-প্রেত মানো ?

আমার সোজা উত্তর—'না, একেবারে গাঁজা। আপনি কি দেখেছেন ?'

সজনীদা বললেন,—'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। আমার জীবনের দুটো ঘটনা তোমায় বলি। বাঁকুড়া থেকে আই-এস-সি পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম। ১৯২০ সালের জুন মাসে কলকাতায় পৌঁছলাম। কলেজ হষ্টেলে থাকব, এই ঠিক ছিল। আমার আসতে একটু দেরী হয়েছিল। সেজন্যে টম্‌রি-অগিল্‌ভি-ওআন-ডানডাস হষ্টেলগুলিতে 'সীট' পেলাম না। বাধ্য হয়ে খ্রীষ্টান ছাত্রদের হষ্টেল ডাফ হষ্টেলে ঢুকলাম। দোতলার একটা বড়ো ঘরে আমার 'সীট' ছিল। প্রকাণ্ড ঘর। আমরা চারজন ছাত্র ঐ প্রকাণ্ড ঘরে থাকতাম। ঘরটা এতো বড়ো যে আমাদের কী রকম ভয় ভয় করত। দৈত্যের মত বিরাট ডাফ হষ্টেল আজও আছে, তখন চারদিকে ফাঁকা ছিল বলে নিশুতি রাতে ফাঁকা ফাঁকা লাগত। একদিন রাত-দুপুরে আমার এক রুম মেট 'ভূত-ভূত' বলে চীৎকার করে উঠলো। ধড়মড় করে আমরা উঠে বসে চারজনে মিলে চেঁচাতে শুরু করলাম। যত বলি—কি দেখলে ? -সেই ছাত্র বলে—'ভূত ভূত' আর ঠকঠক করে কাঁপে। রাতদুপুরে হৈ হৈ। শেষ পর্যন্ত ছাত্রটি বলল—একটি মেয়ে-ভূত, কড়িকাঠে গলায় দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল। শুনে আমরা আরো ভয় পেলাম। হষ্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট স্ক্রীমজার সায়েব, তাঁর সহকারী, অন্য ছাত্রেরা ছুটে এলো। তখন শুনলাম, বহুকাল আগে এই হষ্টেল মেয়েদের বোর্ডিং ছিল। এক হতভাগিনী প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঐ ভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সে-ই নাকি মাঝে মাঝে দর্শন দেয়। ভয় পাবার কিছু নেই।

"শুনে তো আমরা আশ্বস্ত হলাম। এদিকে আর কোথাও 'সীট' নেই। বাধ্য হয়েই আমাদের থাকতে হলো। কিন্তু আমার সাহসী রুম-মেটরা নানা অজুহাতে অন্য ঘরে 'সীট' জোগাড় করে চলে যেতে লাগল। আমি মফঃস্বলের ছাত্র, সবে বাঁকুড়া থেকে এসেছি। কোথায় যাই। ঐ ঘরেই থেকে গেলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতো। অন্ধকারে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু কোনোদিন সেই মেয়ে-ভূতকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখিনি। কেবল এক রাতে একটা কালো বেড়ালকে দেখেছিলাম।"

এবার সুযোগ পেয়ে বলি—'তাহ'লে আর প্রেত-তত্ত্বে বিশ্বাস করি কি করে?'

সজনীদা বলেন—"আহা, শোন-ই না। ডাফ হষ্টেলের অভিজ্ঞতার জোরেই আমি ভুত মানতাম না। মৃত্যুর পর মানুষের আর কিছু থাকে বলে বিশ্বাস করতাম না। তার ওপর আমি ফিজিক্সের ছাত্র ছিলাম। বিভূতি (বন্দ্যোপাধ্যায়) ভূতবিশ্বাসী ছিল, তর্কে সে আমাকে হারাতে পারতো না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিভূতির কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস করেছি।"

সজনীদা চোখ বুজে অতীতকে দেখে নিলেন। আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে খানিকক্ষণ ধূমপান করলেন। তারপর বললেন—"আমার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। বন্ধুরা আমাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ বলে জানেন। আমি ফিজিক্সের ছাত্র ছিলাম। আচারে ব্যবহারে খাদ্যে পানীয়ে কালাপাহাড় বলে আমার কুখ্যাতি ছিল। ডাফ হষ্টেলের ঘটনা ১৯২০ সালের। কিন্তু তার আট বছর আগেই আমার পারিবারিক জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। আজ সে-কথাই তোমায় বলি।"

একটু থেমে সজনীদা পুনরায় শুরু করলেন—"সেটা ১৯১২ সাল। আমরা তখন মালদহ ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীতে থাকি। আমার মেজদা তখন কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আমরা পালা করে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি। সেদিন সকালে বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে মেজদার রোগ-শয্যায় বসিয়ে এক-তলা বাড়ির ছাদে চলে গেলেন। ঘুমভরা চোখে রোগযন্ত্রণাকাতর তন্দ্রাচ্ছন্ন মেজদাকে পাখার বাতাস করছি। ঠিক মাথার ওপরে বাবার ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ বাবার পায়ের শব্দ থেমে গেল। প্রতিবেশী যতীনকাকা সকাল বেলায় মেজদার সংবাদ নিতে এসেছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে গেল—আজই শেষ হয়ে যাবে। সে কি ?—আমার চোখ থেকে এক মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল, চোখছুটি জলে ভরে গেল। সে কি ?—বলতে বলতে যতীনকা বৈঠকখানার ঘরে ঢুকলেন, বাবাও ছাদ থেকে নেমে এলেন। আমি আড়াল থেকে উৎকর্ণ হয়ে তাঁদেব কথা শুনলাম। বাবা যা বললেন, তাব সাবমর্ম এই—আমার মা তাঁব পালা শেষ করে পাশের ঘরে গেছেন, বাবা একা পুত্রেব শিয়রে রাত্রেব শেষ প্রহর জাগছেন। হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক লাল আলোয় সমস্ত ঘরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাবা বিস্মিত চমকিত হয়ে এদিক ওদিক দেখছেন, কোথাও কিছু নেই। মুমূর্ষু মেজদা হঠাৎ শয্যায় উঠে বসে যেন অভ্যাগত কাউকে সম্বোধন করে বললেন, এই যে আমি যাচ্ছি।—বলে তিনি আবাব বালিসে মাথা রাখলেন। লাল আলো মিলিয়ে গেল। বাবা আব কিছু দেখতে পেলেন না। এই ঘটনাব বিবরণ দিয়ে শেষে বাবা বললেন, তাঁর দাদা (অর্থাৎ আমাব জ্যাঠা মহাশয়ের) মৃত্যুশয্যায় বসে তিনি ঠিক এই দৃশ্য দেখেছিলেন।

"সেই কাল দিনটির মধ্যাহ্ন না পেরোতেই সব শেষ হয়ে গেল। মেজদা চিবকালের মতো চলে গেলেন। মেজদার মৃত্যুতে আমাদের সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেল। বাবা খুবই বিচলিত হলেন। আমরা ভাই বোনেরা শোকে বিমূঢ়। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন। মেজদার মৃত্যুর পরদিন ছুপুরের ঠিক আগে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা

মায়ের শোবার ঘর অর্থাৎ বড় ঘরের মেঝেতে চৌকিতে বসে মেজদার কথাই আলোচনা করছিলাম। মা দুধ গরম করতে সামনেই রান্না-ঘরে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরু গম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরে ডাকলেন—'অজু'। আমরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দেখলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা খালি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণ শীর্ণ মেজদাদা এসে বসেছেন। বাবা চিৎকার করে মাকে ডাকলেন—ওগো, কে এসেছে দেখে যাও। মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে মেজদাকে দেখেই 'বাবা আমার' বলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দুধের বাটি ছিটকে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে মেঝেতে গড়াতে লাগল। আমি সেই দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই ফিরে দেখি, মেজদা অন্তর্হিত হয়েছেন। মায়ের মূর্ছার সেই সূত্রপাত। তারপর ঘন ঘন মূর্ছা হতে লাগল। মা কোথাও স্তব্ধ হয়ে বসলেই বুঝতাম, বিপদ আসছে। তিনি হয়ত মেজদাকে দেখতে পেতেন এবং একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। মেজদাকে আমরা সবাই দেখেছিলাম। বাবা নাম ধরে ডেকেছিলেন বলেই আমরা সম্মোহিত হয়েছিলাম, এই যুক্তিতে ঘটনাটিকে উড়িয়ে দিতে পারি নি, পারব না। এবার তুমি কী বলো?"

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। সজনীদা একটু হাসলেন। বললেন, "বিভূতিকে বাইরে ঠাট্টা করেছি বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি তার কথা সত্য বলে জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মেজদা, বড়দা, বাবা, মা—যাঁরা ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে গেছেন, তাঁরা সবাই আছেন, আবার দেখা হবে।"

এই কথা বলে একটু থামলেন। সজনীদার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। বললেন—"আমার 'রাজহংস' কাব্য নিশ্চয়ই পড়েছ? তার উৎসর্গপত্রে আমার মাকে সম্বোধন করে যা লিখেছি, তা আমি বিশ্বাস করি—

জননি, কঠোর মৃত্যু তোমারে ঢেকেছে অন্ধকারে,
হ'ল সে অনেক দিন—
দেখিতে পাইনা দেহ-ক্ষয় করা সেই করুণার ধারা।
ওপার হইতে এপারে আমারে তুমি এনেছিলে মাতা,
হারাইয়া আজ গিয়াছ আমার জ্ঞান-বুদ্ধির পারে ;
বুঝিতেও নাহি পারি,
যে পথে চলেছি সেই পথে মোরে ক্লান্ত দিনের শেষে
রেখেছ কি পেতে স্নেহ কোলখানি তব ?
বুঝতে পারি না, তবু আছে আশ্বাস।
জননি, আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধারে আলোকে, আমার অতীতে বর্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোক অন্ধকারে,
ব্যবধা : মুখে তড়িৎ তীব্র জ্বালা।
যেখানেই থাকো জননী, আবার সেতু কর নির্মাণ,
সহজ ব্যথায় আমারে প্রসব কর তুমি পরপারে।"

সজনীদা এতক্ষণে থামলেন। ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়ির দোতলার ঘরে কবিকণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

সজনীকান্ত তিরিশ বছরের (১৯৩১-৬২) বাংলা সাহিত্যের সকল ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচিত্র। বিরোধে আঘাতে ক্ষমায় স্নেহে প্রণামে আত্মসমর্পণে মেশা যেন এক বিচিত্র ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে তীব্র তীরস্কার করেছেন, আবার স্নেহও করেছেন। সজনীকান্তের মুখ দেখতে চান নি, এ ঘটনা যেমন সত্য, তাঁকে আপন জোব্বা উপহার দিয়েছিলেন, এও তেমনি সত্য। এই বিচিত্র সম্পর্কের কাহিনী সজনীদা নিজেই লিখেছেন তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে সজনীকান্তের বিখ্যাত কবিতা

—'বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ' লিখিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে চিরবিদায় দিয়ে এসে সেই কালরাত্রে সজনীকান্ত এই কবিতাটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্র-তিরোধানে সমস্ত জগৎ শূন্য বলে বোধ হয়েছিল। শ্মশান থেকে ফিরে এসে মনে হয়েছিল, জীবনের সব আলো রঙ মুছে গেছে। শেষে কবি সান্ত্বনা পেয়েছেন এই বলে,

'প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃত দীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।'

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের দীন ভক্ত ছিলেন, একথাই তিনি আমাদের বারবার বলেছেন।

একদিন এই প্রসঙ্গে আলোচনা তাঁর বাড়িতে হচ্ছিল। প্রশ্ন করি—'দাদা আপনি রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করেছিলেন কেন?' সজনীদার উত্তর—'আর বলো না সে কথা। যৌবনের হঠকারিতা এর জন্য দায়ী।'

পুনরপি প্রশ্ন—'রবীন্দ্রনাথকে unconventional informal অবস্থায় কখনো পেয়েছেন?'

প্রশ্ন শুনে সজনীদা সোৎসাহে চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন।

সজনীদা বললেন—"তবে শোনো সে কাহিনী। পারস্য ভ্রমণ-শেষে কবি দেশে ফিরলেন। ১৯৩১ সালের জুন মাস। খড়দহে গঙ্গাতীরে এক প্রাসাদে কবি দিনকয়েকের জন্য অবস্থান করছেন। পারস্য ভ্রমণের পূর্বেই কয়েকটি লেখায় ও বক্তৃতায় আমি কবিকে আক্রমণ করেছিলাম। কবি তখন আমার মুখ দর্শন করেন না। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে 'শনিবারের চিঠি'তে কবিগুরুর মুণ্ডুপাত করে হাতের সুখ করছিলাম। এমন সময় আমার প্রতিবেশিনী শুভ-ধ্যায়িনী মাতৃসমা হেমন্তবালা দেবী আমাকে হুকুম করলেন, কবিকে

লেখা তাঁর একটা জরুরী চিঠি নিয়ে খড়দহ যেতে হবে। মহা মুশকিল! ছেলের প্রতি মায়ের এ কি নিদারুণ আদেশ! 'না' বলার সাধ্য ছিল না, ওদিকে কবিগুরুর ক্ষমা লাভ করতে পারি এমন কোনো কাজই করি নি! অনেক সংকোচ ও কুণ্ঠায় খড়দহে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসে হাজির হলাম। কবি আছেন দোতলায়, একতলায় রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ আমাকে দোতলায় পাঠালেন। কী আর করি! ভয়ে ভয়ে লজ্জায় গেলাম।

'দোতলার ঘরখানি গঙ্গার ধারেই। কবি পূর্বমুখ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর পিছনেই একটি জানলা, সেই জানলা পথে গঙ্গার আবিল গৈরিক জলধারা চোখে পড়ল। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। গঙ্গার ভীমামূর্তি। কবি পূব দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে তাকালেন না। প্রণাম সেরে নতমুখে দাঁড়ালাম। মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর চিঠি তাঁর হাতে দিলাম। কবি হাত বাড়িয়ে চিঠিটি নিলেন, আমার দিকে তাকালেন না। চিঠি পড়ছেন, আমি ভীমা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছি। কবি হঠাৎ অপ্রসন্নতার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করছেন। আর আমি হতভাগ্য মনে মনে নিজেকে শত ধিক্কার দিচ্ছি।"

শুনে একটু হাসলাম। সজনীদা বললেন,—"তুমি তো হাসবেই। আমার অবস্থাটা বোঝো। ক্ষমা পেলে ধন্য হই, কিন্তু ক্ষমা ভিক্ষার কি পথ রেখেছি? কবি তখন আনমনে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন, এমন ভাবে কথা শুরু করলেন। কবির ঐ স্বগতোক্তি আজো স্পষ্ট মনে আছে। কবি বলছেন অস্পষ্ট কণ্ঠে ধীরে ধীরে— 'এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ নাড়ীর যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান। এই গঙ্গা যেখানে পদ্মা হয়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণে পাবনা পর্যন্ত এক সময় আমার বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। একটু এগিয়ে এসে নীচে চেয়ে দেখ আমার সে যুগের বিশ্বস্ত বাহন 'পদ্মা'র সংস্কার হচ্ছে। ওই 'পদ্মা' বোটে আমি দীর্ঘকাল বাস করেছি, ওকে

আমি ভালবাসি, তাই ছাড়তে পারি না। ও জীবনভোর অনেক খেটেছে, ওকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল।'

"রবীন্দ্রনাথ একটু থেমে আপন মনে বলে চলেন,—'আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতুম। মাঝ-পদ্মায় কখন যে বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা নিজেও জানতুম না। পুরনো মাঝি-মাল্লারা আমার মুখচোখের চেহারা দেখে টের পেত, ডিঙি নিয়ে তৈরী থাকত তারা। যতক্ষণ দম থাকত মাথা তুলতুম না, শরীর অবশ হয়ে এলিয়ে এলে একটা হাত বাড়িয়ে দিতুম জলের ওপরে, মাঝিরা তৎপরতার সঙ্গে এসে আমাকে ডিঙিতে তুলে নিত। এই ছিল আমার দৈনন্দিন খেলা, সর্বনেশে খেলা, কি বল? ডুবে যে কেন যাইনি, আজ তাই ভাবি, ওই মাঝি-মাল্লাদের দয়াতেই। সে সময় ছোটগল্প আর কবিতার বান ডেকেছিল আমার মনে।'

"এই রকম অনেক গল্প। দু' ঘণ্টা ধরে সেদিন কবিগুরু তাঁর অতীত জীবনের অনেক কথাই বলেছিলেন। শেষে যখন চলে আসার আগে প্রণাম করলাম, তখন সেই দিন প্রথম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কবি বললেন, হেমন্তবালার লেখার শক্তি অসাধারণ, আর্টিস্টের ডিট্যাচমেণ্ট যদি ও লেখায় আনতে পারে স্থায়ী নাম রাখতে পারবে।"

সজনীদা থামলেন। প্রশ্ন করি—'ক্ষমা পেয়েছিলেন?' সজনীদা জোর গলায় উত্তর দেন—'নিশ্চয়ই, ক্ষমা লাভের সেই সূচনা। জানো, রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার স্বগতোক্তির ভিত্তিতেই আমি 'গাঙ্গেয়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে 'গাঙ্গেয়' বলে অভিহিত করেছি। সেটা পড়েছ?'

উত্তর দিই,—হ্যাঁ পড়েছি, আপনার 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যে আছে।'

একদিন আড্ডায় বসে সজনীদাকে বলেছিলাম, 'কবি হিসেবে আপনার শেষ বাসনা কি?'

একটু হেসে সজনীদা 'অন্তিম বাসনা'আবৃত্তি করেছিলেন—

'উলু দিও নাকো আমি মরে গেলে সুড়সুড়ি দিও কানে,
পচারে বলিও সে যেন তিনটে লাল বাতি জ্বেলে আনে।
পাড়া মাতাইয়া বিনিয়ে কেঁদো না, রুমালে মুছিও চোখ,
কাছে যেন মোর নাহি আসে সখি, খোঁড়া নুলো হাবা লোক।
শিয়রে আমার অ্যাশট্রে রাখিও, চরণে আলতা দিও,
এক ঠ্যাঙে যেন দাঁড়াইয়া থাকে মোর যত আত্মীয়।'

বাধা দিয়ে বলি—'দাদা ঠাট্টা নয়, আপনার সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মহৎ শিক্ষা কি, সেটা বলুন।' তখন বজ্রকণ্ঠে সজনীদা আবৃত্তি করলেন—

'সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল
হবে না প্রকাশ কোনদিন।
জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা লভিয়াছি—
মহত্তেরে বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।'

'মুকুল'

পাঁচ-ছ'টি কিশোর-কিশোরী কলরব করছে, তারই মাঝে সস্মিত-আনন এক প্রৌঢ়। ছোটদের সঙ্গে তাদের মতো হয়ে মিশে গিয়ে প্রৌঢ় প্রসন্ন আলো ছড়াচ্ছেন। সকাল বেলার সোনারোদে ঘর ভরে গেছে।

কিশোরী-কণ্ঠে প্রশ্ন,—'তুমি মুকুল? ফুল নও কেন?'

দরদ-ভরা টানা কণ্ঠে উত্তর এলো, 'আমি যে ভাই ফুটে উঠতে পারি নি, তাই মুকুল রয়ে গেছি।'

'মুকুল', 'মুকুল', কলরব উঠল, 'একটা কবিতা বলো।'

তখনি দানাদার কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন প্রৌঢ় —

মোদের দেশে হিমালয় সবার চেয়ে উচ্চ······
আমার কুকুর প্রেমে নাড়ায় পুচ্ছ।
মোদের দেশে নরনারী
বড় হবার ইচ্ছা ভারী
কিসের ভয়ে জড়োসড়ো
কিসের লাগি তুচ্ছ······
আমার কুকুর প্রেমে নাড়ায় পুচ্ছ।

হাসি-হাসিমুখে কিশোরগুলি আবৃত্তিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মোদের দেশে হিমালয় সবার চেয়ে উচ্চ ·····
আমার কুকুর প্রেমে নাড়ায় পুচ্ছ।
প্রসিদ্ধ যে মোদের বাঘ
কোন দেশেতে এমন নাগ........
কুকুর বলে কেন তবে
ভিজে নয়ন মুচ্ছ।······
আমার কুকুর বেগে নাড়ায় পুচ্ছ।

'মুকুল', 'মুকুল' বলে ছেলে-মেয়েরা কলরব করে, প্রৌঢ় হাসিমুখে বসে থাকেন।

দৃশ্যপট বদল হয়। কাল: প্রথম রাত্রি। শ্রোতারা মধ্যবয়সী, নানা রুচির নরনারী। সেই প্রৌঢ় আরামকেদারায় বসে আছেন। ব্যাকব্রাশ করা চুল, মাঝখানে দুগাছি রুপোলি চুল, বাকিটা কালো, দোহারা চেহারা। মুখে প্রসন্নতার আভাস। দরদভরা কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন:

পিছন-তাড়না করেছি আমার চুল;
বেয়াল্লিশের রূপের নালিশ ভুলে
চিরুণী ও ব্রাসে নবারুণ আলো দিয়ে
পালিশ করেছি অপরাহ্নের ফুলে।

শ্রোতাদের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। আবৃত্তি অবারিত বেগে এগিয়ে চলে। শেষের দিকে কবিকণ্ঠ গাঢ় হয়ে আসে—

ফিরে ফিরে চাওয়া কার না নয়নে ভরা
ফিরে ফিরে চাওয়া, যদি ফিরে পাওয়া যায়—
বিরাশি বছরে সবাই স্বয়ম্বরা
বরমালা নিয়ে ছায়ার পিছনে ধায়।
তা'বলে আমার চুলের পিছন চলা
সুদূর মধুরে সে কি আর ফিরে পাবে—
পাথরেরও আছে গোপন জ্বলা ও গলা
তা' বলে কি কেউ পাথরে কাতর ভাবে?
বন্ধুকে বলি, বন্ধু তোলে না কানে,
আয়না কেনার খরচ বাঁচিয়ে যায়—
সেই এক কথা, গত যৌবন পানে
আমার নয়ন তৃষ্ণা চাহনি চায়।

পুনর্বার দৃশ্যপট বদল হয়। এবার দক্ষিণ শহরতলীর বাগান-ঘেরা বাড়ির বৈঠকখানা। সকালের আলোয় ঘর ভরে আছে।

স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিনের কথা। সেদিন গৃহস্বামী কথাশিল্পী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের রবিবাসরীয় আড্ডায় গিয়েছিলাম। কিছুপরেই এলেন অগ্রজ কথাশিল্পী শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আরো দু-একজন ছিলেন। এমন সময় ধীর পদক্ষেপে এলেন ঐ প্রৌঢ় কবি। "আসুন, আসুন, কবি আসুন।"

"উনি তো ফোটা ফুল নন, উনি মুকুল।"

"হ্যাঁ, উনি চিরকালের মুকুল।"

নানা মন্তব্যে ঘর ভরে উঠল। আতিথ্যের উত্তাপেভরা ঘরে এসে ঢুকলেন কবি। অবধারিত অনুরোধ, 'এবাব কবিতা আবৃত্তি করুন।"

কবি কখনই আপত্তি কবেন না, স্বরচিত সকল কবিতাই তাঁব কণ্ঠস্থ। অনর্গল আবৃত্তি কবেন। একবার শুনলে চিরদিন মনে থাকে।

একটু হেসে চশমা খুলে পুনর্বার প'বে দরদভরা কণ্ঠে কবি বললেনঃ 'আমি তখন রাঁচি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজী পড়াই। ফোর্থ ইয়ারে ষান্মাসিক পরীক্ষায় আমাকে দিয়েছে খবরদারি করতে। দেখুন, কি মুশ্‌কিল! আমি ইংবাজি সাহিত্য পড়াই, তাবা পড়ে। ব্যস্! এর মধ্যে আবার খববদাবি কবার অস্বস্তিকব দায। কি করি! মেয়েরা মাথা নীচু করে লিখে যাচ্ছে, ওদের সততায় আমি সন্দেহ করি না। ওরা যখন পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নপত্রেব উত্তর লিখছে, আমি তখন ঐ মেয়েদের নিয়ে এই কবিতা লিখছি।'

কবি একটু দম নিলেন। সভাজন উৎকর্ণ। এবার শুরু হল দরদভরা কণ্ঠের সুরজাল-বিস্তাব:

পরীক্ষা দেয় ওবা একুশটা মেয়ে—
ফাইনাল বি-এ পড়ে, হেঁজিপেঁজি নয়;
কতো জ্ঞান, অনভূতি, কতো না বিস্ময়—
কচি কচি মনে ভরা, একুশটা মেয়ে···
আপসেতে যদি কিছু টোকাটুকি চলে,

পাছে ফিস্ ফিস্ করে কেউ কথা বলে,
শিয়রে যমের মত আমি আছি চেয়ে—
চলেছে ঘড়ির কাঁটা, বেজায় সে তাড়াতাড়ি,
খুব যেন আদা জল খেয়ে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, আমাদের তা খেয়াল নেই, উদাত্ত স্বরে কবিকণ্ঠ ছাড়া পায়—

একুশটা মেয়ে ওরা কলম চালায়,
একুশটা, উস্‌খুস্ একুশ জ্বালায়···
কারুর খাতায় খোলা দোয়াত গড়ায়।
কলেজের বাগানেতে দুপুর-ময়ুর,
ছোপ-ছোপ-আলোছায়া-মাখানো পেখম,
এই মেয়েদের মুখে থমথমে মেঘ দেখে,
নাচে, মাতালের মত রকম সকম।
কলেজের বাগানেতে, দুপুরের ফুল,
অনেক পাপড়ি নিয়ে, ফুটে আছে ঐ—
এখানেতে এই হলে, বাইশ নিঃশ্বাস চলে,
একুশ মেয়ের শাড়ী রং থই থই···

দেখলুম—অকস্মাৎ, দশটা বছর,
পেরিয়ে, এগিয়ে গেছি, আমি আর ওরা :
দশটা বছর লাগে, ছোপ ছোপ, ধোঁয়া ধোঁয়া,
ছিট্ ছিট্, কিছু ডোরা ডোরা···

দশবছরের স্বপ্ন রচনা করে বর্তমানকে ভুলিয়ে দেয় সুরেলা কবিকণ্ঠ। শেষের দিকে এসে আবেগগাঢ় হয়ে ওঠে। সেই গাঢ় কণ্ঠনিঃসৃত আবেগ স্পন্দন শ্রোতৃ-হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়

দশ বছরের আগে, যে সব কবিতাগুলো,
শুনিয়েছি ক্লাসে রোজ রোজ ;

একুশটা মেয়ে কবে, বাগানের ঘাসে, ফুলে,
আজ সেই কবিতার খোঁজ—
যে সব স্বপনগুলো পেয়েছিল কবিতায়,
চেয়েছিল, যেগুলো জীবনে,
দশ বছরের পরে, যদি ফিরে পাওয়া যায়,
এই আশা একুশটা প্রাণে···
আজকের মত নাচে দুপুর-ময়ূর,
আজকের মত বয় হু হু হু হাওয়া,
ওরা খুব লিখে চলে, আমি বসে বসে দেখি,
দশ বছরের পরে পেছুন চাওয়া।
আমাকে আবার ওরা খুঁজবে না কি ?
আবার নোতুন করে বুঝবে মানে ?
আবার আসবে উড়ে, আগের পাখি,
দশ বছরের পরে এই বাগানে ?
আজকের মত জ্বলে, দুপুরের ফুল,
আজকের মত চলে, দামাল হাওয়া ;
কলেজের ঘরে ঘরে, ওরা মিছে খুঁজে মরে,
আমাকে সেদিন আর যাবে না পাওয়া।

আবৃত্তি শেষ হল। খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। সেই সুরের রেশ সারা ঘর মুখর করে রেখেছে।

সেই কবিকণ্ঠ আজ আর শোনা যাবে না। দশ বছর পেরোবার আগেই সে কণ্ঠ চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেলো।

আমাকে সেদিন আর যাবে না পাওয়া···
আমাকে আবার ওরা খুঁজবে না কি ?....

এই ভরত-বাক্য উচ্চারণ করে কবি বিদায় নিয়েছেন। রয়ে

গেছে শূন্যবাগানে কয়েকটি ফুলের গুচ্ছ: তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'এলোমেলো', 'একুশটা মেয়ে', 'যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল'। আর রয়েছে দু'টি উপন্যাস ('চক্রবৎ', 'শিবাজীর বৌ') ও একটি নাটক ('অর্ধনারী')। ইনি হলেন কবি বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর হৃদয় ছিল রোমান্টিক ব্যাকুলতায় ভরা, তাঁর বিশাল হৃদয় সদাই আত্মীয়-স্বজনে প্রীতিদানে উন্মুখ হয়ে থাকতো। তিনি নিজেকে বলতেন 'মুকুল', ফুটে উঠার অবকাশ পান নি। জীবনে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে তিনি সহজ ভাবেই গ্রহণ করে ছিলেন। অকৃতদার প্রীতি-প্রসন্ন তাজা প্রাণের অধিকারী বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিন ভেঙে পড়েন নি।

তাঁর সঙ্গে গত ষোলো-সতেরো বছর মিশেছি। ভাগ্যের প্রসন্ন দাক্ষিণ্য ও নির্মম অবহেলা, দুই দানকেই অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতে তাঁকে দেখেছি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনী রহস্য-কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর, উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র। ১৯২০ সালে কলকাতা থেকে ইংরেজিতে অনার্স সমেত বি এ. পাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পড়াশুনা পিছিয়ে গেলো। ১৯২৩-এ ইংরেজিতে এম এ. পাশ করলেন। চলে গেলেন পশ্চিম পঞ্জাবের বহাওয়ালপুর সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করতে। ১৯২৬-এ কলকাতায় ফিরে এলেন স্বাধীন ব্যবসায় করার ইচ্ছে নিয়ে। কিছুদিন নিউ মার্কেটে কুলীর কাজ, ফেরিওয়ালার কাজ করলেন। শেষে কনট্রাক্টরি, ব্যাঙ্কিং, শেয়ার-বাজার প্রভৃতিতে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১৯৩৪-এ বিহার ভূমিকম্পের ফলে তাঁর জন্মভূমি দ্বারভাঙ্গায় তাঁদের বাড়ীঘর পড়ে যায়। কলকাতার ব্যবসা ছেড়ে সেখানে চলে যান। দিন কতক শ্মশানবাসী হয়েছিলেন। তারপর দ্বারভাঙ্গাতেই কনট্রাক্টরি করেন। ১৯৩৬-এ কলকাতা ফিরে আসেন, পূর্ণোদ্যমে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৪-এ 'উজ্জয়িনী সাহিত্যসভা'য় যোগ দেন এবং পরবর্তী সাত বছর এই

সভাকে আশ্রয় দেন। তাঁর 'ক্যালকাটা হোটেলে' এর সাপ্তাহিক সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হতো। যুদ্ধের সময় তিনি ব্যবসায়ে মুঠো মুঠো টাকা উপার্জন ও খরচ করেছেন। বুইক, ডজ, হাম্বার, ফোর্ড—চারখানি গাড়ি ও বিশ লক্ষ টাকার মালিক, একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের অংশীদার, শেয়ার বাজারের প্রধান স্তম্ভ বিষ্ণুবাবু কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীকে কোনোদিন ত্যাগ করেন নি। তারপর ১৯৪৭-এর পরে অংশীদারদের গাফিলতিতে ব্যাঙ্ক ডুবল। শেয়ার বাজারে ঘা খেলেন, কনট্রাক্টরিতে নানা বিপর্যয় দেখা দিলো। শেষে ১৯৫২-তে ভরাডুবি হলো। লাখপতি হয়ে গেলেন নিঃস্ব।

আবার ফিরে গেলেন পুরনো কাজে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫১ জীবনের শেষ ন'বছর রাঁচি ও কলকাতার কলেজে ইংরেজী সাহিত্যেব অধ্যাপকরূপে কাজ করলেন।

সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হয়ে তাঁকে কাজ করতে দেখেছি। এই সেদিন একষট্টি বছবের ভরা জীবন শেষ করে চলে গেলেন।

এই অবিশ্বাস্য জীবনের নায়ক কবি বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি প্রায়ই এই বয়েৎ আবৃত্তি করতেন,—

> খুঁনে জীগর শরাব হ্যায়,
> লখ্‌তে জীগর কাবাব হ্যায়,
> ইয়াদ্ আতী হ্যায় কী
> দিল্ মেঁ মেহ্‌মানি হ্যায়।

সত্যি তাই, কবির হৃদয়ে মেহ্‌মানির অভাব ঘটে নি। তাঁর প্রসন্নতা জীবনের সকল উত্থানে-পতনে সুখে-দুঃখে বজায় ছিলো।

কবি তখন বৌবাজারের ক্যাল্‌কাটা হোটেলের মালিক। সেখানেই বসতো উজ্জয়িনী সাহিত্যসভা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখরতাপে মধ্যদিনে যখন পাখি গান বন্ধ করে, সেই লগ্নে হোটেলের বারান্দায়

রেলিঙে ভর দিয়ে অগ্নিস্নাত কলকাতার দিকে তাকিয়ে কবির মনে হলো, কাব্যলক্ষ্মী এসে গিয়েছেন—দুপুর-রোদে কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি কি বলে বরণ করেন—এই ভাবনায় উতল কবি তখন লিখলেন এই মধ্য দিনের গান—কতোবার তাঁর কণ্ঠে এই কবিতাটি শুনেছি—

জষ্ঠিমাসের স্তব্ধ দুপুর, কপোত কূজন মাখা,
রুদ্ধ দুয়ার শয়ন ঘরের ঘন ছায়ায় ঢাকা,
তুমি বুঝি স্তব্ধ দুপুর, পথ গিয়েছো ভুলে,
ভেসে এলে আমার কাছে, বৌ-বাজাবের কূলে—
এখানেতে শব্দ অনেক, জব্দ হলে বেজায়,
স্তব্ধ দুপুর, তাইতে বুঝি গালে জলের ফোঁটা,
ঘোর দুপুরের ঝনঝনানি শ্রাবণ-মেঘে ভেজায় ?
এখানেতে আর-এক ছবি, বাইরে বারান্দাতে—
যতটা দূর দৃষ্টি চলে, আগুন জ্বলে ধু ধু,
রেলিং-হেলা স্তব্ধ দুপুর, শব্দ দুপুর নিচে,
ট্রামের বাসের নূপুর বাজায়, পথের গলা পিচে—
পায়ের তলায় তলায় যত ছায়ানটীর সাথে,
খুব জমেছে, গাছের বুকে টেনে নেবার খেলা—
আগুন সমুদ্দুরের বুকে মধ্যদিনের ভেলা।

কাব্যের এই ভেলা ভাসিয়ে কবি আজ ইহলোকের •ী পেরিয়ে অন্যলোকে চলে গেছেন। তাঁর কাছে তাঁর বিচিত্র জীবনের কতো ঘটনা শুনেছি, কত আবৃত্তি শুনেছি। আজ সকল খেলার অবসান, সকল চাঞ্চল্যের শান্তি। মাঝে মাঝে দূর থেকে আতিথ্যভরা সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসে 'মুকুলে'র প্রশ্ন ঃ

আমাকে আবার ওরা খুঁজবে নাকি ?
আবার নোতুন করে বুঝবে মানে ?
আবার আসবে উড়ে, আগে পাখি,
দশ বছরের পরে এই বাগানে ?

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কথাকোবিদ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল গোষ্ঠীর গল্প করছিলেন। কথায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বাক্-প্রতিমা নির্মাণে ও তার আরতিতে অচিন্ত্যকুমার তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। দক্ষিণ কলকাতায় এক বাড়ির এক তলার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। জানালার বাইরে খানিকটা বাগান। ঘরের চার দেয়াল বইয়ে ঠাসা আলমারিতে আবৃত। আইনের বই। অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র পরিবার আইনজীবী। আইন-ব্যবসায়ে তাঁরা দু-পুরুষ ধরে লিপ্ত আছেন। অচিন্ত্যকুমার মুন্সেফ থেকে জেলাজজ হয়েছেন, সরকারী চাকুরীর ধাপগুলি পেরিয়ে এসেছেন তিরিশ বছরে। সারা বাংলা-দেশ ঘুরেছেন, শহর ও গ্রাম, নদীমাতৃক বাংলা আর সভ্যতাভিমানী রাজধানী—সর্বত্র ঘুরেছেন। এই কারণে তাঁর রচনাবলীতে বহু চরিত্রের দেখা পাই। তাঁর সৃষ্ট জগতে আলেখ্যদর্শন করতে গিয়ে হাড়ি-মুচি-ডোম-সারেং-চাষী-কুলী-কামিন-মাঝি-মাল্লার যেমন দেখা পাই, তেমনই উকিল-পেশকার-নাজির-নায়েব-হাকিম-জজ-ম্যাজি-স্ট্রেট-মন্ত্রী-আর্দালিরও দেখা পাই। আর আছেন চাকুরি-নির্ভর মধ্যবিত্ত বাঙালি—মফঃস্বলের ইনি আর উনি, গরবিনী ভামিনী আর রসিকা কামিনী, বরবর্ণিনী আর রসচতুরা রমণী।

ভারী গলায় অচিন্ত্যকুমার কথা বলছেন। নিপুণ কথাশিল্পী ও নিপুণ বাক্শিল্পী—দু'য়ে মিলে অচিন্ত্যকুমার। কথায় কথায় 'পান্' করে উপমা দিয়ে, গল্পের খৈ ছড়িয়ে অচিন্ত্যকুমার গল্প করছেন। আমাদের দুজনার সামনে ধূমায়মান চায়ের কাপ।

"জানো, কল্লোল যখন বেরোয় তখন আমাদের কী উৎসাহ! মনে হল যেন বিশ্ববিজয় করে ফেলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রলাঁ, নুট হামসুন, যোহান বোয়ার, বার্ণার্ড শ,— সকলের কাছেই

আমরা চিঠি লিখেছিলাম 'কল্লোলে'র নামে। আর কি আশ্চর্য, উত্তরও পেয়েছিলাম। আজ আর সেই উদ্দীপনা চোখে পড়ে না। 'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কী। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। তারুণ্য, বীর্য, বিদ্রোহ ও বলবত্তা—সবটা মিলিয়ে 'কল্লোল'।"

আমি বলি, "হ্যাঁ, সেদিন তো আপনারা রবীন্দ্রনাথকেও মানতে চান নি।"

বাধা দিয়ে কথক বলেন, "আমাদের সেই বিদ্রোহই রবীন্দ্র-প্রণাম, বিবোধিতাই আনুগত্য, অস্বীকৃতিই স্বীকৃতি। আমরা কি তোমাদের চেয়ে কম রবীন্দ্র-ভক্ত? রবীন্দ্রনাথ তোমাদের যতটা, তার চেয়ে বেশী আমাদের। তাঁর সেই গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মত চেহারা আজো আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।"

একটু থামলেন, বুঝি-বা মনে মনে সেই স্বর্গীয় ছবিটি দেখলেন। তারপর বললেন, 'এটা তো জানো। আমরা যাই করে থাকি সাহিত্যে আমাদের নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের কোনো অভাব ছিল না। আজকের তরুণ লেখকদের সেই নিষ্ঠা কই, সেই সততা কই, পরিশ্রমের ও জানবার ইচ্ছা কোথায়?"

জানি, এই কথার জবাব নেই। তাই বলি, "আপনি সাহিত্যের গল্প বলুন।" অচিন্ত্যকুমার বলেন, "সাহিত্যের গল্প? তার চেয়ে সাহিত্যসভার গল্প শোনো। সভাপতি আর প্রধান অতিথি। বাংলা দেশে এই দুজন কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরলে পাজি। শোনো, সভায় গিয়ে দুটো জিনিষ খেয়াল রাখবে। জুতো, আর গাড়ি।"

অবাক মানি, "তার অর্থ?"

"সভার উদ্যোক্তাদের শর্ত করিয়ে নেবে—দুটো জিনিষের উপর যদি চোখ রাখতে দেন তাহলে সভাপতি হতে রাজি আছি। নজর তারা রাখলে হবে না, নিজেকেই রাখতে হবে। এক, নিজের জুতো

জোড়া, দুই, ফিরে যাবার গাড়ি। ও দুটো বস্তু চোখের সামনে বহাল তবিয়তে আছে দেখলেই জগৎ আনন্দময়। 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে—।' সুতরাং এমন জায়গায় বসবে সেখান থেকে জুতো আর গাড়ি সরাসরি চোখে পড়ে।"

"বলতে বলতে যখন তন্ময় হয়ে যাবেন তখন জুতোর দিকে কি আর মন থাকবে ?"

"যতই তন্ময় করে দাও না কেন, জুতো ভুলব না। শ্রীরামকৃষ্ণও কখনো তাঁর পানের বটুয়া ভুল করেন নি। নইলে সভাস্থল থেকে নগ্নপদে বেরুচ্ছ সেটার মধ্যে সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। কিংবা ফেরবার গাড়ি নেই, পদব্রজে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরছ বা বাদুড়ঝোলা হয়ে শহরতলির বাস, সেটার মধ্যেও নেই কোনো শালীনতা।"

এতক্ষণে মনে পড়ল। বললাম,—"আপনি ঠিক বলেছেন। সেদিন জরাসন্ধ এক সভায় নোতুন এক জোড়া পাম্প-শু হারিয়েছেন। আর আমাদের স্যর ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়মশাইকে গত বছর ডায়মণ্ড হারবারের রবীন্দ্র-সভা-শেষে কলকাতা ফেরার লাস্ট ট্রেণে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে উদ্যোক্তারা তুলে দিয়েছিলেন। দুটি ঘটনাই তাঁদেব মুখে শুনেছি।"

বিজয়গর্বে অচিন্ত্যকুমার বললেন, "তবেই ছাখো, আমার কথা ঠিক কি না। এইবার আরেকটি উপদেশ দিই। শোনো। সভাপতি হয়ো না, প্রধান অতিথি হবে। সভাপতি না শোভাপতি। শুধু একটা ডেকরেশন। দারুভূত ব্রহ্ম। তার উপাধি বিদ্যাভূষণ নয়, ভাষণভূষণ। শেষ পর্যন্ত বসে থাকো। তবু তার কথা শোনবার জন্য যদি কারু মাথাব্যথা থাকত। প্রধান অতিথির ডাক আগে। বলাকওয়া শেষ করেই হাতজোড়। আমার অন্যত্র একটু কাজ আছে, আমি আসি। আর তুমি সভাপতি, বসে থাকো। সংসারে এক সিঁড়ি, কেউ ওঠে কেউ নামে। আর প্রধান অতিথি পালায়,

সভাপতি নজরবন্দী। যা হচ্ছে তা-ই শোনো। সহ্য করো। সেই জন্য বলছি, সভাপতি হয়ো না।" প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি কখনো সভাপতি হন না?"

গভীর কণ্ঠে অচিন্ত্যকুমার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হতে হয় বৈকি। যেখানে প্রধান অতিথি নেই, সেখানে সভাপতি (না, শোভাপতি) হতেই হয়। সেবার প্রধান অতিথিহীন সভায় সভাপতিকেই সর্বাগ্রে ভাষণ দিতে আহ্বান করল। যাক, আগে অন্তত পালানো যাবে।

" 'আপনার বক্তৃতাকে একটু লম্বা করুন।' বক্তৃতার মধ্যেই গলা বাড়িয়ে কানে-কানে বললে সেক্রেটারিঃ 'আরো অন্তত আধ ঘণ্টা।'

উদ্যোক্তাদের আরেকজন ও-কানে বললে, 'চল্লিশ মিনিট।'

'কেন বলুন তো?'

'উদ্বোধন সঙ্গীত যিনি করবেন সেই আর্টিস্ট এখনো এসে পৌঁছন নি। আরেকটি সভায় আটকা পড়েছেন। সুতরাং—'

"এর বিপরীতটাও ঘটে। কলকাতার এক সভা। প্রধান অতিথি হয়ে বক্তৃতা করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলছি। খুব তন্ময় হয়ে বলছি। এমন সময় কানেকানে মন্ত্রঃ 'বক্তৃতাটা শর্ট করুন। আর্টিস্টকে বেশিক্ষণ রাখতে পারা যাবে না। উনি কমিক করবেন। তারপর টালিগঞ্জে যাবেন, তাঁর সুটিং আছে।'

"সঙ্গে সঙ্গে ফিরে শ্রোতাদের ব্যাপারটা বলে তাঁদের মতামত চাইলাম। তাঁরা বললেন, চালিয়ে যান। আরো এক ঘণ্টা বলে থামলাম। তখন কমিক-আর্টিস্ট উধাও হয়ে গেছে। 'কোথা রে উধাও হল'—!

প্রাণ খুলে হাসলাম।

আরেকদিনের আড্ডা।

অচিন্ত্যকুমার বলছেন, "এক রবীন্দ্র-সম্মেলন হচ্ছে আট দিন ধরে। অষ্টাহব্যাপী নাম-সংকীর্তন। একদিন হবে 'শাপমোচন।' প্যাণ্ডেলের টিকিট-ঘরে খুচরো টিকিট-ক্রেতাদের ভিড়। এতো ভিড় দেখেই উদ্যোক্তাদের কেমন সন্দেহ হয়েছিল। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য শুরু হতেই হৈ-হৈ করে উঠল। ভেবেছিল, রুপোলি পর্দার ছায়াময়ী বিচিত্ররূপিণীকে শরীরিণী দেখবে। এই স্বপ্নেই বোধ হয় সকলে উষ্ণ ছিল, কিন্তু একি ফেরেববাজি ?

'এ তো ফিল্মের 'শাপমোচন' নয়, এ অন্য ব্যাপার। ও সব চলবে না মশাই, পয়সা ফেরৎ দিন।"

বিস্ময়বোধ করি, "বলেন কি ?"

কথক বলেন, "আহা, শোনোই না। আর এক সভায় গান হচ্ছেঃ 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে—'

হৈ-হৈ করে উঠল। ও সব ভাবের গান চলবে না। জনতার মধ্য থেকে ক'জন হুঙ্কার করে উঠল।

কি চলবে ?

হয় হাবে রেবে, নয় তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। ঝঞ্ঝনা একটা আছে না ? নইলে সেইটে। একজন বললে, অন্তত মারো টান হাঁইয়ো।

তারপর ঘোষণা হ'ল—'এবার কবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান।'

সভাপতির বক্ষ প্রায় বিদীর্ণমান। একি, এতো মাইকেল!

একজন কানে-কানে বললে, 'গিরিশ ঘোষও ভাবতে পারেন।'

গরীব ক্লাব, সংস্কৃতির দিকে ঝোঁক আছে। কোনো ক্রমে একটি প্রস্তরমূর্তি জোগাড় করেছে। একটু ইতর বিশেষ করে সমস্ত পাল-পার্বণেই চালিয়ে দিচ্ছে। সেই যে শুনেছিলাম, এক দেশনেত্রীর তিরোধান হয়েছে, কোনো এক দৈনিক কাগজ তাঁর ছবির ব্লক পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যদায়িনী কি এক বটিকার বিজ্ঞাপনে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী এক

যুবতীর ছবি আছে—সম্পাদক বললেন, সেই বটিকার ব্লকটাই একটু ঘসে মেজে চালিয়ে দাও এবার।

মূর্তি কে দেখে! মূর্তি তো মায়া!"

যোগ করলাম—"জগৎটাই মায়া, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মং।"

অন্য একদিনের আড্ডা। বললাম, "সভায় বক্তৃতার কথা তো হ'ল, এবার গানের কথা বলুন।"

অচিন্ত্যকুমার বিস্ময়ে হানি যুগল ভুরু বললেন, "গান, না, Gun?"

একবার এক মেয়ে-স্কুলের সভায় নিচু ক্লাসের মেয়েরা গান গেয়েছিল। মফঃস্বল শহর। যেমন রেওয়াজ এস-ডি ও-র স্ত্রী এসেছিলেন পুরস্কার বিতরণ করতে। তাঁকে সংবর্ধনা করার জন্যে সমবেত সঙ্গীতের ব্যবস্থা। লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে কচি গলায় গান ধরলে মেয়েরা:

এস গো মা সরস্বতী, আমরা অবলা
তুমি বাজাও হার্মোনিয়াম, আমরা তবলা।

গান যিনি বেঁধেছেন, তাঁকে নিঃসংশয়ে প্রশংসা করতে হয়। গানের নিহিতার্থটি গভীর। হে মহীয়সী, হে আদর্শরূপিণী, তুমি উচ্চগ্রামে যে সুর ধরেছ আমরা যেন তার সঙ্গে তাল মেলিয়ে চলতে পারি। তা ছাড়া অবলার সঙ্গে মেলাবার জন্যে তব্‌লাকে তবোলা করে নেওয়ার মধ্যেও বাহাদুরি আছে। সুরের গরজে হসন্তকে ওকারান্ত হতে দোষ নেই, নইলে মিল যে নিটোল হয় না।"

দুজনে প্রাণখুলে হাসলাম। তারপর বললাম—"এই ধরণের উদাহরণ তো স্বয়ং গুরুদেবের লেখা গানে পাই।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

ধৈর্য মানো, ওগো ধৈর্য মানো
বরমাল্য গলে আজো হয়নি ম্লান।

'ম্লান-কে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা 'ম্লানো' উচ্চারণ করতেন। এখানেও তো নিটোল মিল।"

কথক উত্তর দিলেন, 'বৎস, দিন দিন তোমার মাথা খুলছে।'

বলি, 'সে তো সৎসঙ্গের ফল। আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গল্প বলুন।' অচিন্ত্যকুমার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আজকাল সভায় সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। শতকরা নিরানব্বই জন তো গানের পদই জানে না।"

অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলি, 'তা কখনো হয়?'

কথক বলেন, "আচ্ছা, আমি কয়েকটা সত্য ঘটনা বলি, মনে রেখো রটনা নয়। এক আপিসের রবীন্দ্র সভায় জনৈকা গায়িকা গান ধরলেন—'শ্রাবণ গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ-যামিনী রে—' কথাটা কি 'শাওন' নয়? তা যাক্ গে যাক্। বৈশাখে বক্তা-গায়ক-তবলাবাদকদের মরবার ফুরসৎ নেই। তাই চাহিদা কিছুটা কমলে জ্যৈষ্ঠ মাসে সভা। শ্মশানফাটা রোদে রবীন্দ্রজয়ন্তী হচ্ছে। শনিবার বলে আপিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছে বলেই খানিকটা সময় হাতে পাওয়া গেল, দুপুরের দিকেই সভা। এতেই বা অভিযোগের কি আছে, জ্যৈষ্ঠের দীর্ণ-দগ্ধ রিক্ততাকেই না হয় বর্ষার ঘনঘটা কল্পনা করা গেল, ক্রূরাত্মা দ্বিপ্রহরকেই না হয় সুখসেব্যা নিশীথ যামিনী মনে করা গেল। ধ্যানেই প্রাপ্তি, জপাৎ সিদ্ধি। উদ্বোধন সঙ্গীত শেষ হল। গাইলেন আপিসের এক কর্মিনী।

এবার প্রারম্ভিক সঙ্গীত। আপিসেরই আর একটি কামিনী গাইছেন। 'শ্রাবণ—'

আবার শ্রাবণ! তবে কি এবার 'শ্রাবণ বরিষণ পার হবে,' নাকি 'শ্রাবণ মেঘের অর্ধেক দুয়ার ঐ খোলা,' না 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে?' উহুঁ, ও-সব কিছুই না। আবার সেই 'শ্রাবণগগনে ঘোর ঘনঘটা'ই শুরু হল! তবে কি উদ্বোধনী ঠিকমত গাওয়া হয়নি বলেই দ্বিতীয়া সংশোধনী গাইছেন? না, তা

নয়। না কি, স্বরলিপি-ভেদ? না, তাও নয়। তবে কি? জানা গেল, দুজনেরই গানের মাষ্টার এক এবং ঐ একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীতই এদের দুরস্ত।

তবু তো এই আপিসিনী মেয়েছুটি ভুল করেও গানটি আগাগোড়া মুখস্ত করেছে। সেবার সে সভায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে যে মেয়ে, সে নির্বাক। সব ঠিকঠাক, রুদ্ধশ্বাস উৎকর্ণ জনতা, তবু গানের নাম নেই। মাইক তবলা বেহালা—সব এসেছে, গায়িকা আসনস্থা, তবু টুঁ শব্দটি নেই। কি হল? 'গীতবিতান' আসে নি।

নাই চাল, নাই পাত, চড়িয়ে দাও ভাত—এ কখনো হয়? 'গীতবিতান' কই?—গীতবিতান ছাড়া আটদশ লাইনের একটা গানও হয় না। চারদিকে ছোটাছুটি। ফল? নিষ্ফল! গান হল না, দারুণ অগ্নিশর হেনে মেয়েটি ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে পড়ল। চলে গেল। 'ও কেন গেল চলে—?' আর কেন? 'গীতবিতান' নেই।"

হাস্যরোলের মধ্যে পয়লা কিস্‌সা শেষ হল। দুসরা দফা চা আনার হুকুম হল। অচিন্ত্যকুমার চায়ে চুমুক দিয়ে পুনরায় শুরু করলেন,"সেবার জয়ন্তী হচ্ছে কোনো এক মানী লোকের বৈঠকখানায়। যাকে বলে ঘরোয়া বৈঠক। সংস্কৃতির সমস্ত সবঞ্জাম নিটুট; আলপনা ধূপ, মাটির কলসীতে রজনীগন্ধার ডাঁট, ফরাস—সবই বহাল, এমনকি দরজায় উর্দিপরা চাপরাশি মোতায়েন।

এই বৈঠকেব গায়িকা মেয়েটি বুদ্ধিমতী। বৈষ্ণবের বাড়িতে 'গীতিবিতান' পাবে এমন আশা দুরাশা। বৈষ্ণব? তা ছাড়া আবার কি? 'বৈ মানে কিছু নয়, আর কিছু নয় বলেই ধরা যেতে পারে, বিশেষ। বিশেষ রূপে যে স্নব (snob) সে ত বৈষ্ণ্‌ব। মরণকালে গীতা পাবে না, স্মরণকালে গীতবিতান!

তাই মেয়েটি বুদ্ধি খরচ করে গানটি একটি কাগজের টুকরোয়

লিখে এনেছিল। কাগজের টুকরো হার্মোনিয়ামের উপর রেখে গাইতে হলে একটা কিছু চাপা দরকার হয়। মেয়েটি এক হাতে হাপর মারবে আরেক হাতে চাবি টিপবে, সেই ক্ষেত্রে কাগজের টুকরো সামলায় কে? যারা 'গীতবিতান' খুলে গান গায় তারা তাদের হ্যাণ্ডব্যাগ দিয়েই খোলা পৃষ্ঠা চাপা দেয়। সেইটেই সংস্কৃতির চিহ্ন। কাগজের টুকরোর বেলায় একটি পাথরের নুড়ি-টুড়ি হলেই ভালো হয়। গৃহস্বামী তাই বেছে-বেছে জোগাড় করে আনলেন। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। মেয়েটি গাইছে তন্ময় হয়ে—'কেনরে এতই যাবার ত্বরা!' পাখার দাপটে নুড়িটি একটু নড়ে গেল, অমনি কাগজের টুকরো ছুট দিল হাওয়ায়। ধর্ ধর্—মেয়েটি ব্যাকুল হাত বাড়াল। ধর্ ধর্—সমবেত জনতা হাহাকার করে উঠল। বিদায় রাতের উতলাকে কত পিছু ডাকল, শুনল না সেই উদাস পাখি, উড়ে চলে গেল দরজা দিয়ে! ফল? নিষ্ফল! গান বন্ধ।'

সেই উতলা কলাপীর উধাও হয়ে যাবার পথে সেদিনকার আড্ডা ভঙ্গ হল।

আরেকদিনের কথা। বললাম, "মফঃস্বলের যে বিচিত্র জীবনকে আপনি পনেরো-বিশ বছর ধরে দেখেছেন, তার গল্প বলুন।"

অচিন্ত্যকুমার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "মফঃস্বলের জীবন দুর্বিষহ। এই জীবনের কষ্ট তোমরা বুঝবে না। মনোমত সঙ্গী নেই, আড্ডা নেই, পরিবেশ নেই। তোমার রুচিকে পদে পদে আঘাত করবে সেই স্থূল প্রয়োজনসর্বস্ব জীবন। কলকাতা শহরের জীবন বিশাল, এখানে তুমি পছন্দমত জীবন কাটাতে পারো। রুচি মাফিক সঙ্গ লাভ করতে পারো। কারুর সঙ্গে না মিশে একা বিভোর হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারো, কিংবা ঘরে বসে কাটিয়ে দিতে পারো। এই সুবিধা স্বাধীনতা মফঃস্বলে নেই। তোমার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমায় ক্লাবে যেতে হবে। আড্ডা দিতে হবে, প্রাণ না চাইলেও স্থূল রসিকতায় কাষ্ঠ হাসি হাসতে হবে। যদি না করো, তবে তুমি গম্ভীর উন্নাসিক, তখন তোমাকে সামাজিক ক্ষেত্রে একঘরে হয়ে থাকতে হবে।"

"বলেন কি ?"

"বলি কি আর সাধে! একবার মফঃস্বলের কাছারির প্রথম মুন্সেফকে কিভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল তা জানো! তাঁর অপরাধ তিনি স্থূল রসিকতায় হাসতেন না। হ্যা-হ্যা করে সকলের সঙ্গে মিশতেন না, উকীলদের মন জুগিয়ে চলতেন না। তার ফলে একদিন স্থানীয় বাজারে দেখা গেল—এক বাজারে কুকুরের গলায় এক টিনের চাক্তিতে লেখাঃ 'প্রথম মুন্সেফ'। সেই পরিচয়পত্র নিয়ে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বাজারের লোক, হাটের লোক, কাছারির লোক—সবাই সেই দৃশ্য উপভোগ করছে। তার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে বদলি হয়ে চলে গেলেন।"

কাছারি থেকে মামলা, মামলা থেকে আসামী, আসামী থেকে সমাজ—আড্ডায় আলোচনা গড়িয়ে চলল।

অচিন্ত্যকুমার বললেন, "আমার দীর্ঘকালের বিচারক-জীবনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীমাত্রেই বিশ্বাস করে সে নির্দোষ, অন্যায় বিচারে তার সাজা হয়েছে। সুতরাং সকলকে কিছুতেই খুশি করা যাবে না। আবার এ-ও দেখেছি, বুঝেছি, অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, কেননা যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ্য নেই। অথচ কিছু করার নেই। আমাদের দেশে বিচার-ব্যবস্থা যতদিন ব্যয়বহুল থাকবে, ততদিন সুবিচার হওয়া কঠিন। বিচারের খরচায় কত মানুষকে সর্বস্বান্ত হতে দেখেছি। আর বেশিরভাগ মামলা জোর করে আদালতে আনা হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। যার আপোষে মীমাংসা হয়, তাকে জোর করে অমীমাংসার পথে সমূহ সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।'

অচিন্ত্যকুমার একটু থামলেন। বোধ হয় ফেলেআসা বিচারক-জীবনের নানা ঘটনা ছায়া-ছবির মতো মনশ্চক্ষুতে দেখলেন। তারপর বললেন, "ছুটি কেস্ বলি।"

প্রথমটা বসিরহাটে। ছুটি মুসলমান-পরিবারের মধ্যে মামলা। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। বরপক্ষ কনেপক্ষ—তু পক্ষই জেদ করে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছে। টিফিনের সময় খাস-কামরায় স্বামী-স্ত্রীকে ডেকে পাঠালাম। শক্ত সমর্থ জোয়ান স্বামী, আর যুবতী স্ত্রী। বললাম, 'কিরে মামলা করেছিস কেন? বিয়ে ভেঙে দিবি?' আড় চোখে মেয়েটিব দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলল, 'মামলা তো আমাদেব বাপেদের মধ্যে। ওর সঙ্গে আমার কোনো কাজিয়া নেই।' মেয়েটি হেসে সমর্থন জানাল। বললাম, 'পালাতে পারবি?' ছেলেটি বলল—'হ্যাঁ।' বললাম, 'তবে পালা, ঘাটে গিয়ে নৌকা নিয়ে পালা।'

সেদিন দেরী কবে টিফিন শেষ করলাম, তারপর এজলাসে গেলাম। বাদী-বিবাদী পক্ষেব তুই প্রধান নায়ক-নায়িকার ডাক পড়ল। একঘণ্টা হয়ে গেছে। ততক্ষণে তারা নদী পেরিয়ে কতদূর চলে গেছে। আসামী নেই ফবিয়াদী নেই, মামলা খারিজ।"

অচিন্ত্যকুমার একটু থামলেন। তারপর শুরু করলেন জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে—"এবার শোনো দ্বিতীয় কেস্। আমি আলিপুরে জেলা-জজ। চব্বিশ-পরগণার গ্রামাঞ্চল থেকে মামলা এসেছে। ফরিয়াদী গ্রামের গরীব চাষী, আসামী গ্রামের জমিদার। তুজনেই মুসলমান। অভিযোগ, চাষীর বৌকে জমিদার হরণ করেছে। মামলার শুনানী হচ্ছে। আসামী, ফরিয়াদীর অপহৃতা স্ত্রী সবাই হাজির। বৌটি অপূর্ব সুন্দরী, মুখটি কোমলতা মাখানো। আসামী পক্ষের বক্তব্য, ফরিয়াদীর বিবি স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। ফরিয়াদী (চাষী) ডকে উঠেছে। সে বলল—'হুজুর, আমার

একমাত্র অপরাধ আমি গরীব, আর আমার বৌ সুন্দরী।' এর উপর আর জবাব নেই।"

উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করি—'কি হল?'

জজ সাহেব আড়মোড়া ভেঙে উত্তর দিলেন,—'কি আবার হবে! সন্দেহের অবকাশে আসামী ছাড়া পেয়ে গেল। যথোচিত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে কেস ফেঁসে গেল। আমাদের দেশে তো এই বরাবর হচ্ছে।'

বাধা দিয়ে বলি,—'আপনি কিছু করলেন না?'

কথক বলেন,—'আমি কি করব? অনুমান দিয়ে বিচার হয় না। প্রমাণ চাই, সাক্ষ্য চাই, তা ধোপে টেঁকা চাই। তা না হলে আসামীর দণ্ডবিধান করতে পারা যায় না। আমার বিচারক-জীবনে এমন কত কেস্ দেখেছি। কিন্তু কি করব! আমাকে আইন মেনে চলতে হবে। হৃদয়াবেগ মানবতাবোধ সহানুভূতি নিয়ে বিচার-কার্য চলে না।'

আর-এক দিনের কথা। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ প্রশ্ন করি—'আপনার কোনো উপন্যাসের নায়ক কি ঈশ্বর-সন্ধানী হয়ে সংসার-সুখ ত্যাগ করেছে?'

অচিন্ত্যকুমারের তৎপর উত্তর—'না, এমন নায়ক নিয়ে লিখি নি, কিন্তু শীগ্‌গির লিখব। দেখবে তখন ঈশ্বর-ব্যাকুলতা কাকে বলে! ঈশ্বর-সন্ধানে নায়ক অস্থির হয়ে ঘুরছে।' বলতে বলতে বক্তা উত্তেজিত হয়ে উঠেন,—'জীবনে এর চেয়ে বড় অন্বেষণ আর কী আছে? মানব-জীবনের সকল সাধনার চরম তীর্থ ঈশ্বর। ঠাকুরের কৃপা না হলে কি করে হবে? আগে চাই আন্তরিক ব্যাকুলতা, তবেই না কৃপা!'

এই উচ্ছ্বাসের মুখে নীরব থাকা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। ঈশ্বর-সন্ধান আমার স্বদেশ নয়। অচিন্ত্যকুমার হয়ত সেই

পথে এগিয়েছেন। 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমারাধ্যা সারদামণি', 'বীরেশ্বর-বিবেকানন্দ', 'গরীয়সী গৌরী-মা', 'অখণ্ড অমিয় শ্রীচৈতন্য', 'জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ' জীবনী গ্রন্থনিচয়ে ভক্ত অচিন্ত্যকুমারের নব পরিচয় আমরা পেয়েছি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ অচিন্ত্যকুমারের প্রিয় প্রসঙ্গ। এই আলোচনায় তাঁর ক্লান্তি নেই। উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি গম্ভীরকণ্ঠে ঠাকুরের কথা বলেন। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, সকল প্রকার শ্রোতা ও পাঠকের কাছেই তিনি সদ্‌গুরু-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বললাম,—"রামকৃষ্ণদেব-মণ্ডলীর দু-একটি গল্প বলুন।"

"যোগীন মহারাজের নাম শুনেছ তো?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী যোগানন্দের নাম শুনেছি।"

—"ঠাকুর তাঁকে বড় ভালবাসতেন। একবার যোগীন মহারাজের একটি রান্নার কড়ার দরকার হয়। তিনি বড়বাজারে কড়া কিনতে যান। দোকানদারকে ধর্মভয় দেখিয়ে বলেন, 'দেখো বাপু। ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিষ দিও, ফাটাফুটো না হয়।' দোকানদারও 'আজ্ঞে, মশাই, তা দেব, নিশ্চয়ই ভাল জিনিষ দেব'—বলে বেছে বেছে একটি কড়া তাঁকে দিল। তিনিও দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করে কড়াটি পরীক্ষা না করেই কিনে নিয়ে এলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসেই দেখেন, কড়াটি ফাটা। ঠাকুর শুনে যোগীনকে বললেন, 'সে কিরে, জিনিষটা আনলি। দেখে আনলি নে? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে, সে ত আর ধর্ম করতে বসে নি! তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিষ দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। আবার যে-সব জিনিষের ফাউ পাওয়া যায় সে-সব জিনিষ কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত নিয়ে আসবি।' তবেই বোঝো, ঠাকুর খুব হুঁসিয়ার ছিলেন। 'ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন?'—ঠাকুরের এই কথাটি মনে রেখো।"

গল্প শুনে হাসি। কথক উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন—"ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ)। উনি যখন প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফেরেন তখনও তিনি স্বামীজি নামে ভক্তমণ্ডলীর কাছে পরিচিত হন নি। তাঁরা তাঁকে নরেন বলেই জানেন। উনি কলকাতা পৌঁছলে খুব ভীড় হয়। স্বামীজি নেমেই বললেন,—'লেটো-শালাকে দেখছি না কেন?' স্বামী অদ্ভুতানন্দ-ই লেটো বা লাটু মহারাজ। তিনি বিহারের ছাপরা জেলার এক গ্রামের লোক। কলকাতার ডাক্তার রাম দত্তের গৃহভৃত্য ছিলেন। নিরক্ষর। স্বামীজি বলতেন 'লাটু ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য।' স্বামিজীর কথায় তখন সবাই লেটোর খোঁজ করতে লাগল। সবাই লাটুকে ডেকে আনল। উনি এলে স্বামীজি তাঁর হাত ধরে বললেন,—'এতক্ষণ আসিস্ নি কেন?' লাটু মহারাজ স্বভাব সারল্যে উত্তর দিলেন,—'তুমি বড় বড় লোকের সঙ্গে আছ, তাই আসতে ভয় হয়েছিল।' তখন স্বামীজি স্নেহবিগলিত স্বরে তাঁকে বললেন—'চিরতরে তুমি আমার সেই লাটু ভাই, আর আমিও তোমার সেই নরেন ভাই।' লাটু 'নরেন' বলতে পারতেন না, বলতেন 'লরেন'। স্বামিজি তাঁকে আদর করে বলতেন, 'আমার লাটু ভাই,' কখনো বলতেন, 'প্লেটো।' তাহলেই বোঝো, ঠাকুরের কৃপায় মূর্খ বিহারী হল স্বামীজির আদরের লাটু ভাই। আসল কথা হ'ল, ব্যাকুলতা চাই, তবেই না ঠাকুরের কৃপা হবে।"

অচিন্ত্যকুমার হয়ত ঠাকুরের কৃপা পেয়েছেন। জানি না অচিন্ত্যকুমারের অনুরাগী পাঠকরা তা পেয়েছেন কি না।

সবে তখন দেশ ভাগ হয়েছে। হিন্দুরা চাটি-বাটি গুটিয়ে সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঢাকাব স্টীমার ষ্টেশনে তিনগুণ ভাড়া গুণে নিয়ে কোনো হিন্দু পরিবারকে পৌঁছে দিয়েছে এক ঘোড়ার গাড়ির কোচয়ান, ঢাকাইযা কুট্টি। ছেলেমেয়ে বাক্স-বিছানা সামলাতে ব্যস্ত পবিবারের কর্তা। এক পরিচিত মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি হিন্দু ভদ্রলোককে নিষেধ করলেন পাকিস্তান ছাড়তে। নজিব দেখালেন, এই দেখুন না, আমাদের ফ্ল্যাগ সাদা আব সবুজ। সাদা হিন্দুদের আব সবুজ মুসলমানদের প্রতীক। একই পবিবারের তুই ভাই। সাদা আব সবুজ। হিন্দু আর মুসলমান। কুট্টি গাড়িভাড়া গুণে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। মাল খালাস দেখছিল নিবিষ্টমনে। কথাটা কানে যেতেই বলে উঠল, 'কর্তায় কইছেন ঠিক-ই। কিন্তু বাঁশ ঢুকাইছে যে হাদার মধ্যি।' অর্থাৎ পতাকা ওড়াবার বাঁশ গেছে সাদার মধ্য দিয়েই।

এই গল্প কাঁর? চোখ বুঁজে বলতে পারেন, আলি সাহেবের।

এক জবরদস্ত দেশী সাহেব বমনায় যাচ্ছেন। গাড়ির মধ্যে বসে খালি তাড়া লাগাচ্ছেন কোচোয়ানকে। বলছেন, তাড়াতাড়ি যেতে। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন দফ্তবে কোনো মন্ত্রীই বুঝি-বা অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাল কোচোয়ান, 'চল্, চল্, জল্দি চল, রমনায় যাইলেই মন্ত্রী অইয়া বইবি।' সওয়ারী ভদ্রলোক চুপ।

এই গল্প কাঁর? আলি সাহেবের।

পুনরপি, কুট্টিদের আর এক কিস্সা।

এক ভদ্রলোকের খুব তাড়া। নারায়ণগঞ্জের স্টীমার ধরতেই হবে। এমনই ভাগ্য সকলের শেষে তাঁর গাড়ি এসে পৌঁছল স্টীমার-ঘাটে। পেছনের সব গাড়ি তাঁকে রেখে এগিয়ে গিয়ে স্টীমার ধরিয়ে দিয়েছে। তাঁর নসিবে সেদিনকার স্টীমার নেই। ভদ্রলোক রাগে ফেটে পড়লেন। মেঞা ভাই (কোচোয়ান) কিন্তু সমানে হাসছে, আর বলছে, 'বুঝলেন নি! এই গারি অইল বাঘের মা। পোলাপান্-গো খ্যাদাইয়া লইয়া আইলাম। এর লেগেই পিছে-পিছে আইছি।'

এই গল্প কাঁর? কাঁর আবার! আলি সাহেবের!

সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের গল্পের ভাণ্ডার অফুরান। তাঁর উচ্ছল প্রাণবন্যায় শ্রোতা অভিষিক্ত হন। তাঁর আড্ডায় গেলে জীবনীশক্তি বেড়ে যায়। তাজ্জবের কথা, তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পশ্চিম জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর। তাঁর লেখায় জীবনরস ভরপুর। তিনি শ্রীহট্টের প্রাচীন নিষ্ঠাবান সৈয়দ বংশের ছেলে। নিজেও সৈয়দ। অথচ কথাবার্তায় আহারে পান ভোজনে কস্‌মোপলিটান। কট্টর ধর্মভীরু মুসলমান বংশের ছেলে মুজতবা আলি সাহেব বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট লেখক। তাঁর মূল সুর মানবতা, তাঁর মূলধন জীবনরসিকতা।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ দশ বছর আগে। প্রথম আলাপেই আলি সাহেব মনোহরণ করেছিলেন। তা স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই সময় আমি উত্তর কলিকাতায় এক কলেজে সুবহ-শাম পড়াই অর্থাৎ সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ক্লাসে চেঁচাই। আলি সাহেব তখন পাটনা রেডিও স্টেশনে আছেন। ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ কয়েকটি এক্স্‌টেনশন-লেকচার-এর ব্যবস্থা করলেন। তার প্রথমটি দেবেন আলি সাহেব। তিন দিনের বক্তৃতা, দক্ষিণা ভালই। বিষয়—বাংলা সাহিত্যে মানবিকতা। আলি সাহেব পাটনা থেকে এসে উঠলেন তাঁর পুরনো ডেরায় অর্থাৎ

পার্কসার্কাসে পার্ল রোডের বাড়িতে। কলেজ-কর্তৃপক্ষের আদেশে রোজ দুপুরে ট্যাক্সি নিয়ে তাঁকে আনতে যেতাম।

পয়লা দিন আমার সঙ্গে আর এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি গিয়েই আলি সাহেবের কাছে কলেজের ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলেন। আলি সাহেব গোল্ডফ্লেক টানতে টানতে শুনলেন। উনি বললেন, 'এই কলেজের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি রাজস্থান থেকে একদা লোটা কম্বল সম্বল করে কলকাতায় আসেন। এক বাড়িতে দারোয়ান ছিলেন। তারপ। নিজ বুদ্ধিবলে বহু টাকা করেন ব্যবসায়। সেই টাকা থেকেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা।' আলি সাহেব সবটা শুনে একটি মন্তব্য করলেন—'ঐ চাক্‌রিটা খালি আছে কিনা বলতে পারেন?'

'কোন্‌টা'?

'ঐ দারোয়ানের চাক্‌রিটা। ঐটা থেকেই যখন শুরু, তখন ঐটি পেলে আমি কবি।' ভদ্রলোক চুপ।

আলিসাহেব তিন দিনের বক্তৃতায় দেখিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে মানবিকতা ববাববই ছিল ও আছে। ধর্মেব প্রভাবে যে উচ্চকোটির সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে, তার বাইরে লোক সাহিত্যে জনজীবনের সুখ দুঃখেব মালা গত হাজাব বছব ধবে গাঁথা হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ এই ধারার শ্রেষ্ঠ শিল্পী।'

প্রতিদিন একঘণ্টা কবে বক্তৃতা। শ্রোতারা ষাট মিনিট ধরেই হেসে গড়িয়ে পড়তেন। আর আলি সাহেব গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করতেন। একদিন বললেন, শ্রীহট্ট থেকেই যত গ্রেটম্যানের আর্বিভাব। শ্রীচৈতন্যদেবের আদি বাড়ি শ্রীহট্টে, লালন ফকির সিলেটের লোক। অবশ্য আমার কথা এখানে বলছি না। (আলি সাহেবের বাড়ি সিলেটে)। এই কথা বলেই লালন ফকিরের গানের শ্লোক ঝাড়লেন—

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জান গে সে মরা কেমন, মুর্‌শীদ ধরে জানতে হয়॥'

রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'গুরুদেব মর্তের কবি। তিনি এক মুহূর্তে আমাদের 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে' গেছেন, সেখানে তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে, নিদ্রাবিহীন গগনতলে।' পর মুহূর্তেই মর্তে ফিরিয়ে এনেছেন, গেয়েছেন—

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

আলিসাহেব এই মর্তপ্রেমিক কবির ছাত্র। তাঁর ছাত্রজীবনের একাংশ কেটেছে শান্তিনিকেতনে, একাংশ বন্‌-এ। একাংশ কাইরোয়। তিনি বরদা ও কাবুলে অধ্যাপনা করেছেন। পাটনা, কটক, কলকাতা ও দিল্লী রেডিও-স্টেশনে চাকুরি করেছেন। তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন শান্তিনিকেতনে বসে আছেন। সেখানে 'কালো'র দোকানে বসে চা খাচ্ছেন আর আড্ডা দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে বয়েৎ ছাড়ছেন—

যত পয়সা কামাইছিলাম শুঁটকিমাছ খাইয়া,
সব আইস্যা খাইয়া নিল গোলাম আলির মাইয়া।

আলি সাহেবের সুভাষিতাবলি মনে রাখার মতো। তাঁর সঙ্গে কোলকাতায় মাঝে-মাঝে আড্ডা দিয়েছি। তার থেকে যা সঞ্চয় করেছি, তারই খানিকটে পরিবেশন করছি।

আলি সাহেব যদি কোন প্রতিষ্ঠানে আস্থা পোষণ করেন, তা হলো আড্ডা। এই আড্ডায় বসে হেন বিষয় নেই, যা নিয়ে তিনি বাৎচিৎ করেন না। বের্লিন, কাইরো, কাবুল, কলকাতা—সর্বত্র তিনি আড্ডা দিয়েছেন। মনে পড়ে, উপেনদা (গঙ্গোপাধ্যায়) বলতেন, জীবনের প্রধানশিক্ষা লাভ করেছি আড্ডায়। আলি সাহেবের তাই মত।

একদিন পার্ল রোডের বাড়িতে সকালে গিয়েছি। দেখি, আলি

সাহেব সিল্কের লুঙ্গি আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরে ঘরে পায়চারি করছেন, জর্দা-পান খাচ্ছেন আর গোল্ডফ্লেককে টান দিচ্ছেন। যেতেই বললেন, বাবাজীবন এসো, কি মনে করে!

টেবিলের উপর একটি মনোহর বাঁধানো বই ছিল। হাতে নিয়ে দেখি 'গীতাঞ্জলি'। বললাম, 'এত চমৎকার বাঁধাই কোথায় হয়?'

আলি সাহেব হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'বৎস, ওটি হাত দিয়ো না। পুরোনো দিল্লীর এক বুড়ো দপ্তরী এটা বাঁধিয়েছে। এমন বাঁধাই আজ আর পাবে না।'

বললাম, কাইরোর আড্ডার কথা বলুন।

আলি সাহেব আড্ডা-মাহাত্ম্য শুরু করলেন।

"শতকরা নব্বুই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীল নদ কাফে'তে। কাইরোর আড্ডা কখ্খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে কোরে আড্ডার নিরপেক্ষতা—কিংবা বলো গণতন্ত্র—লোপ পায়। যাক্ সে কথা।

"ঐ 'নীল নদ কাফে'তে কফির দাম ছ পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়। তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু ঘাবড়াবার নেই। দু দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। কালো কফি খেলে রঙ্‌ভী ফর্সা হয়।

"আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সুব্‌হ্-শাম যেতুম। বিদেশ-বিভুঁই। কাউকে বড় একটা চিনিনে, ছন্নের মত হেথা হোথা ঘুরে বেড়াই।

"এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করিনি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণ কর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ। আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা

ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রহ্ম মুহূর্তে। 'সে মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কি দেব? নিশ্চয়ই জানো, শ্রীহরি রাধাতে, ইউশুফ জেলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষুর বিনিময় হয়েছিল। তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে এসো, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগেনি। এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল। সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয় ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রোঁদ কফি?'

"আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের ওতর-পূব কোণে কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফোন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহ্‌হাব আতিয়া কপ্ট ক্রীশ্চন, জুর্নো ফরাসী, মার্কোস গ্রীক, আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপের ভশ্চায্যি আর জমিদার-হাবেলীর মৌলবীর প্রতিনিধি এই অধম আড্ডার সদস্য ছিল। এক 'রোঁদ' কফি হয়ে গেল। আমি ঘরের লোক, ভাই-বেরাদার হয়ে গেলুম।

"হঠাৎ দুম্‌ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচবকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকি তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্‌ এক প্রদেশের—বিঙ্গালা, বাঙীলা—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

"উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙ্গালা?'—

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ'—

"আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে

আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাটগাঁ, ফরিদপুরের লোক। তাছাড়া কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে খিরিদপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়'।

"আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম "আমি বাঙালী।"

আলি সাহেব থামলেন। একটা জর্দা পান মুখে ফেললেন। আমি কেবল বললুম—'হিয়ার হিয়ার'।

আলি সাহেবের সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে। বিশেষত রসের কথা। অপিচ, সর্ব-রসের রসরাজ ভোজনরসের কথা। আশ্চর্য সুনীতিকুমারের মতো আলি সাহেবও ভোজন-রসিক। দুনিয়ার তাবৎ খানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ রসনা-পরিচয় আছে।

এক দিনের আড্ডায় ভোজনরসের প্রসঙ্গ চলছিল। শুধালুম, 'আপনি তো দুনিয়ার তাবৎ খানা খেয়েছেন। সব চেয়ে ভালো 'ডিশ' কোন্‌টা ?'

আলি সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ইলিশের ডিশ। বাঙালীর রাঁধা ইলিশ। সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা যে-রকম ইলিশদেবীর পুজো দি, ওরকমধারা আর কেউ পারে না। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-ওক্ত নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই।'

আমি কেবল ভাবি, গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে কি পদ্মা-গঙ্গার টাটকা ইলিশ পাওয়া যায় ?

আর-এক দিনের আড্ডার কথা বলি। গিয়ে দেখি, আলি সাহেব একটা লম্বা লাল কাপড়ের থলে উপুড় করে মেলা

সিকি-আধুলি দুয়ানি-পয়সা গুনছেন। বললাম, 'এটা কি হচ্ছে?'

'চোপ্।'

গুনে গুনে পয়সা নিয়ে চাকরকে দিলেন, বললেন, 'বাপজান, এক টিন গোল্ডফ্লেক আনো।' টিন এলে একটি সিগারেট ধরালেন। এতক্ষণে 'মুড' এলো। বললেন, 'কি খবর?'

তখন শুরু হ'ল আড্ডা।

আমার হাতে একটা সদ্য-কেনা বই ছিল। সেটা দু'চারবার উল্টে পাল্টে বললেন, 'তুমি কি বাঙালী?'

'আপনার কি সন্দেহ আছে?'

'বাঙালী তো বই কেনে না। বলে, পয়সা কোথায়? অথচ, দেখবে, ফুটবল আর সিনেমার টিকিট কাটে 'কিউ' দিয়ে। সেই-জন্যে বলছিলাম, বড় যে বই কিনেছ!'

উত্তরে বলি, 'বইয়ের গল্প বলুন।'

কটু-কাটব্য করে আলি সাহেব বললেন, "বাঙালীর কাছে বইয়ের গল্প! তবে শোনো। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিণীর কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাক কুঁচকে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

"যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।"

গল্প শুনে ঠা—ঠা করে হাসলাম।

একথা-ওকথার পর আলি সাহেব বললেন, 'বিয়ে করেছ?'

'আজ্ঞে,—করব-করব ভাবছি।'

'বিয়ের প্রথম মন্ত্র জানো?'

'আজ্ঞে, না।'

'তবেই হয়েছে। বিয়ে করার প্রথম মন্ত্রটি শিখে নাও। বৌকে সদাই ডরাবে।'

—'তার মানে?'

"তবে শোনো। শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিবাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে।"

বাধা দিয়ে বলি, 'কোথাকার রাজা?'

"চোপ্। যা বল্‌ছি শুনে যাও। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করতে হঠাৎ খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন, 'ঐ রানীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার। বাপ্‌রে বাপ্। দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

"মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন, 'ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ। বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডবাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

"রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' বাজি ধরলেন দশ লাখ টাকা।

"পরদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারী হ'ল—বিষ্যুৎবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়, মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।"

"লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচা—তার উপরে মহারাজ আর প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

"যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মতো সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

"বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্‌ করছে।

"রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তা কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, 'তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ-লক্ষা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।' মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, 'তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

"লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝি নে হুজুর। এখানে আসার সময় বউ আমাকে ধমকে দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেদিকে যেয়ো না।' তাই আমি ওদিকে যাই নি।"

গল্প শুনে অনেকক্ষণ প্রাণভরে হাসলাম। আলি সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'খুব, হুঁশিয়ার। বিয়ে করলে সমঝে চলবে।'

আলিসাহেব অধুনা বীরভূমের মরুভূমিতে বাসা বেঁধেছেন। কদাচিৎ কলকাতা আসেন। তাই তাঁর দেখা পাই না। পাঠক, যদি গল্প শুনতে চান শান্তিনিকেতনে যাবেন।

আলি সাহেবের দুখানি খোশগল্প বলে লেখা শেষ করি কারণ কালি ফুরিয়ে গিয়েছে।

পয়লা গল্প সুইস খোশগল্প। পলৃডি ছোকরা এক মার্কিন টুরিস্টকে এক দুর্গ দেখিয়ে বলল –'ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে?'

টুরিস্ট—'হাসপাতালে।'

পল্টু—'সর্বনাশ। কি হয়েছিল আপনার?'

দুসরা গল্প সেই সনাতন ঢাকাইকুট্টির খোশগল্প। এক কুট্টি একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিশের এসাইকে। বর্ষা-কালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে,—জল জল, সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিশের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো টিপ্পনি কাটতে পাবছে না—যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো দ্যান কুল্লে পাঁচটি টাকা, পানি পড়বে না, তো কি শরবৎ পড়বে?'

জরাসন্ধ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি ছড়া পড়েছিলুম বহুদিন আগে—

কেশনগরের মশা

করলে আমায় সারা···

বহরমপুর বেড়াতে গিয়ে সেই ছড়াটি প্রতি সন্ধ্যায় আমার মনে পড়ত। অন্নদাশঙ্কর কেশনগর বা কৃষ্ণনগরের মশার কথা না লিখে বহরমপুরের মশার কথাও লিখতে পারতেন। সেই বহরমপুরের সরকারী কুঠিবাড়ী ও কোয়ার্টার। এখন যেটায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। সেটায় আগে কর্নেল ক্লাইভ এসে উঠতেন। তা উঠুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে টিঁকে থাকতে পারেন নি। সেই এলাকার এক কোয়ার্টারের বাগানের ধারে একটি ছোট ঘরে একটি টেবিলে এধারে ওধারে মুখোমুখি চেয়ারে দুজনে বসে আছি। এপারে এই অধম। ওপারে 'জরাসন্ধ'। সবুজ কাপড়ে ঢাকা টেবিলে একটি বাতিদান। তার আভায় তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সৌম্য প্রসন্ন স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত এক আননের অধিকারীর চোখ দুটি চশমার কাঁচের ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গল্প বলার ঢঙটি খুব মিষ্টি। নিরুত্তেজ প্রসন্ন তরল কণ্ঠে তিনি গল্প বলেন. কখনো বা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে উপনীত হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতটি তোলেন, কণ্ঠস্বর অবরোহ থেকে আরোহে ওঠা নামা করে।

মহাভারতের বীর জরাসন্ধ বহু রাজাকে তাঁর কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। আপন কীর্তি ঘোষণা ও পাণ্ডব-পক্ষকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য জরাসন্ধের ছিল। 'রাজগৃহ' আজও তাঁর কীর্তির সাক্ষ্য স্বরূপ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের হাতে জরাসন্ধের শোচনীয় মৃত্যুর কথা কে না জানেন।

প্রশ্ন করলাম—আপনি কি জরাসন্ধের সবটাই ?

হাত নেড়ে ছদ্মভয়ে উত্তর দিলেন,—'আরে, না, না। আমি কেবল কারারক্ষক। একালের বহু রাজা-উজীর-প্রজা আমার আশ্রয়ে আছেন, তাঁদের তদারক করি। তাই জরাসন্ধ।'

হ্যাঁ, ইনি 'জরাসন্ধ' ওরফে শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী। যে সময়ের কথা বলছি তখন তিনি বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট, তখন সারা উত্তর ও রাঢ় বঙ্গের জেলগুলি তাঁর অধীন। বহুকাল পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তারপর যোগসূত্র নষ্ট হয়ে যায়। পনেরো বছর বাদে তাঁর সঙ্গে নোতুন করে আলাপ হল। ছোট বেলায় আমরা তাঁকে জানতুম শিশুসাহিত্যের লেখক বলে, 'শিশুসাথী'তে তাঁর অনেক গল্প পড়েছি। সেই যে যুবক কোথাও কিছু জোটে না দেখে শেষ পর্যন্ত বুড়োর ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রবীণ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করল। তার নিদান ও বিধানের একটি অব্যর্থ মন্ত্র ছিল—সেই মন্ত্রের খানিকটা আজো মনে পড়ে—

> ঘুসঘুসে জ্বর পেট-জোড়া পিলা
> চোখ বুজে দাও পালসেটিলা।
> বুক ধড়ফড় কাশি ঠনঠন
> সিনা-ইপিকাক দেবে ঘন ঘন।

এই মন্ত্রের জোরে সে দিব্বি ব্যবসা চালিয়ে গেল।

তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে। 'বিচিত্রা' ও 'শিশুসাথী'র গল্পকার চারুচন্দ্র চক্রবর্তী সরকারী কর্মসমুদ্রের তরঙ্গে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছেন। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বহে গেছে। সমুদ্রে কত নদী বন্দরে এসে মিশেছে। তরঙ্গের আঘাতে তাঁর ভেলা আবার সাহিত্যের বন্দরে এসে পৌঁছেছে। দেশ পত্রিকায় বেরুল 'লৌহকপাট' প্রথম পর্ব। Vini, Vidi, Vici, রাতারাতি জরাসন্ধ নামটি পরিচিত হয়ে গেল। 'লৌহকপাট' বইটি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। এই

প্রথম পর্ব যখন বেরোয় তখন তিনি দমদমে। তারপর দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। শনিবারের চিঠিতে তৃতীয় পর্ব লিখেছেন। তখন তিনি বহরমপুরে। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে পুরানো প্রেম নোতুন করে ঝালিয়ে নিলাম। বহরমপুরের মশকবাহিনীর প্রচণ্ড দাপট ভুলে যাবার একমাত্র মকরধ্বজ ছিল জরাসন্ধের আড্ডা। এই আড্ডার লোভেই দিন সাতেক ছিলাম। নইলে ঐ ভয়ংকরের হাতে আপন প্রাণটি সঁপে দিতে কে চায়?

বহরমপুরের আড্ডায় 'জরাসন্ধে'র কাছে কারাজগতের নানা কাহিনী শুনেছি। জেলে খুব 'ফানি' চরিত্র দেখেছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে জরাসন্ধ সোৎসাহে স্মিতহাস্যে বললেন—"হ্যাঁ, দেখেছি। শোনো। তখন আমি পূর্ববঙ্গে। সারা বাংলাদেশের কত জায়গাতেই না ঘুরেছি। আমার প্রথম চাকুরি দার্জিলিং জেলে। সেখান থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে—জেলা শহর, হেডকোয়ার্টার, —মেদিনীপুর থেকে দমদম, দার্জিলিং থেকে চট্টগ্রামের কক্সবাজার —সর্বত্র গিয়েছি। এমনই এক জেলের ঘটনা। তখন আমি জেলর। আমি চার্জ বুঝে নিচ্ছি বদলী-অর্ডার-পাওয়া সিনিয়র জেলরের কাছ থেকে। দেড়গজি ফর্দটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। 'বুঝিয়া পাইলাম' বলে সই করে দেবার পর আর কিছু বলার নেই। তিনদিন ধরে দেখছি, শুনছি, মেলাচ্ছি। ঘানিঘরের কয়েদী থেকে রসদ গুদামের বস্তা, ডেইরির ষাঁড় থেকে পোলট্রির আণ্ডা। পেঁয়াজ, পাঁচফোড়ন, হাতা-খুন্তি, মগ-বালতি—সব ওজন করাচ্ছি, গুনছি, মেলাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত সই করে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, বাঁচা গেল।

"বিদায়ী সিনিয়র জেলার রায় সাহেব ঐ দেড়গজী ফর্দের একটা নকল পকেটস্থ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওঃ—হো! আসল বস্তুটাই তো আপনাকে বোঝানো হয়নি।'—বলে হাঁক দিলেন, 'রতিকান্ত!' আপিসের পেছন দিকের একটা ছোট্ট ঘর থেকে

বেরিয়ে এলো এক কৃষ্ণমূর্তি। ছায়ামূর্তি বললেই চলে। হাড়ের ফ্রেমের ওপর চামড়ার খোলসটা জড়াবার আগে মাঝখানে যে একটা মাংসের প্লাস্টার দিয়ে নেওয়া দরকার, সেকথা বোধ হয় ওর বিধাতা ভুলে গিয়েছিলেন। সে অভাব পূরণ করেছে পিঠের ওপর একটা মস্ত বড় কুঁজ। ঝুঁকে-পড়া দেহটিকে আরো খানিক নুইয়ে ডবল প্রণাম ঠুকলো রতিকান্ত। তারপর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল হুকুমের অপেক্ষায়। রায়সাহেব বললেন,—'এটি আপনার খাস্। বয়, বেহারা, বাহন—একাধারে সব। টেবিল ঝাড়বে, ফাইল গোছাবে, এটা ওটা এগিয়ে দেবে। কাজের লোক। তবে কাজটা মাঝে মাঝে একটু বেশী করে ফেলে। যে চিঠিটা ডাকে দেওয়া দরকার, সেটা তাকে তুলে রাখে। আর কালো কালির দোয়াতে ঢেলে দেয় লাল কালি।'

প্রশংসা শুনে রতিকান্তের মুখের ওপর একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। আজকালকার বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মত লজ্জার ভঙ্গী করে দাঁড়াল। বললাম, 'তোমার নামটি তো বেশ।'

হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হল। বিগলিত কণ্ঠে বলল, রতিকান্ত, 'আজ্ঞে, ওটা আমার গুরুদেবের দেওয়া। আগের নাম ছিল ভজহরি।'

গুরুদেবের রসজ্ঞানের তারিফ করে বললাম, 'বেশ, বেশ, তারপর, জেল হল কিসের জন্য?'

—'৩৭৯ ধারা। আর কি!' রায় সাহেব উত্তর দিলেন।

রতিকান্ত নম্রনেত্রপাতে ভূমিতলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। প্রশ্ন করলাম,—'কী চুরি?' মৃদু কণ্ঠের কুণ্ঠিত উত্তর—'গরু'।

জরাসন্ধ এতক্ষণে থামলেন। হাসি-বিনিময়ের পর বললেন,—"এটা কিন্তু বিরল ঘটনা। অপরাধের কথা এত সহজে কেউ কবুল করে না। রতিকান্ত একটা বিরল ব্যতিক্রম। জেলের সমাজে কৃত অপরাধের জাতি ও গুরুত্বভেদে অধিবাসীদের স্তরভেদ

আছে। কুলীনপাড়ার লোক হলেন খুন, তহবিল তছরূপ, ডাকাতি, নারীহরণের নায়ক। চুরির স্তর অনেক নীচে। সবার নীচে, সবার শেষে সবহারাদের মাঝে যার বাস, তার নাম গরুচোর। শুধু হরিজন নয়, অভাজন। চোর হলেও এরা চোর জাতির কলঙ্ক। স্বজাতির আসরেও হুঁকাবন্ধ। এই জন্যে জেলে এসে সহজে মুখ খোলে না। আমার এক সহকর্মী ছিলেন। কয়েদী খালাস দেবার সময় নাম ধাম বিবরণ ইত্যাদি মেলাবার পর তিনি সবাইকে একটি প্রশ্ন করতেন—'কী চুরি?' যাদের অপরাধ চুরি নয় তারা সগর্বে কুলীন শ্রেণীর অপরাধের উল্লেখ করত—খুন, ডাকাতি, বা নারীহরণ। যারা চুরি সেকসনে দণ্ডিত, তারাও বলত, টাকা চুরি, কাঁঠাল চুরি, ঘড়ি চুরি কিংবা অন্য কিছু।' একবার এমনি এক ৩৭৯ কিছুই বলতে চায় না। জেলার সাহেব নাছোড়-বান্দা। টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠলেন, 'কী চুরি?'

—'আজ্ঞে, গরুর বিষয়ে।'

হাসি শেষ হলে পর জরাসন্ধ বললেন, 'ফানি গল্প শুনতে চেয়েছিলে না? কী রকম লাগল?' হার স্বীকার করতে হল।

আর-এক সন্ধ্যার আড্ডা। পরের দিন জরাসন্ধের গৃহে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মতো ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। জরাসন্ধ জানতে চাইলেন,—'কী খাবে? কোন ডায়েট? বিহার ডায়েট, না বেঙ্গল ডায়েট, না কি পাঞ্জাব ডায়েট?'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি,—'তার অর্থ?'

জরাসন্ধের ব্যাখ্যা—'আহা, এটা আর বুঝলে না। জেল সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী-খাদ্য তিন প্রকার। বেঙ্গল ডায়েট অর্থাৎ দুবেলা ভাত, বিহার ডায়েট অর্থাৎ একবেলা ভাত, একবেলা রুটি, আর পাঞ্জাব ডায়েট অর্থাৎ দুবেলাই রুটি। তোমার কোনটা চাই?'

গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলাম—'বহরমপুর-ডায়েট যদি থাকে তো সেটাই দেবেন।' মিলিত হাস্যে আড্ডার সমাপ্তি ঘটল।

পরদিন ছুটির দিন। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পরে বিলম্বিত লয়ে আড্ডা শুরু হল, শেষ হল রাত দশটায়। অনেক গল্প হল। বহু রাজা-উজীর বধ হল। অনুরোধ করেছিলাম, আর একটি funny কাহিনী বলুন।

জরাসন্ধ হেসে শুরু করলেন, 'সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিন-টেনডেণ্টকে বড় সাহেব বলে।'

মন্তব্য করলাম—'যেমন বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিন্-টেন্‌ডেণ্ট মিঃ সি. সি. চক্রবর্তী হলেন এখানকার বড় সাহেব।'

একটু হেসে 'জরাসন্ধ' বলতে থাকেন,—"তখন আমি···সেণ্ট্রাল জেলে। প্রতি সোমবার সকালে 'ফাইল' দেখি। এটি সেদিনের প্রধান কাজ। লাল ফিতে বাঁধা কার্ডবোর্ডের ফাইল নয়, কোমরে গামছা বাঁধা কয়েদীর 'ফাইল'। সেই ফাইলের গল্প শোনো।

"জেলে ঢুকতেই বড় বড় ব্যারাক। হরেক রকম কয়েদী থাকে তার মধ্যে—চোর, ডাকাত, পকেটমার, তাবই সঙ্গে খুনী, গুণ্ডা, জালিয়াতের দল। ব্যারাকের কোলে কোলে লম্বা বারান্দা। সোমবার সকালে সেখানে এসে সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়াতে হয়। তারই নাম 'ফাইল'। বড় সাহেব সামনে দিয়ে চলে যান। আগে পিছে চারজন বেটনধারী সিপাই, তার পেছনে জেল-আপিসেব বাবুরা। যার যা নালিশ থাকে কয়েদীরা একে একে বলে যায়। কত রকমের নালিশ। কেউ 'মেট' হতে চায়, অর্থাৎ সাধারণ কয়েদী থেকে কয়েদী-সরদার। কেউ গম পেষা ছেড়ে দিয়ে গুদামে যেতে চায়। কেউ বাগানে মালীর কাজ করতে চায়। যারা জেলে যায়, তাদেরও বাড়িঘর আছে। কেউ ছ'মাস চিঠি পায় নি, বাড়ির খবর চায়। কেউ খবর পেয়েছে, তার জমির ধান প্রতিবেশী কেটে

নিয়েছে। পুলিশের সাহায্য চায়। আবেদনের থালা নিয়ে আসে কয়েদীর দল। আবেদন শুনেই যা-হোক একটা রায় দিয়ে ফেলতে হয়। ভাবনার অবকাশ নেই।

"আমি ফাইল দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি। কোণের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল এক মাতব্বর কয়েদী। সবাই না শুনতে পায়, এমনি ভাবে গলা খাটো করে বলল, 'ঘরে আমার কিছু টাকা আছে হুজুর। চুরি হয়ে যেতে পারে। এখানে এনে রাখা যাবে?'

উত্তর দিলাম—'যায়, যদি কেউ পৌঁছে দেয়। আপিসে জমা থাকবে, যাবার সময় পেয়ে যাবে।'

পাশের লোকটি জোরে জোরে ঘাড় নাড়ছিল।

প্রশ্ন করি, 'কিছু বলবে?'

খুশী হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, না বুঝে গেছি।' দেখি আশেপাশে সবাই চাপা হাসি হাসছে। দু একজনকে বলতে শুনলাম, 'ও পাগল আছে, হুজুর।'

চলে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম কয়েদীরা বলছে—'এই জগা, মাথা নাড়ছিলি কেন?

জগা-পাগলা কেবল বলে—'বুঝে গেছি।' আর একগাল হাসি।

"এই জগা পাগলার 'বুঝে গেছি' শেষ পর্যন্ত সারা জেলকে বুঝিয়ে ছেড়েছে। দিন দশেক বাদে এক সকাল। বেলা দশটা। জেলা-আপিসে পুরোদমে কাজ চলছে। উপরতলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত সবাই কাজে ব্যস্ত। এমন সময়ে একটি গেঁয়ো লোক বেশ বড়-বড় একটা বক্না বাছুর নিয়ে জেলগেটের সামনে দাঁড়াল। বন্দুক ধারী সান্ত্রী গেটের বাইরে টহল দিচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'এজ্ঞে, এটা জমা দেবো।'

'কী জমা দেবে? এই গরু?'

'এজ্ঞে।'

সান্ত্রী অবাক। গরু জমা দেবে। জেলখানায়। এটা কি খোঁয়াড় না পিঁজরাপোল? লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, 'এজ্ঞে চিঠি আছে।'

'কই দেখি?'

"লোকটি ট্যাঁক থেকে বার করে দিল জেলের ছাপমারা একটা চার ভাঁজ করা ময়লা পোস্টকাড। সান্ত্রী চিঠি পাঠিয়ে দিল জেল-আপিসে। চিঠি পড়ে আপিসের সবাইয়ের মুখ চূণ! আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা কয়েকটি লাইনের চিঠি। লিখেছে ৭১২ নম্বর কয়েদী জগন্নাথ সরকার। জেলের গোলমোহর, বড় সাহেবের সই, জেলরের সই, তার নীচে কেরানী কানাইবাবুর ফুটকি। আপিসী দস্তুর অনুযায়ী তিন-চার হাত ঘুরে চিঠি 'পাস' হয়ে চলে গেছে। কোনো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কয়েদী বা 'রাইটার' অন্যান্যদের চিঠি লিখে দেয়। কানাইবাবু তা পড়ে ছাপ মারে। তারপরে উপরঅলা সই করেন। বড় সাহেব কানাইবাবুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সই ও জেলের ছাপ দেখে নিঃসংশয়ে সই করে দেন। জগন্নাথের পোস্টকার্ড কানাইবাবু না পড়েই 'পাস' করে দিয়েছেন। চিঠি পড়ে কানাই-বাবুর আক্কেল গুড়ুম।

"হতভাগার পোস্টকার্ড এবার বুঝি কানাইবাবুর চাকুরি খেল! এখন উপায়! চিঠিখানা কম্পিত হৃদয়ে তিনচার বার পড়লেন কানাইবাবু। জগন্নাথ ওরফে জগাপাগলা তার কোনো ভাইকে লিখছে—"এই চিঠি পাওয়া মাত্র আমার মঙলীকে জেল-গেটে আনিয়া জমা করিয়া দিবে। অন্যথা না হয়। বড় সাহেবের হুকুম আছে। চিঠিখানা সঙ্গে আনিও। ইতি—তোমার জগাদা।" চিঠির মাথায় যথারীতি রাইটারের হাতে লেখা আছে—৭১২-এ জগন্নাথ সরকার।

"কানাইবাবু যখন এই বিষম বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার হবেন ভাবছেন তখন আপিসে কর্মরত কোনো কয়েদী গিয়ে জগন্নাথের

কানে খবরটা তুলে দিয়েছে। শুনেই জগা-পাগলা গম পেষা ফেলে রেখে জেলগেটের দিকে ছুটল। মঙ্গলীকে কতদিন দেখেনি। কেমন আছে কে জানে।

চেঁচামেচি শুনে জেলর বাবু জগাকে ডেকে পাঠালেন। ধমক দিয়ে বললেন, 'এ সব কী লিখেছ? বড় সাহেব বলেছেন গরু জমা দিতে?'

জগা হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে, আমার সামনেই তো একজনকে টাকা জমা দেবার হুকুম দিলেন।'

'টাকা আর গরু এক হল!'

'আজ্ঞে হুজুর, আমার তো আর টাকাকড়ি নেই। থাকবার মধ্যে আছে ঐ বক্‌নাটা। ঐ আমার সব।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ওটা থাকবে কোথায়! খেতে দেবে কে?'

'সে কথা আমি কেমন করে জানব, হুজুর?'

'ওসব হবে না। গরু নিতে পারবো না আমরা।'

'তা হলে ও কোথায় যাবে, হুজুর? আমার যে আর কেউ নেই। একটু ঘাস আর জল না পেয়ে মরে যাবে আমার মঙ্গলী।'

আপিস থেকে জগা কিছুতেই নড়ে না। কয়েদীরা বলছে জগার তো অন্যায় নেই। জেলরবাবু শেষ-পর্যন্ত 'সুপার' ওরফে বড় সাহেবের কাছে জগাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন চিঠিটা পড়ছি জগা হঠাৎ সিপাইদের পায়ের ফাঁক দিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিল। 'দোহাই সায়েব। বাচ্চাটাকে রাখবার হুকুম দিন। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।'

আমি মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। কানাইবাবুকে বকলাম, কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হয় না। জগা-পাগলাকে ঠেকাই

কি করে? চিঠি সই করে দিয়ে আমিও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। না জেনেই অনুমতি দিয়ে ফেলেছি। এখন কথা দিয়ে কথা ফেরাই কি করে? তাই বলে কয়েদীর সম্পত্তি হিসেবে একটা জলজ্যান্ত গরু তো সত্যি সত্যি আপিসে জমা রাখা যায় না। এর পেছনে খরচ আছে। সেটা কে দেবে? কে গরুর পরিচর্যা করবে?

"বড় জমাদার রামঅওতার সিং এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এক নজরে বক্‌নাটাকে দেখে এসেছে। খেতে না পেয়ে রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু জাত ভাল। যত্ন আত্তি করলে বছর-খানেকের মধ্যেই বাচ্চা দেবে। একটানে সের চারেক দুধ দেবে মঙ্‌লী।

"দু' কদম এগিয়ে বড় সায়েবকে একটা টানা সেলাম ঠুকে বলল, হুজুরের অনুমতি পেলে সে গরুটার ভার নিতে পারে। সরকার যখন পারবেন না তখন তাকেই ভার দেওয়া হোক। বক্‌না বাছুর, মা ভগবতীর অংশ। এসে যখন পড়েছে, ফিরিয়ে দিলে অধর্ম হবে।

উপায়ান্তর না দেখে আমাকে অগত্যা রাজী হতে হল। রাম-অওতার সিংয়ের মতলবটা বুঝি নি, তা নয়। কিন্তু জগা-পাগলাব সমস্যার সমাধানের আর কোনো পথ তখন খোলা ছিল না। তাছাড়া রামঅওতার রামজীর কিরিয়া খেয়ে শপথ করল, বছর দুই বাদে জগা যেদিন ছাড়া পাবে সেদিনই বক্‌নাটাকে সে ফিরিয়ে দেবে। এতে জগা পাগলাও রাজী হয়ে গেল। বক্‌না জমা রাখার জন্য জমাদার রামঅওতার সিং কোনো খরচপত্র দাবী করবে না, এই প্রতিশ্রুতিও সে জগাকে দিল।

রামঅওতার সিং মহানন্দে মঙ্‌লীকে তার কোয়ার্টারের পিছনের বাগানে রাখল। একটু অবশ্য বে-আইনী হ'ল। কিন্তু আর উপায় কি? সিং রীতিমত মঙ্‌লীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ

করল। একমাসের মধ্যে বকনাটার চেহারা ফিরে গেল। তিন-চার মাসেই বেশ চেকনাই দেখা গেল।

জগা প্রায়ই খবর নেয়, 'আমার মঙলী ভাল আছে জমাদার সাহেব?'

'ভালো আছে মানে! দেখলে তুই চিনতে পারবি না।'

'বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে তো?'

'তা খাচ্ছে, খড়-খৈল-ভূষি খুব খায়।'

'আপনার খুব খরচ হচ্ছে তা হলে?'

'কী করব বল্? মা ভগবতীর অংশ, ফেলে দিতে পারব না তো।'

'কতদিন মঙলীটাকে দেখি না। একটু দেখাবেন জমাদার সায়েব? একদিন জেল-গেটে আসুন, একটু দেখি।'

'যা, যা, মন দিয়ে কাজ কর। বড় সায়েব জানতে পারলে আর রক্ষা আছে? তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এলে তোর মঙলী তোর কাছেই ফিরিয়ে দেবো।

"বছর ঘুরতেই মঙলীর একটি সুন্দর বাচ্চা হল। রামঅওতার সিং তার নাম রাখল ধবলী। মঙলী দিনে প্রায় ছ-সাত সের দুধ দেয়। জমাদার দুধ খায়, বিক্রী করে। সবই বুঝতে পারি। অথচ কিছু করবার নেই। তাই চুপ করে রইলাম। জগা এখন তার কাজে মন দিয়েছে। ভাল কাজ করলে কয়েদীরা পুরো মেয়াদ থেকে কিছুটা 'রেমিশন' পায়। জগা তাড়াতাড়ি বেরোতে চায়। রেমিশনের জন্য মন দিয়ে কাজ করে। মঙলী যে আগের :মত বাচ্চাটি নেই, তারই বাচ্চা হয়েছে, দুধ দিচ্ছে, এ সব কথা জগা ভাবে নি, তাকে সে-খবর জমাদার দেয় নি।

অবশেষে জগন্নাথের খালাসের দিন এসে গেল। জন কুড়ি কয়েদী সেদিন খালাস পেয়ে যাচ্ছে। জগাও আছে। লাইন

করে সকলে আমার সামনে বসে আছে। খালাস-পাওয়া কয়েদীদের খোরাকি ও রেলের 'পাশ' দেওয়া হচ্ছে।

'জগন্নাথ সরকার।'

নামটা কানে যেতেই আমি চমকে উঠলাম। এবার তো জগার ধন জগাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। জেলারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—'ওর গরুটা আছে তো?'

'আছে, স্যার, গেট থেকে বেরোলেই একটা রসিদ নিয়ে দিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ বাদে জেলগেটে তুমুল হট্টগোল। সিপাই এসে জানাল—'জগা পাগলা গরু নিতে চাইছে না।'

'সে কি?'—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—'কেন?'

ও বলছে, 'এটা আমার মঙ্গলী নয়।'

"দু মিনিটের মধ্যে জগা পাগলা ফিরে এল। হাতজোড় করে রোদনভরা কণ্ঠে বলল—'ও গরু আমি নেবো না। আমার মঙ্গলীকে দিতে বলুন, হুজুর।' সবাই তাকে বোঝাল। আমি বললাম—'তোমারই তো লাভ। বক্‌নার বদলে দুধলো গাই ও বাছুর পেয়ে যাচ্ছ। দুধ খাবে, বিক্রী করে দু পয়সা হবে।'

জগার সেই এক কথা।

'চাই না হুজুর। অধম্মো করতে পারব না। আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন। পরের জিনিস নিতে বলবেন না।'

"সবাই মিলে বোঝাল, জমাদার রাম-অওতার সিং হনুমানজীর কিরিয়া খেয়ে বললে, 'এই সেই বক্‌না। ছোট ছিল এখন বড় হয়েছে, গাই হয়েছে।'

"জগা রুখে উঠল,—'আমার বক্‌না আমি চিনি না! আমাকে দেখলে ছুটে কাছে আসত। আর ঐ ধেড়ে গরুটা একবার চোখ তুলে দেখল না।' বলতে বলতে জগার চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল।

পাগলের সঙ্গে বক্ বক্ করতে গেলে জেল-সুপারের চলে না। সে সময় কই? জগাকে যেতে বললাম। সে যাবে না, তার এক কথা—'আমার মঙ্‌লীকে ফিরিয়ে দিন।' দুজন জোয়ান সিপাই তাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিল। জেল-গেটের বাইরে নিয়ে আর-এক দফা বোঝান হল। জগার এক কথা। শেষটায় জেলারবাবু কড়া ধমক দিতেই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। মঙ্‌লী-ধবলী তো নিলেই না, খোরাকীর পয়সাগুলো টান মেরে ছড়িয়ে ফেলল, বলে গেল—'চাই না তোমাদের পয়সা।'

'অথ জগা-পাগ্‌লা কাহিনী সমাপ্ত'—এই বলে আড্ডা ভেঙে উঠে পড়লাম।

এর পর পট পরিবর্তন হয়েছে। জরাসন্ধ বহরমপুর থেকে এসেছেন কলকাতায়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রথম ভারতীয় Non-I. M. S. সুপারিনটেণ্ডেন্ট হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। চাকুরী জীবনের শেষ ধাপ। এর পরই অবসর গ্রহণ। চাকুরী-জীবনের অবসান যত ঘনিয়ে এল, ততই সাহিত্য-জীবনেব দিগন্ত প্রসারিত হল। কারাবক্ষক পরিণত হলেন মানবজীবনের রূপকারে। এই পরিবর্তনের ধাপগুলি লক্ষ্য করেছি। সেই তিরিশের যুগে উপেনদা'র বিচিত্রা-যুগের লেখক আজ ঔপন্যাসিকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই আবির্ভাব মোটেই আকস্মিক নয়। এর পিছনে আছে সযত্ন সাধনা।

বেকার রোডের বিস্তৃত ভবন ও সুন্দর উদ্যান এই সময় তাঁর আবাসস্থল ছিল। স্থান-নৈকট্যের জন্যে তাঁর সঙ্গে আড্ডাও খুব জমে এই সময়। কত মনোরম সন্ধ্যায় সুন্দর সেই বাগানে বেতের চেয়ারে বসে মুখোমুখি গল্প করেছি। সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হয়েছে। সারাদিনের কাজের শেষে বড়সাহেবের খোলস ছেড়ে লেখক বেরিয়ে এসেছেন। সাহিত্যজীবনের কত সংগুপ্ত অধ্যায়ের কথা জরাসন্ধ বলেছেন। তাঁর সাহিত্য-জীবনের গুরু শরৎচন্দ্র। শরৎসাহিত্য

আজো তাঁর কাছে প্রেরণা হয়ে আছে। অবহেলিত মানবতার প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদ ও বিচিত্র মানবজীবনের অভিজ্ঞতা জরাসন্ধকে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত করেছে। এ'কথা তিনি বারবার বলেছেন। শরৎচন্দ্রকে আজো তিনি গুরু বলে মানেন, আর এজন্য তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন।

এই উদ্যান-আড্ডায় শরৎচন্দ্রের কাহিনী জরাসন্ধের মুখে শুনেছি। ১৯২৩-২৪ সালে জরাসন্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন, ইডেন হিন্দু হোস্টেলে বাস করেছেন। তাঁর সে সময়কার বন্ধুরা আজ সমাজে কৃতবিদ্য। ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্ল দাসগুপ্ত, শ্রীবিনয় দাসগুপ্ত প্রমুখ কৃতী ছাত্রদের তিনি সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু হোস্টেলে তাঁর ঘরে শরৎসাহিত্যের চর্চা হত। তিনি পাঠক, তাঁর বন্ধুরা শ্রোতা। এইভাবেই তাঁরা বসুমতী সাহিত্য মন্দির-প্রকাশিত শরৎ-গ্রন্থাবলী পড়ে শেষ করেছেন।

সেই প্রথম যৌবনের সুখস্মৃতি পর্যালোচনায় জরাসন্ধের ক্লান্তি নেই। সেই নানা রঙের দিনগুলির কথা মনে পড়লে আজো তিনি আনমনা হয়ে যান। সেই অপাপবিদ্ধ প্রথম যৌবনের নির্মল আনন্দের কথা আজো তাঁকে উন্মনা করে তোলে।

বেকার রোডের শ্যামল 'লনে' বসে তাঁর মুখে শরৎপ্রসঙ্গ শুনেছি। এবার সেকথাই বলি।

জরাসন্ধ শুরু করেন, 'আমাদের প্রথম যৌবনে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কৌতূহলের আর অন্ত ছিল না। তাঁর বই পড়ে পাঠক মুগ্ধ অথচ তাঁকে দেখা যায় না প্রকাশ্যে। তাঁর ভবঘুরে জীবন ও বর্মা-প্রবাস নিয়ে গুজবের অন্ত ছিল না। সে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। ছাত্রের পরীক্ষাপাঠ্যের তলায় দেখা গেছে 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস'। 'ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ যেথায় আছে কাজে' তার বালিশের তলায় চাপা থাকত যে-সব নিষিদ্ধ পুস্তক—'কাজল-আঁকা, সিঁদূর মাখা, চুলের গন্ধ ভরা'—তাদের নাম 'পল্লীসমাজ',

'বিরাজ বৌ' কিংবা 'বিন্দুর ছেলে'। গ্রামের বারোয়ারী তলায় মুদীর দোকানে যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ হয়ে থাকে, তার কুলুঙ্গির ভিতর থেকে কোনো দিন বেরিয়ে পড়ে 'বড়দিদি', 'পণ্ডিত মশাই' বা 'শ্রীকান্ত'। কিন্তু তখনকার বাংলাদেশে কেউ জানত না কে এই শরৎ চাটুজ্জে। অপরিচয়ের কুয়াশায় ঢাকা ছিলেন শরৎচন্দ্র। সবাই জানত তিনি ভবঘুরে। আজ বিহার, কাল কাশী, পরশু বর্মা। কেউ বা বলত উনি সাংঘাতিক টেররিষ্ট, রিভলভার সঙ্গে ঘোরেন। তাঁকে নিয়ে প্রচুর গুজব।'

কথক একটু থামলেন। এই অবসরে বলি,—'শরৎচন্দ্রই আপনাদের হীরো ছিলেন ?'

প্রত্যয়দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর এলো,—'হ্যাঁ, তিনিই আমাদের হীরো ছিলেন। তারপর শোনো। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের কাহিনী বলি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি-অনার্সের ছাত্র। থাকি হিন্দু হোস্টেলে। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি বা রবীন্দ্র-পরিষদ জন্মলাভ করেনি। ছিল 'বাংলা সাহিত্য সভা।' সবাই মিলে আমাকে করে দিলে তার সম্পাদক। সম্পাদক হয়ে একটা কিছু কৃতিত্ব না দেখালে বার্ষিক রিপোর্টে লিখব কী ? কলেজ পত্রিকা ছাপাবার মতো কী-ই বা থাকে ? আমরা তখন হোস্টেলে ছুটির দিনে সবাই মিলে শরৎ-গ্রন্থাবলী পড়ি। ঠিক হল, শরৎচন্দ্রকে এবার কলেজে সাহিত্যসভায় আনতেই হবে।

'সিদ্ধান্ত তো হোল, কিন্তু তা কাজে পরিণত হবে কী করে ? বন্ধু প্রফুল্ল দাসগুপ্তকে নিয়ে দিন কয়েক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আপিসে হাঁটাহাঁটি করে শরৎচন্দ্রের ঠিকানা যোগাড় করে ফেললাম। বাজে-শিবপুরের এক অখ্যাত গলিতে উনি তখন বাস করছেন।'

'আমি আর প্রফুল্ল একদিন বিকেলে হাওড়ার ভাসমান পুল পেরিয়ে চলে গেলাম বাজে-শিবপুর। তারপর বহু অনুসন্ধানে সেই

আকাঙ্ক্ষিত গলি খুঁজে পেলাম। একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি। কড়া নাড়ার উপায় নেই। কড়া আছে, কিন্তু তা পেরেক দিয়ে আটকানো। রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ডাক। ক্রুদ্ধ গর্জন। ভাবলাম, এতো সেই ভেলি! এখন উপায়? অনেক কষ্টে ভেলিকে এড়িয়ে ঢোকা গেল। ছোট্ট একটি উঠোন। ডান দিকে উঁচু রোয়াকের কোলে কয়েকটি পাতাবাহারের টব। সামনে একখানা মাঝারি আকারের ঘর। তারই সংকীর্ণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে একটি ভদ্রলোক গড়গড়া টানছেন। খালি গা। একখানা শাড়ি লুঙির মত করে পরা। পৈতেটা মালার আকারে গলায় ঝোলানো। কাঁচাপাকা পাতলা চুল নেমে এসেছে কাঁধের উপর। ছবি দেখা ছিল, চিনলাম।'

একটু হেসে যোগ করি—'যাক্ শেষ পর্যন্ত ভেলি পেরিয়ে দেবদর্শন হল!'

কথকও হেসেই উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ। দেবদর্শন হল। কিন্তু দেবতা নির্বিকার। আমরা দুজনে সিঁড়ির উপর উঠে নমস্কার জানালাম। প্রতিনমস্কার পেলাম না। খাড়া হয়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখ দুটি তুলে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

—'প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে।'

—'কী প্রয়োজন?'

এরকম কাঠখোট্টা প্রশ্ন শুনে আমাদের মনের মধ্যে যত কবিত্বময় ভূমিকা রচিত হয়েছিল, তা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এসে পড়েছি, এখন আর পেছনো যায় না। তাই উত্তর দিলাম সোজাসুজি,—'আমাদের কলেজে সাহিত্যসভার বার্ষিক উৎসব। আপনাকে সভাপতি হতে হবে।'

'না, না, ওসব সভা-টভায় আমি যাই না। এই সেদিন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে ডাকতে এসেছিল, আমি যাইনি।'

বাংলাদেশের সেরা কলেজের ছাত্রের অভিমানে লাগল। একটু

কড়া করেই অথচ সবিনয় বললাম,—'আজ্ঞে, আমরা কোনো স্কুল থেকে আসিনি, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আসছি।'

উত্তর হল,—'ঐ একই হল। ওটা ছোটো স্কুল, তোমাদের না হয় বড় স্কুল, কিন্তু আমি গিয়ে কী করবো? বাংলাদেশে আমার তো কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। তাছাড়া বক্তৃতা করতেও পারি না। তার চেয়ে এক কাজ করো, জলধরদাকে নিয়ে যাও। সাহিত্যিকও বটে, রায়বাহাদুরও বটে।'

বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সরকারী কলেজ হলেও রায়বাহাদুরের সম্বন্ধে আমাদের কোনো দুর্বলতা নেই, সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখে সভাপতি নির্বাচনও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কাছে এসেছি শুধু তাঁরই জন্যে। শুনে শরৎচন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমরা কি আমার বই-টই পড়?'

আমার সঙ্গী প্রফুল্ল একটু উষ্মার সঙ্গে জবাব দিলেন—'সন্দেহ থাকলে আপনার যে কোনো বই নিয়ে আসুন। যেখান থেকে খুশি জিজ্ঞেস করুন, মুখস্থ বলে দেবো।'

শরৎচন্দ্র গম্ভীরমুখে বললেন,—'আমি মনে কবতাম, তোমরা মানে লেখাপড়াজানা ছেলেরা বাংলা পড় না, আধুনিক বাংলা তো নয়ই। কন্টিনেণ্টাল লিটারেচার না কী একটা ব্যাপার প্রায়ই শুনতে পাই আজকাল। শিক্ষিতমহলে ওটা ছাড় নাকি আর কিছুই চলে না।'

তখন 'কল্লোল' বেরিয়েছে। ঐ সময়টা জানোই ত বাংলাদেশে কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের মৌসুমী ঋতু। তখন রলঁ্যা, ফ্রাঁস, চেখভ, ইবসেন, হামসুন, জোহান বোয়ার তরুণ বাংলা তথা মননশীলতাগর্বী সমাজে খুব চালু হয়েছে। ওয়েলস্, গলসওঅর্দি, রবীন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তে আর আমল পাচ্ছেন না। শরৎচন্দ্র সেই খোঁচাটাই দিলেন। শরৎচন্দ্রকে আমরা বোঝাতে চাইলাম—'আপনি ঠিক খবর রাখেন না। তরুণ সমাজের হৃদয়-অভ্যন্তরে আপনার অবিচল প্রতিষ্ঠা।'

আশ্চর্য এই, শরৎচন্দ্র বাধা দিলেন না। ধৈর্যভরে আমাদের কথা শুনলেন। শুনে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আত্মগতভাবে বললেন,—'আমি ত এসব কথা জানতাম না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে আবার বললেন,—'তোমাদের মত ছেলেরা আমাদের কাছে বড় একটা আসে না। যাঁরা আসেন তাঁরা প্রবীণ ব্যক্তি। কিছু কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও আসেন। তাঁরা বলেন, তুমি এই করেছ, এই করেছ, এই করনি, এই করনি। কেউ কেউ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয় না দেখিয়ে তুমি পাপকে এমনভাবে জাহির করেছ যেন ওটা একটা বাহাদুরি। নোংরা জিনিস আমদানি করেছ সাহিত্যের দরবারে। এই সেদিন চিৎপুরের একটা পাড়ায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ডেকে নিয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়বে না। এক মুরুব্বী ব্যক্তি বক্তৃতা করলেন, আজকাল ভাল বই আর বেরোচ্ছে না। যা কিছু লেখা হচ্ছে, সব দুর্নীতি-বোঝাই। সেইগুলো পড়ে ছেলেমেয়েরা গোল্লায় গেল। স্পষ্টভাবে নামটা উল্লেখ না করলেও বেশ বুঝিয়ে দিলেন, এই সর্বনাশের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী আমি। তা মন্দ নয়। ডেকে নিয়ে গিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া। অতিশয় ভদ্রলোক। আমি উঠে বললাম, উনি যা বলেছেন একেবারে খাঁটি কথা। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি, লাইব্রেরী না করে এই টাকায় একটা সংকীর্তনের দল করা হোক। নীতি প্রচার হবে।'

শুনে আমরা হাসলাম। শরৎচন্দ্র কিন্তু হাসলেন না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। এতক্ষণ ওঁর খেয়াল হল। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—'ওহো, তোমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছ!'

বারান্দায় অতিরিক্ত চেয়ার একটাই ছিল। ডাকাডাকি করে আর একটা চেয়ার আনালেন। এতক্ষণে আমরা দুই বন্ধু বসতে পেলাম।

শরৎচন্দ্র এবারে নরম সুরে বললেন—'যাবো তো, কিন্তু কী বলতে হবে আমাকে?'

—'আপনার যা খুশি।'

— বেশী ভিড় হবে না তো?'

—'ভিড় কোথায়? শুধু আমরাই তো।'

—'আচ্ছা দাঁড়াও, তারিখটা টুকে রাখি।'

দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডারের গায়ে আমাদের নির্দিষ্ট দিনটি চিহ্নিত কবে বাখলেন। গোড়ায় রুক্ষ ভাবে কথা বললেও শেষে তাঁর স্নেহ-কোমল কণ্ঠস্বরে অনুভব করেছিলাম তিনি আমাদের গ্রহণ কবেছেন। নিজেব সাহিত্যসাধনার কথা, বর্মাব কথা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা অনেক বলেছিলেন। তাবপব নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল গড়গড়ার মৃদুশব্দ। আসন্ন সন্ধ্যাব দীর্ঘ ছায়াব দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র মনেব কপাট খুলে দিয়েছিলেন।

আমার বন্ধু প্রফুল্ল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—'লোকে বলে 'শ্রীকান্ত' আপনাব আত্মকাহিনী। সত্যি নাকি?'

শবৎচন্দ্র একটু হাসলেন। সবল কৌতূহলের উত্তরে সস্নেহ প্রশ্রয়েব হাসি। বললেন, —'লোকে বলে নাকি এই কথা?'

- 'অনেকে বলে'

—'তোমরা কী বল?'

—'আমরা কেমন কবে জানবো? তাই তো জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।'

এবাব গাম্ভীর্যেব ছায়া পড়ল তাঁব মুখেব উপব। বললেন,—'দেখো, উপন্যাস লিখতে বসে হুবহু নিজেব কথা কেউ বলে না। তেমনি নিজেকে বাদ দিয়েও কোনো সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়।'

প্রফুল্ল আব থামে না। এবাব সে মোক্ষম প্রশ্ন করল,—'আর একটা কথা। আপনাব লেখাব অনেকটা জুড়ে আছে পতিতা। এর কোনো বিশেষ কারণ আছে কি?' প্রশ্নটা শুনে শরৎচন্দ্র আন্‌মনা হয়ে গেলেন। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নেমে এলো হাতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উদাস হয়ে উঠল। সহসা যেন কত দূরে চলে গেলেন,

অস্তমগ্ন সূর্যের শেষ রশ্মি তখন যাই-যাই করছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন,—'বিশেষ কারণ কী আছে জানি না। শুধু বলতে পারি, আমি এদের অনেকের কথাই জানি। নিজের চোখে দেখেছি। এমন জিনিস ওদের মধ্যে আছে, যা বড় বড় সমাজেও দুর্লভ। ত্যাগ বল, ধর্ম বল, দয়া মায়া প্রেম—মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝি, ওদের মধ্যেও অভাব নেই। কোনো ভদ্রতার মোহ কিংবা নীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সে কথা যদি অস্বীকার করি, তার চেয়ে বড় অধর্ম আর হতে পারে না।'

একটু থেমে করুণার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "তা ছাড়া কোনো মানুষ নিছক কালো, তার মধ্যে কোনো redeeming feature নেই, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। ও আমি পারি না।

কোনো দিকে না চেয়ে স্বগতোক্তির মত থেমে থেমে এই কথা-গুলো ঐ সন্ধ্যায় বলে গিয়েছিলেন। আমি আজো তা ভুলতে পারি না।

জরাসন্ধ তাঁর কাহিনী শেষ করলেন।

আর-একদিন আড্ডায় পুনরায় শরৎচন্দ্রের কথা উঠল। কথা প্রসঙ্গে জরাসন্ধ বললেন, 'শরৎচন্দ্র খুব পরিশ্রমী পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর টেবিলে যে-সব বই দেখেছি, তার দুটির নাম মনে আছে—Keynes-এর লেখা A Tract on Monetary Reform আর Westermack-এর লেখা History of Marriage।' নানা কথার পর জানতে চাইলাম—শরৎচন্দ্র আপনাদের সভায় কি শেষ পর্যন্ত এসেছিলেন?'

জরাসন্ধ উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ, এসেছিলেন। তবে অনেক মেহনৎ করতে হয়েছিল। যথাসময়ের অনেক পরে তিনি এসেছিলেন। বেকার ল্যাবরেটারির ফিজিক্স থিয়েটারে—আজকাল যেখানে তোমরা লেক্‌চার দাও—সেইখানে সভা। ন স্থানং তিলধারণং। উৎকণ্ঠায়

ব্যাকুল শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্যের পরীক্ষান্তে শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছলেন। ফিজিক্স ল্যাবরেটরির ভিতর দিয়ে তাঁকে যখন টেবিলের পাশে দাঁড় করালাম, শরৎচন্দ্র আমার শার্টের আস্তিনে একটা টান দিয়ে আতঙ্কে বলে উঠলেন,—'এ করেছ কী? এত লোক!'

আমি তো আর সেখানে নেই। চট করে সরে গেলাম। শরৎচন্দ্র সেদিন খুব চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর কণ্ঠস্বর—তদ্‌গত ভঙ্গীতে জরাসন্ধ বলে চলেন—শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল কথাটি তুলে ধরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—"আপনাবা বোধ হয় জানেন 'পল্লীসমাজ' নামে আমাব একটা বই আছে। তার নায়িকা বিধবা হয়েও তার বাল্যসঙ্গীকে ভালবাসল। একদল মুরুব্বী বলেন,—উহুঁ ওসব চলবে না। হিন্দু ধর্মে এবকম অপকর্ম হতেই পারে না। তাদের কে বোঝাবে যে 'হতে পারে না' বললেই তো আর মানুষের মনের দোর-জানালা বন্ধ হয়ে যায় না। It is in the blood. আপনি আমি আর্তনাদ করে কী করবো? আবার আরেক দল মুরুব্বী বলেন,—তোমার লেখার মধ্যে কোনো আদর্শ নেই। বমা বমেশকে ভালবাসল। বেশ তো ওদেব বে'থা দিয়ে দা'ও। চুকে যাক। তা না করে ছেলে-টাকে জেল খাটিয়ে আনলে, মেয়েটাকে পা˙ লে কাশী। সব যে ছন্নছাড়া হয়ে গেল। Constructive তো কিছু হল না।

"আমি বলি, ও সব কোনো বিদ্যাসাগব করবেন। বিধবা বিয়ে দেওয়া তাঁদের কাজ, আমাব নয়। আমি সমাজ-সংস্কার করতে বসিনি। আমি দেখলাম, দুটি মহৎ প্রাণ এলো। মিলতে চাইল কিন্তু পারল না। আমাদের সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণ দৃষ্টির মধ্যে তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। সেই ব্যথতার বেদনা যদি আপনার মনকে স্পর্শ করে তাহলেই হ'ল। তার বেশী আর আমায় কিছু চাইবার নেই।"

জরাসন্ধ থামলেন। বোধ করি সেদিনের ভাষণদাতা মানব-দরদী শরৎচন্দ্রকে মনশ্চক্ষুতে দেখছিলেন। এই ছবিটি বর্তমান রচনার পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আড্ডাধারী জরাসন্ধের কাছ থেকে বিদায় নিলেম।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কথাকোবিদ্ অচিন্ত্যকুমার একদিন এক ঘরোয়া আড্ডায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "ঠাকুর বলতেন, আমরা নর, আর ও হল নরেন্দ্র। সেইরকম—আমরা যদি প্রেম, ও তাহ'লে প্রেমেন্দ্র।"

ঘরোয়া আড্ডায় বন্ধুবা রসিকতাটা উপভোগ করলেন, এমন কি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিও হাসিতে যোগ দিলেন। তবু আমার মনে হল, অচিন্ত্যকুমার হয়ত সত্য কথাই বলছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র। নামটি যেমন শ্রুতিসুখকর, ব্যক্তিটি তেমনি প্রীতিপ্রদ। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দেখে ভালো না বেসে পারা যায় না। তাঁর সহস্র আলস্য, কুড়েমি, বেহিসেবীপনা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি রাগ করা যায় না। তাঁকে দিয়ে যাঁরা কোনো কর্মোদ্ধারের আশা করেছেন, তাঁরাই এই সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন, অথচ তাঁব প্রতি কেউ বিরক্ত হতে পারেন নি।

স্নিগ্ধ প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব, পুরু কাচেব আড়ালে উজ্জ্বল দুটি চোখ, সুরেলা কণ্ঠস্বর, সদালাপী, মধুবহাসি এই হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেনদাকে কখনো অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখিনি। ঘবে সিল্কের লুঙ্গি। জালি গেঞ্জি পবিহিত, একমাথা এলোমেলো কোঁকড়া চুল, হাতে নস্যির টিপ্। বাইবে পাটভাঙ্গা ধুতি ও আদ্দিব পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্প, হাতে ছোট্ট পোর্টফোলিও।

আদি গঙ্গার ধারে তাঁব বাড়ি। দোতলাব ঘরের পশ্চিম আর দক্ষিণ খোলা, অজস্র আলো বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে। বইয়ের পর বই, বেশির ভাগই ইংরেজি বই—ঘরের দেওয়ালে দ্বিতীয় দেওয়াল রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। জান্‌লার বাইরে লতার ঝরোখা-দেওয়া বারান্দা, দক্ষিণে পাখির কলস্বব, উত্তরে সুরকির কলের কর্কশ

আওয়াজ। পশ্চিমে তাকালে চোখে পড়ে শীর্ণকায়া আদি গঙ্গা, তারপরই আলিপুর জেলের উঁচু লাল পাঁচিল, টাওয়ারে সেন্ট্রি পায়চারি করছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের মাঝে আসুন। চিন্তাগম্ভীর, স্মিতহাস্যস্নিগ্ধ, প্রসন্নানন প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ঘরের অধিকারী। না, তিনি জীবনের প্রতি গভীর প্রেমের অধিকারী।

প্রেমেনদার সঙ্গে নিরিবিলিতে আড্ডা দেওয়া কঠিন। টেলিফোনের ডাক আর দর্শনার্থীর ডাকে নিভৃতি ভেঙে যায়। তারি মধ্যে বসে কথা বলি।

"দেখো, এই হল পপ্যুলারিটিব অভিশাপ। বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে প্রেমেনদা এগিয়ে যান, ফোন ধরেন। দু-পাঁচ মিনিট কথা বলে ফিরে আসেন পরিত্যক্ত আসনে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলেন। আই. এস-সি. পরীক্ষা দিয়ে চড়কডাঙা এম. ই. ইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ড্রিল-টিচারের চাকরি পেলাম। মাইনে উনিশ টাকা। হ্যাঁ, উনিশ টাকাই। ছেলেদের অঙ্ক করাতাম আর ড্রিল শেখাতাম। হেসো না, সত্যি কথা। সেই সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনি কুড়ি টাকা।" 'ভবিষ্যতের ভার' গল্প পড়েছ তো? তাতেই, এই সময়কার কথা লিখেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেকার কলকাতা শহরে এতেই মানুষ সংসার করত, হাসিকান্না-মেশানো জীবনকে গুণ টেনে নিয়ে যেত। অবশ্য, এই চাকরি বেশি দিন করি নি। সেটাই রক্ষে। তারপর চলে গেলাম কাশী। সেখানে—"

বাধা দিয়ে বলি, "কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আপনার কবে দেখা হয়েছিল? কাশী যাবার আগে, না, পরে?"

প্রেমেনদা একটু হেসে বলেন, "হ্যাঁ, কাশী যাবার আগেই দেখা হয়েছিল, দেখো, ভাই, সাল তারিখ আমার মনে থাকে না। তবে যতদূর স্মরণ হয় ১৯১৯ সালেই বাজে-শিবপুরের বাড়িতে শরৎচন্দ্রকে দেখতে গিয়েছিলাম। শানুদার সঙ্গে গিয়েছিলাম।

শান্নুদাকে চেনো না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পূর্ণ সিনেমার ম্যানেজার। আমি তখন কিশোর। কী কথাবার্তা হয়েছিল মনে নেই, তবে শরৎচন্দ্রের চেহারা ও পরিবেশটা খুব স্পষ্ট মনে পড়ে। একটি সাধারণ গলির মধ্যে পুরনো একটি একতলা বাড়ি। শরৎচন্দ্রের ওপর আমাদের মতো কৌতূহলী ভক্তদের উপদ্রব তখন বোধ হয় ভালোভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে, তবু অজ্ঞাত অখ্যাত একটি যুবক ও একটি কিশোরকে তিনি বিরক্ত না হয়েই ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে শান্নুদার কি দু'চারটি কথা হয়েছিল তা স্পষ্ট মনে নেই, কারণ মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি তখন সেই আশ্চর্য মানুষ ও তাঁর পরিবেশটিই লক্ষ্য করতে তন্ময়। শরৎচন্দ্রের সেই প্রথমদেখা চেহারা ও তাঁর ঘরের ছবি এখনো মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে আছে। স্বল্প-পরিসর একটি ঘর, টেবিল চেয়ারের কোনো বালাই নেই। মেঝেতে শতরঞ্চি বা কম্বলের ওপরেই গেরুয়া চাদর পাতা। মেঝের ওপরেই নিচু একটি ছোট সেল্‌ফে অনেকগুলি বই। তার অধিকাংশই বিজ্ঞানের। সবচেয়ে যা আশ্চর্য করেছিল তা হ'ল দেওয়ালে টাঙানো একটি বড় বন্দুক ও তার পাশে একটি রুদ্রাক্ষের মালা।

"গেরুয়া চাদরের পাশে বিজ্ঞানের বই এবং বন্দুকের পাশে রুদ্রাক্ষের মালা দেখে সেদিন শুধু আশ্চর্য হয়েছিলাম। তখন বুঝিনি এই আপাত অসঙ্গতির মধ্যেই শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যসাধনার সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে!"

প্রেমেনদা থামলেন। বোধহয় চুয়াল্লিশ বছরের ওপারে ফেলে-আসা ছবির কথা স্মরণ করলেন। তারপর এক টিপ্‌ নস্যি নিয়ে অগুরু সেন্টে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাথা মুছে নিলেন। সেন্টের গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে গেল।

ঘরে আর কেউ নেই। পশ্চিম ও দক্ষিণের খোলা জানালা

দিয়ে আলোর অবারিত প্রবেশ। পাখি ডাকছে। উত্তরদিকে সুরকি কলের শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। মৃদু স্বরে বলি, "দাদা, আপনার প্রথম গল্প লেখার গল্প করবেন বলেছিলেন।"

চমক ভেঙে জেগে ওঠেন প্রেমেনদা। বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-কথাই আজ তোমায় বলি।" উঠে দাঁড়ালেন, ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। আর বলতে লাগলেন।—

"ছেলেবেলায় দু'একটা কবিতা লিখেছিলাম। সে কিছু না। সে-সময় গল্প লেখবার বা সাহিত্যিক হবার কোন সাধ আমার ছিল না। সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগ ছিল, ভাল মন্দ সব রকম বইয়েব পোকা ছিলাম। তার বেশি কিছু না। আর সাউথ সাবার্বান্ ইস্কুলে পড়ার সময় লিখেছি কবিতা। খাতার পর খাতা ভর্তি করেছি। আমার তিন বন্ধু ছিল আমার গুণগ্রাহী ও নির্মম সমালোচক। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এমানুল হক্। প্রথম দুজন আর এ জগতে নেই। তৃতীয় জনের বহুদিন খোঁজ পাই না। তাদের নির্মম সমালোচনার চোটে আমার অনেক কবিতা ধরাশায়ী হয়েছে। যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, কি বলছিলাম! প্রথম গল্প। আমি তখন ঢাকা৻। ডাক্তাবী পড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকায় ইনটারমিডিয়েট সায়ান্স পড়ি। ১৯২২-২৩-২৪ সালের কথা।

"এমনি সময় একবার গ্রীষ্মেব ছুটি কলকাতায় কাটাতে উঠলাম এসে একটি মেসে। কলকাতার এক নগণ্য গলিতে বহুকালের পুরনো এক বিশাল ভাঙা বাড়ি। মেসের সীটরেন্ট ও মিল-চার্জ তখনকার দিনেও অত্যন্ত কম ছিল। সেই মেসের একটি দোতলার ঘরে জায়গা পেলাম। আমার ঘরের জানালা খুললেই চোখে পড়ে এক অন্ধকার, পরিত্যক্ত, পচা ডোবা ও জঙ্গলময় বাগান। দিনের বেলাতেই সেখানে ঘন গাছের ঝোপে অন্ধকার।

"কি করে কেন যে আমার প্রথম গল্প লিখেছিলাম তা বেশ ভালোই মনে আছে। দিনটা শনিবার। মেসের অধিকাংশ

বাসিন্দাই কেরানী। কাছাকাছি মফস্বলে তাঁদের বাড়ি। ছদিন কলকাতায় চাকরী করে বেশীর ভাগই শনিবার বিকালের ট্রেণে বাড়ি যান। শনিবার রাতে মেস তাই একবারে ফাঁকা।

"আমার যিনি রুম মেট ছিলেন, তিনিও সেদিন বাড়ি গেছেন। ঘরে আমি একা। মেসে দু একজন যাঁরা ছিলেন তাঁরাও অনেক আগেই খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছেন। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। মেসের চিরন্তন ভাঙা তক্তপোষে বসে হ্যারিকেনের আলোয় একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়ছিলাম। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এল। জানালা দিয়ে ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে দেখে, জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি একটা চার-ভাঁজ-করা পোষ্টকার্ড জানালার পাল্লা খোলা রাখবার জন্য কোণে আটকান আছে। জানালাটা বন্ধ করে নেহাৎ অলস কৌতূহল ভরেই ভাঁজ-করা পোষ্টকার্ডটা খুলে একবার দেখলাম।"

হেসে বলি, "দাদা, পরের চিঠি—"

প্রেমেনদা হেসেই বললেন, "পরের চিঠি পড়া যে উচিত নয়, বিবেকের সে নিষেধে বিশেষ যে কান দিই নি, তা স্বীকার করছি। পুরনো মাস দুয়েক আগেকাব চিঠি। গোপনীয় বা অসাধারণ কোন কিছুই তাব মধ্যে নেই। সাধাবণ গরীব কেরানীর বাড়ির খবরাখবর, তারই সঙ্গেই দুয়েকটা ফাইফরমাস। গ্রামে এক পিসিমা তাঁর কলকাতাবাসী ভাইপোকে লিখেছেন, ফর্দ পাঠিয়েছেন। চিঠির একটি লাইন কিন্তু আমার মনে কেমন দাগ দিয়ে গেল। পিসিমা লিখেছেন,—'বউমার আজো জ্বর এসেছে। দেখতে দেখতে দুমাস হয়ে গেল। ঘুষঘুষে জ্বর ত কিছুতেই যাচ্ছে না। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো কোন ডাক্তারকে একবার দেখালে হয় না?'

ঠিকানার লেখাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কে জানে এটা কার চিঠি। সে কি আমারই রুমমেট' না, আর কেউ? বউটির কি হল? ঘুষঘুষে জ্বর সেরেছে কি? বাইরে ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়ছে।

লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত আমার মেসের ঘর থেকে একটি নিরুত্তর সকরুণ প্রশ্ন আমার মনকে অনেক দূরে আর একটি দবিদ্র গ্রাম্য সংসারে তখন নিয়ে গেছে। একটি রোগকাতর শয্যালগ্ন বধূকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। উদ্বিগ্ন স্বামী তাকে বৃথা সান্ত্বনা দিচ্ছে। মেয়েটির সে কথায় কান নাই। শনিবারের পর রবিবার, তারপরেই সোমবার সকলের বিদায়ের ক্ষণটি ভেবেই সে কাতর। তারপর কি সুদীর্ঘ ব্যবধান। যদি আর দেখা না হয়!

"ভাই, তোমাকে কি বলব, সেই পুরনো পোষ্টকার্ড, তাই নিয়ে এইসব ভেবে বেদনা বোধ হল। অনেক প্রেমের গল্পই এ পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে হিলিওট্রোপ রঙের শাড়ি পরে বডো-ডেনড্রন গাছের তলায় যাবা অনুরাগের রঙীন খেলা খেলে, তাদের কথা যেন আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। মনে হল রাঙা মাটির পাহাড়ী দেশে বিবাগী হয়ে ইউক্যালিপ্টাস গাছেব তলায় বসে যারা বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের বেদনা নেহাৎ জোলো।"

কথক একটু থামলেন। এই অবকাশে বলি, "মণীন্দ্রলাল বসু মশায়ের রমলা, সহযাত্রিণী, জীবনায়ন উপন্যাসে বোধ হয় এই ধবনেব অনুরাগের রঙীন খেলার বিবরণ আছে।"

প্রেমেনদা বললেন, "যাক্, সে কথা। সেই নির্জন ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় পুরনো পোষ্টকার্ডে তাকিয়ে মনে হল, কিছু যাদের নেই,—যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোনো গল্প কি হতে পারে না? হোক্ বা না হোক, তাদের কথাই লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লিখলাম শুধু এক কেরানীর গল্প। সেই গল্পের নামই 'শুধু কেরাণী।'

"সেই রাত্রেই গল্পটি লিখে ফেলে পরের দিন ঝোঁকের মাথায় একেবারে 'প্রবাসী' কাগজে পাঠিয়ে দিলাম। মনে মনে জানতাম ব্যাপারটা ওখানেই খতম্। 'প্রবাসী'র মত অভিজাত পত্রিকায়

অজ্ঞাত লেখকের ওরকম গল্প স্থান পাবে, এ তখন আশাই করতে পারি নি। বিশেষ কোনো আশা বা উদ্বেগ না নিয়েই তাই ঢাকায় ফিরে গেলাম। প্রায় ছ'মাস বাদে একদিন কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকা খুলে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। গল্পটি বেরিয়েছে।"

এবার বলি, "দাদা, 'শুধু কেরাণী' গল্পের জন্যই প্রবাসীর ঐ সংখ্যাটার কথা আমাদের মনে আছে। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় গল্পটি বেরিয়েছিল।"

প্রেমেনদা হেসে বলেন, "তোমাদেব ওসব সন-তারিখ মনে থাকে, আমার থাকে না। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় ফিরে এসে বিস্ময় ও আনন্দ আরো বেড়ে গেল। শুধু কেবাণী গল্পটি নিয়ে 'কল্লোল' পত্রিকায় বেশ দীর্ঘ একটি সুখ্যাতিমূলক সমালোচনা বেবিয়েছে। সেই বাত্রে আব-একটি গল্প লিখেছিলাম, 'গোপন-চারিণী'। 'প্রবাসী'র পরের সংখ্যাতেই সেটি বেরিয়েছিল। 'কল্লোলে' তাবও প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমর্থন পেয়েছিলাম ও কল্লোলের দলের সংস্পর্শে এসেছিলাম বলেই আমাব সমস্ত দ্বিধা কেটে গেল, সাহিত্যজীবন সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হলাম। সেদিন থেকে জানলাম, সাহিত্যই হবে আমার প্রধান আশ্রয়।"

অন্য একদিনের আড্ডা। বললাম, "দাদা, কাশীর গল্প বলুন।" প্রেমেনদা হেসে বলেন, "কাশীর গল্প কি বলব? কাশীতেই আমার জন্ম। সেখানে পুণ্যতোয়া গঙ্গা। আব এখানে এই শীর্ণকায়া আদিগঙ্গা। গঙ্গা আমার জীবনকে ব্যাপ্ত কবে আছে। জানো, আমার একটা প্ল্যান ছিল, গঙ্গার যাত্রাপথের দুধারে ভারতের জীবন ও সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল ও ঘটেছে, তার একটি পূর্ণ বিবরণ সংকলন করব। ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকথা ও ধর্মান্বেষণের ব্যাপক পরিচয় থাকবে এই গ্রন্থে। সে বই আর লেখা হ'ল কই?"

"যে-কথা বলছিলাম কাশীতে কেবল শৈশব নয়, যৌবনের একটা অংশও সেখানে কাটিয়েছি। কাশীতে সেবার ১৯২৪-২৫ সালে যখন যাই, তখন জীবনে একটা অনিশ্চয়তার পর্ব চলছিল। ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়েছি। অন্যকিছু ধরি নি। গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখে চলেছি। এমন সময় কাশীতে আমার এক বন্ধু বললেন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অধ্যাপক বিনয় সেন কাশীতে বেড়াতে এসেছেন, তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন। কাশীর ঘাটেই আলাপ হল বিনয় সেনের সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'যদি চাকরি করতে ইচ্ছে থাকে ত কলকাতায় ফিরে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করবেন।' বলেছি, আচ্ছা। কলকাতায় ফিরেছি, কিন্তু আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আবার বিনয় সেনের আবির্ভাব। ধরে নিয়ে গেলেন বিশ্বকোষ লেনে দীনেশচন্দ্রের কাছে। দীনেশচন্দ্র বললেন, অ্যাপ্লিকেশন কই? বললাম, তা ত আনি নি। দীনেশচন্দ্র নিজেই একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে রেখেছিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে না দেখেই সই করে দিলাম। বললেন, হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করলাম, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বললেন, 'ও, আপনিই প্রেমেন্দ্র মিত্র। তা বেশ ত।' ব্যস্ হয়ে গেল চাকরি। রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের রিসার্চ অ্যাসিস্টাণ্ট, বেতন ষাট টাকা। কাজ, দীনেশচন্দ্রের বাড়িতে বসে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন। তখন দীনেশচন্দ্র বেহালায় তাঁর নিজের বাড়ীতে চলে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় আট বছর কাজ করেছি। বুঝলে, ভাই, এমন সহৃদয় ভদ্র আর দেখি নি। দীনেশচন্দ্রকে আমরা প্রাপ্য সম্মান দিই নি। বরাবর "আপনি" বলে সম্বোধন করতেন। কী পাণ্ডিত্য, কী ভদ্রতা। পুরোনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমার মনে তিনিই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।

"আর-এক নমস্য চরিত্র হলেন উপেনদা। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়, বিপ্লবী, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র লেখক। এমন বই বাংলায় আর লেখা হয়নি। টালায় তাঁর বাড়ীতে আমায় বিনয় সেনই নিয়ে গেলেন। প্রথম দর্শনেই তুই বলে সম্বোধন করলেন—"চাকরি করবি?" "বাংলার কথা" তখনকার জনপ্রিয় দৈনিক পত্র। উপেনদা সম্পাদক। তখন ১৯২৭ সাল। বললাম, "আমি তো কোনদিন সংবাদপত্রে কাজ করিনি, তা ছাড়া পলিটিক্সের জটিল ব্যাপার জানি না।" উপেনদা হেসে বললেন, "তাতেই তো সুবিধা রে! লেগে যা।" তা লেগে গেলাম। সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতাম আর রয়টারের সংবাদ অনুবাদ করতাম। আমার সহ-কর্মী ছিলেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারানাথ রায়। ঝপাঝপ্ দু-কলম সংবাদ অনুবাদ করে একটা সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেই চলে আসতাম। আমি এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ কবতাম যে বাকি সহকর্মীরা সন্দেহ করত, আমি কিছুই করি না। তখন একদিন গেলি-প্রুফ স্কেল দিয়ে মাপা হল। দেখা গেল, আমার কাজ কারুর চেয়ে কম নয়। ওরা তো জানত না, ইস্কুলে আমার নাম ছিল 'ট্রানস্লেটিং মেশিন'। মাস্টারমশায় ইংরেজি অনুচ্ছেদ বলে যেতেন, আমরা লিখে লিখে বঙ্গানুবাদ করে দিতাম। একবার মাস্টারমশায় নেপোলিয়ান সম্পর্কে একটা ইংরেজী অনুচ্ছেদ মুখে বলছেন, আমি ইংরেজিটা না লিখে সঙ্গে সঙ্গে বাংলা করে যাচ্ছি। তাঁর বলা শেষ হল। আমার অনুবাদ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গেই খাতা দাখিল করলাম। সেই থেকে ইস্কুলে আমার নাম হয়ে গেল, 'ট্রানস্লেটিং মেসিন'।"

গল্প শুনে বলি, "আপনি এককালে বিজ্ঞাপন লিখতেন, না?"—"হ্যাঁ, লিখেছি। বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞাপন লিখেছি। ওষুধের বিজ্ঞাপন কতটা সাহিত্য রস-জাবিত হতে পারে তার প্রমাণ ঐ সব বিজ্ঞাপনে আছে। জানো, জীবনে একবারই চাকৃরি চেয়েছি।

আর সব চাকুরি না চাইতে পেয়েছি। আমাদের বন্ধু শিবরাম চক্রবর্তী একবার 'নবশক্তি' পত্রিকায় ঠাট্টা করে একটা বিজ্ঞাপন ছাপাল—'জনৈক লেখক লেখার কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন।' 'নবশক্তি' ও বেঙ্গল ইমিউনিটির মালিক ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ বিজ্ঞাপন পড়ে শিবরামকে ডেকে পাঠান। সে বলে, ওটা নিজের জন্য নয়, প্রেমেনের জন্য দিয়েছে। তারপর আমাকে জানাল, ক্যাপ্টেন দত্ত ডেকেছেন। সেটা ১৯৩১ সাল। গেলাম। রাশভারী লোক ক্যাপ্টেন দত্ত। বললেন,"আপনি ত ল্যাখক মানুষ। আপ্‌নে কি কাম করবেন? আপনারে আমি কি কাম দিমু?" বললাম—'আপনাদের বিজ্ঞাপন যা বেরোয়, তা ট্র্যাস্‌। ওতে চলবে না। আমি ওটাই লিখব।" ক্যাপ্টেন দত্ত খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ওগুলি চল্‌ব না? ট্র্যাশ্‌? ঠিক আছে, আপনে ল্যাখেন। তা, আপনারে কত দিমু?" গম্ভীর হয়ে বলি, "একশ টাকা!" "অ্যাঁ, আপনে কন্‌ কি? এত টাকা মায়না কোথ্‌থিকা দিমু? পারুম না।" গম্ভীর হয়ে বলি, 'হ্যাঁ, দিতেই হবে।" "না না, পারুম না। আচ্ছা পঁচাত্তর দিমু। আর কইয়েন না।" সেই প্রথম ও শেষ চাকুরি আদায়।

গল্প শুনে হাসি। প্রেমেনদাও হাসেন। তারপর বলেন, "জানো, ক্যাপ্টেন দত্তের মত হৃদয়বান পুরুষ বিশেষ দেখা যায় না। ওঁর কথা বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়।"

অন্য-একদিনের আড্ডা। প্রেমেনদার পুরনো নোতুন কবিতার কথা হচ্ছিল। উপলক্ষ্য তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ। কথা-প্রসঙ্গে প্রেমেনদা "নিরুক্ত" পত্রিকার গল্প কবলেন। তখন ১৯৪০ সাল। কলকাতায় তখন যুদ্ধ এসে পৌঁছয় নি, মন্বন্তরের বুক-ভাঙা আর্তনাদে শহর ভরে যায়নি। 'পূর্বাশা'য় লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। একটি বিশুদ্ধ কবিতাপত্রের অভাব বোধ করছিলেন। কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে বার করলেন 'নিরুক্ত'। রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে

চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি তিনি আমাদের দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শান্তিনিকেতন থেকে—

"তোমরা কয়েকজনে মিলে নিরুক্ত প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছ, এ সংবাদে সুখী হয়েছি। কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি, ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশ-প্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যে এই মারীর সংক্রামকতা এখনকার বাতাস অধিকার করেছে। সুতরাং বাহির থেকে কোনো প্রতিকার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। রুগ্ন সাহিত্য হয় আপনিই আপনার সাংঘাতিকতাকে নিঃশেষিত করে দেবে, নয়ত বিদেশী সাহিত্যের পালে যখন হাওয়া দেবে উল্টো দিকে তখন দেখাদেখি এরাও সেই দিকে পালের মুখ ফেবাবে। তোমাদের রচনায় তোমরা সাহিত্যের সুস্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকো। সেই দৃষ্টান্তের ফল যতটুকু হয় ততটুকুই ভালো। মানুষ ফ্যাশনের তাড়ায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যঙ্গ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই। সেই দিনের জন্য অপেক্ষা কর এবং অবিচলিত চিত্তে আপন কর্তব্য করতে নিযুক্ত থাক। আমার সময় ও শক্তি নিঃস্ব হয়ে এসেছে, অতএব আমি এখন ছুটি নিতে চাই। ইতি ২৮।৮।৪০ আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

চিঠিটা পড়ে বেদনায় মন অভিভূত হয়। মহাকবির যাবার সময় হয়ে গেছে, দূরে মহাকাশের মন্দিরে বিদায়-ঘণ্টা বাজছে। কবিতার সাধনায় বিকৃতি লক্ষ্য করে কবি বেদনার্ত কণ্ঠে যে-কথা বলেছেন, তা কি আজো আমরা অস্বীকার করতে পারি?

প্রেমেনদা বললেন, "জানো ভাই, কবিতা লিখছি অনেকদিন ধরে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে যে আশ্বাস ও ভরসা ব্যক্ত হয়েছে, কাব্যসাধনায় তাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে জেনেছি। আর এ-কথাও জেনেছি, গভীরে অনুসন্ধানই কবির সাধনা।"

মনে পড়ল 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থে প্রেমেনদার কণ্ঠস্বর—

মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয়. থাক পরম পাওয়ার এষণা।
চারা পোঁতাটাই নয়ক আসল সত্য,
আছে কিনা দেখ হৃদয়ের আনুগত্য।

এই পরম পাওয়ার এষণা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ত অস্থির অনুসন্ধানী করে রেখেছে। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-রহস্যের প্রতি প্রেমেনদার আকর্ষণ যেমন সত্য, মানবমনের জটিলতা-সন্ধানে তাঁর আগ্রহ তেমন স্বভাবজ। তাঁর গল্পে এই জটিলতার রহস্যভেদী আলো এসে পড়েছে। অনেক সময় মনে হয়েছে, তাঁর লেখায় বহু ঘটনার অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রত্যক্ষও যেন অস্পষ্ট। নিকটও যেন সুদূর, সবই যেন থেকে থেকে সূক্ষ্ম পর্দার মত কেঁপে ওঠে। 'শুধু কেরানী'র গল্পের নির্মমতা ও নিরাসক্তি সঞ্চারিত হয়েছে 'সাগর সঙ্গমে', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'হয়ত', 'তেলেনপোতা আবিষ্কার', 'স্টোভ' গল্পে।

প্রেমেনদার সঙ্গে কত দিন কত গল্প করেছি। তবু মনে হয়েছে, এই মিতবাক সুভদ্র মধুরহাসী ব্যক্তির অন্তরালে রয়েছে এক নির্মোহ কঠিন নিরাসক্ত শিল্পি-ব্যক্তিত্ব—যাকে আমরা হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারি না, অথচ যিনি অসামান্য নৈপুণ্যে তুলির টানে খানিক আলো খানিক ছায়ার আনন্দ-বেদনা মিশিয়ে আমাদের নগণ্য জীবনকে অসামান্য করে তোলেন। বোধ করি, নিঃসঙ্গ শিল্পী আমাদের নিয়ে তাঁর শিল্পলোক গড়ে তোলেন, তারপর অবহেলায় আমাদের পরিত্যাগ করে যান।

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

এক রবিবারের সকাল। বেহালায় একটি বাগানঘেরা বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডার অধিপতি আমাদের ভবানীদা। পুরো নাম ভবানীশংকব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এ নামে কেউ তাঁকে চিনবে না। তিনি ভবানী মুখোপাধ্যায ওরফে ভবানীদা।

শীতেব সকাল। সামনে ধূমায়িত চায়েব পেয়ালা। দেয়াল-ভর্তি বইয়ের র‍্যাক। ঘরের সর্বত্র বই-পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। তারই মাঝে আমরা তিন চার জন। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে একটি সস্মিত আনন, মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে দুটি স্বপ্নভরা চোখ, রুপোলি পিছন-ঠেলা চুল। কণ্ঠে প্রসন্নতার আমেজ ইনিই ভবানীদা। এদিক-ওদিকেব বাড়ি থেকে রেডিওর চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

বললাম, 'ভবানীদা, আপনাদের বেহালায় কবে থেকে রেডিওর এত দাপট শুরু হলো?'

"তবে শোন ভায়া, সে কাহিনী। তোম' বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না।" হাসিমাখা কণ্ঠে ভবানীদা বলতে থাকেন। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আমরা শুনতে থাকি।

"আমার বাল্যবন্ধু বীরেনকে নিশ্চয়ই চেনো? সে এখন বীবেন রায়, এম. পি.। বেহালার বিখ্যাত বায় পরিবারের ছেলে। সে কী আজকের কথা ভাই! প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সে বেহালা আর নেই। আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। আমি আর বীরেন দুজনে মিলে ঠিক করলাম, একটা লাইব্রেরি খুলতে হবে। মাসিক এক আনা মাত্র চাঁদা। ইস্কুলের হেড

পণ্ডিত ছিলেন অক্ষয় পণ্ডিত। তিনি ইস্কুলেরই একটি ঘরে থাক্‌তেন। তিনি অনুমতি দিলেন বইগুলি তাঁর ঘরে খাটের নীচে রাখা চলবে, আর ইস্কুলের পর বই নেওয়া চলবে। মহোৎসাহে আমরা লাইব্রেরি শুরু করলাম। নাম হল, 'স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরি'। বই ও সদস্য-সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু টাকার অভাবে বেশি বই কিনতে পারি না।

"এই সময় বীরেন আমাকে জানালো তাদের বাড়ি বিনিতারের গান শোনার একটা আয়োজন হয়েছে। অবাক কাণ্ড! উৎকণ্ঠা আগ্রহের আর শেষ নেই। সেই আশ্চর্য শুভ দিনটি অবশেষে এলো। সন্ধ্যার পর হবে বিনিতারের গান। বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাব পর বীরেনের বাড়ি গেলাম। টেম্পল্ চেম্বার্সে Longovica Company কলকাতায় বেতার ব্যবসা জমাবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরাই এই নমুনা প্রদর্শনীর অয়োজন করেছিলেন।

'আমরা সেই সন্ধ্যায় বেতার প্রমুখাৎ সর্বপ্রথম বিনিতারের গান শুনলাম :

'কবে তুমি আসবে বলে
রইবো না বসে,
শুকনো ফুলের পাপড়িগুলি
পড়তেছে খসে।
আর সময় নাইরে—' "

বলি, "এ তো হলো একদিনের ব্যাপার। তাতে আপনাদের কি ?" ভবানীদা বলেন, "ভায়া, অধীর হয়ো না। আগে সবটা শোনই—

"ঐ গান শুনে বীরেনের মাথায় তৎক্ষণাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল। বীরেনটা চিরকালই খুব ওস্তাদ। এই ত আমাদের স্টুডেণ্টস লাইব্রেরির জন্য অর্থ সংগ্রহের সুযোগ। সে তখনি সেই কোম্পানির সায়েবদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল—আগামী

রবিবার আমাদের স্কুলে এমনই আর-একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হবে। সায়েব ত রাজী।

'ব্যস্। আমাদের আর পায় কে? সাদা টুকরো কাগজে লাইব্রেরির ছাপমারা এক আনা করে টিকিট। হু হু করে অনেক টিকিট বিক্রী হয়ে গেল। বিকেল পাঁচটায় প্রদর্শনী। সায়েবরা যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির। পাঁচটা, ছ'টা, সাড়ে ছ'টা—কোম্পানির বেতারযন্ত্র আর বাজে না—কত কসরৎ কত কেরামতি—যন্ত্র একটু টু শব্দ করল না—টিকিটের দাম ফেরৎ দিলাম। সায়েব অতিশয় লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বেহালার ছেলেদের বিনিতারের গান শোনা হল না। আর এখন পথের ধারে বিড়ির দোকানেও দেখি লোকে ক্রিকেট খেলার রীলে শুনছে। একেই বলে, কালস্য কুটিলা গতি। তাই ত বলি, ভায়া, চারদিকে রেডিওর জ়ংঝম্প ঠেকাবার আর উপায় নেই।"

সমবেত আড্ডাবাজদের মৃদু হাস্য।

ভবানীদা আবার শুরু করেন।—

"সেই কাণ্ডের পর বীরেনের মাথায় আর এক বুদ্ধি খেলল। তার মাথায় নানান বুদ্ধি গিজগিজ করত। সে বুদ্ধি দিল, একটা কাগজ বের করতে হবে। ব্যস্, যাহাঁ কল্পনা তাহাঁ কর্ম। বাংলাদেশের বালক-পরিচালিত সর্বপ্রথম সচিত্র কিশোরপাঠ্য মাসিকপত্র 'বিশ্ববার্তা' দুজনে বার করলাম। তারিখটা মনে আছে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রথম সংখ্যা বেরুল। কার্যালয়—সেই স্টুডেন্টস লাইব্রেরি, সাকিন বেহালা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা, প্রতি সংখ্যা ছ'পয়সা মাত্র। সম্পাদক দুজন, বীরেন আর আমি। বীরেনের নামের পাশে আমার দীর্ঘ নামটা বেমানান দেখে নামের মধ্য থেকে 'শংকর' ছেঁটে দিলাম। এটাও বীরেনের পরামর্শ। ছাপা হল—সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। সেই থেকে শুধু 'ভবানী' হয়ে চালিয়ে যাচ্ছি।

"আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বেহালার মত অঞ্চল থেকে মুদ্রিত মাসিক পত্র প্রকাশ করা যে কী কঠিন কর্ম, তা বোঝানো সুকঠিন। তোমরা সে কষ্ট বুঝবে না ভায়া। সেদিন বেহালায় শুধু ট্রাম ছিল, কলকাতার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। বেহালা ছিল শান্ত পল্লীগ্রাম, একবেলা বাজার বসত। গাড়ী ঘোড়ার ভীড় ছিল না, চীৎকার ছিল না। এক হাঁটু ধুলোবোঝাই ডায়মণ্ড হারবার রোডে কুড়ি হাত অন্তর জ্বল্‌তো কেরোসিনের মিটমিটে বাতি। তবু আমরা প্রচণ্ড দুঃসাহসে বেহালার সঙ্গে সেদিন 'কলিকাতা' জুড়ে দিয়েছিলাম। তার তিরিশ বছর বাদে বেহালা 'কলকাতা-৩৪' হয়ে শহরত্ব লাভ করেছে।"

ভবানীদা থামলেন। বোধ হয় ফেলে-আসা কৈশোরকে—তার দুঃসাহস ও বেহিসেবীপনাকে নোতুন করে অনুভব করতে চাইলেন। আড্ডার পরিবেশ একটু ভারী হয়ে উঠল। হেসে বলি, "দাদা, ও কথা ভেবে আর লাভ কি? 'সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি', ও আর ফিরে আসে না।"

"তা কি আর বুঝি না, তবু সেদিনের কথা ভেবে—"

ভবানীদা কথা শেষ করার আগেই যোগ করে দিই—"আজ আবার নতুন করে সাহিত্যপত্র প্রকাশের নেশায় মেতে উঠেছেন। তাই 'বৈতানিক' বার করেছেন।" এবার সকলেই হাসলেন। ভবানীদাও প্রাণ খুলে হাসলেন। আড্ডায় ছিলেন ভবানীদার এক বাল্যবন্ধু—আমাদের হৃষিবাবু। তিনি এবার মুখ খুললেন, "ভবানী, 'বিশ্ববার্তা' বার করেই ত লায়েক হয়ে গেলি। সেই গল্প বল্‌।"

"ঠিক বলেছিস্‌। তবে শোনো তোমরা। 'বিশ্ববার্তা' প্রকাশ উপলক্ষে তিনজন স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। একজন হলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। একদিন সাহস করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আমরা হাজির হয়েছিলাম।

নীচে ছিলেন অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তখন ডাবাহুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি দোতলায় যাবার পথটা দেখিয়ে দিলেন। সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ বসে ছবি আঁকছিলেন, অদূরে আলখাল্লা পরিহিত গগনেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। আমরা প্রণাম করতেই বললেন, 'কোথা থেকে এসেছিস্?' এতো ঘনিষ্ঠ সম্বোধন! যেন কতকালের চেনা! কী মিষ্টি ব্যবহার, কী চমৎকার কথা, কী সুন্দর হাসি! জীবনে কোনোদিন ভুলবো না। বেহালায় বাড়ি শুনে বললেন, 'দীনেশবাবু! দীনেশবাবু! তাঁর কাছে যা!' আমরা প্রার্থনা জানালাম লেখার। তার উত্তরে যে অপূর্ব চিঠিখানি আমাকে লিখেছিলেন, তা আমার চিরকালের সম্পদ।

'সেই চিঠির দুয়েকটি বাক্য আজো আমার কণ্ঠস্থ। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

'বিশ্ববার্তা নামে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের বয়স যে কচি! খেলাঘরে ধরে রাখতেই হবে তোমাদের—না হলে ঘরের কোণের খেলাঘর যে খালি হবে আমাদের, সেইজন্যেই বিশ্বের বার্তার জন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে দেখে আমি ভয় পেয়েছি। বিশ্ববার্তা যে কী ব্যাপার তা তো তোমাদের জানা নেই—ঘরের খেলা চুকলো তবে বিশ্বের বার্তা পৌঁছলো কাছে।' "

ভবানীদা থামলেন। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। নীরবতা ভেঙ্গে একজন বললেন, 'সুন্দর!'

ভবানীদা মনে হ'ল স্বপ্নঘোরে রয়েছেন। হঠাৎ চমক ভেঙে উঠে বললেন, 'দ্বিতীয় যে লেখকের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয়, তিনিই অবনীন্দ্র-কথিত দীনেশবাবু অর্থাৎ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর।'

ভবানীদা আবার শুরু করলেন, "দীনেশবাবু শেষ জীবনে বেহালার অধিবাসী ছিলেন। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগের কর্তা। রায় সাহেব। তখনও রায়বাহাদুর হননি। তিনিও একটি চমৎকার চিঠি দিলেন, 'বিশ্ববার্তায়' ছাপা হলো।" চিঠির সূচনাটি কৌতুকে ভরা—'বেহালা হইতে 'বিশ্ববার্তা' প্রকাশিত হইল। সম্পাদক দুইজন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান ভবানী আমাকে প্রবন্ধের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের বয়স ১৫।১৬, বরঞ্চ দেখায় আরও কম। এখনও গোঁফের রেখাটি পর্যন্ত দেখা যায় না। এহেন সম্পাদক মহাশয় যখন আদেশ করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্য তাহা পালন করিতে হইবে, কি জানি অন্যথা করিলে যদি কাঁদিয়া ফেলেন কিংবা মুখ ভ্যাংচাইয়া ভয় দেখান। এই ছোট ছোট সম্পাদক ও লেখকগণ যে একটি মাসিক পত্র বাহির করিবার খেয়াল মাথায় আনিয়াছেন, তাহা খুব ভাল কথা।'

শুনে আমরা সশব্দে হেসে উঠি। ভবানীদাও যোগ দেন। তারপর বলেন, "দীনেশবাবু ঐ চিঠিতে আমাদের বেহালার প্রাচীন ইতিহাস—ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, সূর্য, ধ্যানী বুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন মূর্তিগুলির ইতিহাস উদ্ধারের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

"দীনেশবাবু পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ দীনেশচন্দ্র অনেক বড়ো। জসীমউদ্দীন ও প্রেমেনকে (মিত্র) মাসিক ষাট টাকা বৃত্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ ওয়ার্কার' রূপে রেখেছিলেন অনেক দিন। আর তখনকার ষাট টাকার দাম একালের তিন শ' টাকারও বেশী। তাঁর পরিণত বয়সে আমি তাঁর নিত্য সঙ্গী হয়েছিলাম। আমাকে তাঁর 'শ্যামল ও কজ্জল' ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি 'বন্ধুবরেষু' লিখে উপহার দিয়েছিলেন। আজো তা সযত্নে রেখেছি।

"একবার দীনেশচন্দ্র আমাকে খবর পাঠালেন—রবিবার প্রবন্ধ পাবে। আমি তখন একটি সাপ্তাহিক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যাশিত রবিবারের প্রভাতে মাস্টারমশাই যতীন্দ্রনাথ সেন

(বর্তমানে আনন্দবাজারের সহ-সম্পাদক) এসে জানালেন, লেখা পাওয়া যাবে না, কর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শুনে হতাশ হলাম।

"বেলা সাড়ে দশটায় তিনি আবার এলেন, কর্তা ডাকছেন। গেলাম। দীনেশচন্দ্র খাটের উপর বসেই লেখাপড়া করতেন। হাতের কাছে থাকত তাল মিছরির শিশি, নিজে খেতেন, নাতিদের দিতেন। আর থাকত একটি বংশদণ্ডের মত মোটা কলম। সেই মোটা কলম দিয়ে মুক্তোর মত অক্ষরে তিনি লিখতেন।

"তখনও ডাক্তার ঘরে বসে। দীনেশচন্দ্র আমাকে দেখেই বললেন—'শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে, তা, এখন ভালো আছি, তবে হাতে লিখতে পারছি না, আমি বলে যাই, তুমি লিখে নাও।'

"তথাস্তু। দীনেশচন্দ্র বলে গেলেন একটানা আড়াই ঘণ্টা।

"যখন শেষ হল, দেখি প্রাচীন বাংলার এক ইতিহাস-চিত্র সেই প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। বিষয়—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। আশ্চর্য হলাম, প্রবন্ধেব যাবতীয় তথ্যাদি, উদ্ধৃতি, সাল-তারিখ, সবই তাঁব নখদর্পণে, সবই মুখস্থ।

"নিবভিমান নিরহঙ্কার দীনেশচন্দ্রেব কথা মনে হলে এক পরমাত্মীয়কে হারিয়েছি বলে মনে হয়।"

এবার মুখ খুললাম, "তৃতীয় সাহিত্যসাধক কে?"

ভবানীদার উত্তব—"বলছি, ভায়া, তিনি হলেন সর্বজনপ্রিয় জলধরদা, বায়বাহাত্বর জলধর সেন। সাহিত্যিক মাত্রেরই এক নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়। সর্বজনীন জলধরদার মতো হৃদয়বান সম্পাদক বিশেষ দেখা যায় না। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় পত্রযোগে দিল্লী থেকে। একটি প্রবন্ধ পাঠাই—'দিল্লীর রূপায়তন' —সেখানকার চিত্র-প্রদর্শনীর একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তৎক্ষণাৎ সেটি 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকায় প্রকাশিত হল। আর-একটি প্রবন্ধ পাঠালাম বাংলা ছন্দ সম্পর্কে—নাম 'ছন্দ হিল্লোল'। এই প্রবন্ধটি একেবারে গোড়ার দিকে ছাপা হল। জোড়া পোস্টকার্ডে লিখেছিলাম, তাই বৃদ্ধ জবাব দিয়ে লিখেছিলেন—'এই রকম জোড়া পোস্টকার্ড দিলে আড়ি হয়ে যাবে।'

শুনে আমরা হেসে উঠি। ভবানীদা মৃদু হেসে গল্পের খেই ধরে বলতে থাকেন, "কল্লোলের আরো তিনজন তরুণ লেখকের সঙ্গে আমিও 'ভারতবর্ষে' গল্প লিখে স্বীকৃতি পেলাম। প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব ও আমার গল্প একই সংখ্যায় ছাপা হয়। আমার গল্পের নাম 'মহাসাগরের নামহীনকূলে'। জলধরদা কল্লোলের তরুণদের প্রথমশ্রেণীর অভিজাত সাহিত্যপত্রে সেই প্রথম আশ্রয় দিলেন। বুঝলে ভায়া, অমন মানুষ আর হয় না।"

ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর ছেড়ে তখন একটার ঘরের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম, আড্ডা ভেঙে গেল। ভবানীদা বললেন, 'ভায়া, আবার আসছ তো? পরের রবিবার আছি।'

অন্য এক. রবিবারের প্রভাতী আড্ডা। চা-চুরুটের ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে ভবানীদার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভবানীদা সম্প্রতি 'বৈতানিক' বার করেছেন। তারই কথা হচ্ছিল। কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক দূর যায়। মুখে মুখে নানা প্রসঙ্গ ওঠে, মিলিয়ে যায়, নবতর বিষয় উঠে পড়ে। সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা হচ্ছিল। সম্পাদক কি কেবল লেখা আদায় করে ছাপেন? না কি, তাঁর লেখক সৃষ্টিরও দায়িত্ব আছে? সে-ক্ষেত্রে বিপদ আছে না?

গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিই, "দাদা, লেখক সৃষ্টির ঝামেলা বিস্তর। লেখা সংশোধন করতে যাবেন না। তাহলেই বিপদ। লেখা

চেয়েছেন কি ছাপতে হবে। অন্যথায় আপনার সুনাম যাবে, ভবিষ্যৎ যাবে।”

ভবানীদা হেসে বললেন, “আর ভায়া, ভবিষ্যৎ! পঞ্চাশোর্ধে এখন সুনাম বা কলঙ্ক, কোনোটার জন্যই পরোয়া করি না। লেখককে কী ভাবে গড়ে পিটে নিতে হয়, তার নমুনা শোনো। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নাম নিশ্চয়ই জানো। খুব রাশভারী, অথচ মজলিশী। তিনি যখন ‘পঞ্চপুষ্প’ মাসিক পত্রের সম্পাদক, তখন তাঁকে দুটি সনেট পাঠাই, প্রেমের কবিতা। একটি পোস্টকার্ডে সম্পাদক আমাকে দেখা করার নির্দেশ দিলেন। একটা কথা বলে রাখি, আমার তখন বয়স উনিশ।

“আমি ধর্মতলা স্ট্রীটে ‘পঞ্চপুষ্প’-এর আপিসে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে এক দুপুরে দেখা করতে গেলাম। সম্পাদকের ঘরে ঢুকে সেই পোস্টকার্ডখানি বার করতেই তিনি বোমার মত ফেটে পড়লেন ঃ এই বয়সে প্রেমের কবিতা! প্রেমের কি জানিস?

“প্রথম পরিচয়ে এই সম্ভাষণ! এর জন্যই কি পোস্টকার্ড? এরই জন্যে কষ্ট করে এতদূর এসেছি! ম্লান মুখে চলে আসার উপক্রম করতেই বিদ্যাভূষণ মশাই বললেন—‘আবার রাগ আছে! বসো। আমার একটি প্রবন্ধ চাই। যাও, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ে শুনে একটা প্রবন্ধ নিয়ে এসো, আমি ছাপাবো।’

কি বিষয়ে প্রবন্ধ, ক’পাতা সে প্রশ্ন করার সাহস নেই। তবু নীরব দেখে তিনি আবার বললেন,—‘সামনের শুক্রবার প্রবন্ধ নিয়ে আসবে, নইলে আমি তোমার বাড়ি গিয়ে হাজির হব। কেমন পাকা কথা ত।’

“তখন প্রতিদিনই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাতায়াত ছিল। অনেক ভেবেচিন্তে জাপানী নো- াটকের উপর একটা প্রবন্ধ খাড়া করে নিয়ে গেলাম। এইবার বিদ্যাভূষণ মশাই মহাখুশি। কিন্তু

বললেন, 'উঁ হুঁ। ফুটনোট কই? তোমার এই রিসার্চ লোকে নেবে কেন? ফুটনোট না থাকলে কি চলে?'

"আবার ফুটনোট বসিয়ে হাজির হলাম। প্রবন্ধটি সসম্মানে ছাপা হ'ল, সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য সংযুক্ত হ'ল। আর কিছু দক্ষিণাও (যা সেকালে দুর্লভ ছিল) জুটল। তাই ত বলি, ভায়া, সম্পাদকের দায়িত্ব বড়ো দুরূহ।"

আর একদিনের আড্ডা। বললাম 'দাদা, বেহালার পুরনো দিনের কথা আরো কিছু বলুন।'

'তবে শোনো, 'ভবানীদা শুরু করলেন, অসহযোগ আন্দোলনের গল্প। আমার বয়স তখন এগারো। শুনলাম, স্বরাজ আসছে। ডিসেম্বর মাসটা পেরুলেই স্বরাজ পাওয়া যাবে। সেটা যে কী বস্তু তা তখনো জানি না। এখনকার ছেলেদের চেয়ে আমাদের জ্ঞান কম ছিল, তাই যা শুনতাম তাই বিশ্বাস করতাম। স্বরাজ উপলক্ষে ইস্কুলে সেই প্রথম 'স্ট্রাইক' হ'ল। সে শব্দটার অর্থ তখন জানতাম না।

"সেই সময় ছোট্টগ্রাম বেহালায় অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ লাগল, শান্ত জীবন অশান্ত হয়ে উঠল। শুনলাম পল্লী সংস্কার হবে। স্থাপিত হ'ল কর্মীসঙ্ঘ। শুনলাম এই কর্মীসঙ্ঘের কর্তা রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই তিনি পল্লীসংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর 'ডায়মণ্ডভিউ' নামে একটি বাড়ি আছে, এরই পিছনে ছিল কামার বাড়ি, প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ঐ কামার বাড়িতে বসল কর্মীসঙ্ঘের কার্যালয়। নগেনবাবু ঐ বাড়িতেই থাকতেন।

"একদিন ইস্কুলে হাফ-ছুটি হয়ে গেল। কর্মীসঙ্ঘে নবান্ন উৎসব। আমরা গেলাম সেই উৎসবে। আজো মনে পড়ে, আচার্য বিজয়চন্দ্র

মজুমদার সেই উৎসবে পৌরোহিত্য করলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা গান গাইল—

'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালীমালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।'

এই গান শুনে আমাদের মন কোন সুদূরে ভেসে গেল।

"এই সূত্রে আলাপ হ'ল নীতুর সঙ্গে। নীতু নগেনবাবুর ছেলে, নন্দিতার ভাই, রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র। রবীন্দ্রনাথের বংশে একমাত্র পুরুষ বংশধর। এই নীতু আমাদের সমবয়সী। নীতু আমাদের আপন করে নিল। তার একটি ছবির অ্যালব্যাম ছিল, সযত্নে সেটি আমাদের দেখালো। কত গল্প বাবা-কাকা-জ্যেঠার। আর রবীন্দ্রনাথের কথাও হত। কিন্তু এখন বুঝি, যে-সব কথা জানার ছিল তা তখন জানা হয়নি। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত। সেই প্রাসাদের লম্বা বারান্দায় আমরা ক'টি কিশোর ছুটোছুটি করেছি, মীরা দেবী আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে হেসেছেন!

"এই সময় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সায়েব মাঝে মাঝে বেহালায় এসেছেন। বেহালার পথে পথে ঘুরেছেন সাধারণ মানুষের মতো, আমরাও সঙ্গ পেয়েছি।

"নীতুর কত বই ছিল! তাঁর বাবা নগেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত শিশুবার্ষিকী 'পার্বণী' তার কাছ থেকে নিয়ে পড়েছি। নীতুর তখন লেখার ঝোঁক ছিল, মাথায় কত আইডিয়া। কী ভাব হয়েছিল তার সঙ্গে! মাঝে নীতুর কয়েকদিন জ্বর হ'ল, রোগশয্যার পাশে বসে তার সঙ্গে কত গল্প করেছি। এই ত সেদিনের কথা! তারপর নীতুরা চলে গেল বেহালা থেকে, আমাদের কিশোর হৃদয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল। তারপর কয়েক বছর বাদে পেলাম সেই দারুণ দুঃখ-সংবাদ। যৌবনের প্রারম্ভেই জার্মানীতে নীতুর দেহাবসান ঘটে। নীতুর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে যে চিঠি

১৩

লিখেছিলেন, সেই চিঠি এই সেদিন পড়ছিলাম। দেবশিশুর মতো যে নীতু আমাদের সহচর ছিল, সে আজ কোথায় চলে গেল! এই সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই, দুঃখের মালায় সুখের ফুল গাঁথা আছে। 'কান্নাহাসির দোলা' উপন্যাসে বোধ হয় এই কথাটি আমি বলতে চেয়েছি।"

ভবানীদা থামলেন। স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন কথককে স্মৃতিবেদনার মাঝে রেখে এলাম।

অন্য আর এক রবিবারের আড্ডা। জানুয়ারীর সকাল। শীতটা পড়েছে। চা শেষ করে জমিয়ে বসেছি। ভবানীদা বলতে শুরু করলেন—

"ইংরাজী বছরের গোড়ার দিকেই একটা কাহিনী আমার মনে পড়ে আর হাসি পায়। একটি গরম কোটের জন্য কিভাবে জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছে এ তার কাহিনী।

"১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে বিপ্লবী বীর অমরদা (উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) আমাকে বললেন যে, কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে একটা মাস্টারি তিনি যোগাড় করেছেন আমার জন্য। বেকার অবস্থায় বসে আছি, তার ওপর উনিশ শো ত্রিশ। পুলিশের নেকনজরে দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় এসে তাড়া খাচ্ছি নানাভাবে, বয়স তখন উনিশ পার হয়ে কুড়ি। মাস্টারি চাকরিটা তেমন মনঃপূত হল না। অমরদা'র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন। তাঁকে বললাম, 'জে, এম, সেনগুপ্ত একটা নতুন দৈনিক বার করছেন, আমাকে ওখানে একটা কাজ দিন। আপনি ত' জানেন, এর আগে আমি Delhi Herald-এ সাব-এডিটারী করেছি। 'ফরোয়ার্ড', 'বাংলার কথা'র নিউদিল্লী করেসপণ্ডেন্ট হিসাবে কাজ করেছি।'

অমরদা হেসে বললেন—'তথাস্তু। একটা দরখাস্ত নিয়ে

কাল আমার অফিসে দেখা করিস্। আমি যতীনকে বলে দেব।'

"তিনি তখন ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে মেট্রোপলিটনের অফিসে বসতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই, আমার আবেদন পত্রটি তিনি স্বহস্তে পরিবর্তন করে নিজের টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ করিয়ে, সেই সঙ্গে 'মাই ডিয়ার যতীন' বলে সেনগুপ্তসাহেবকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন।

"চিঠিটা নিয়ে 'এডভান্স' অফিসে গেলাম, তখন হেয়ার স্ট্রীটে গারস্টিন প্লেসের গায়ে এডভান্স অফিস। যতীন্দ্রমোহন তখনও কিন্তু লাহোর কংগ্রেস সেরে কলকাতায় ফেরেন নি। চিঠি ও দরখাস্তখানা তাঁর এক কর্মচারীর কাছে রেখে চলে এলাম।

"কয়েকদিন পরে অমরদা নিজেই খোঁজ নিলেন। কোনো খবর নেই জেনে, এবার চিঠি দিলেন জে, সি, গুপ্ত সাহেবের নামে। আমি এবং আমার বন্ধু বীরেন রায় (বর্তমানে এম-পি), দুজনে গেলাম হেয়ার স্ট্রীটের অফিসে। তখন প্রায় সাতটা বেজে গেছে।

"জে, সি, গুপ্তসাহেব তখন বিজ্ঞাপনদাতাদেব নিয়ে একটা মিটিং করছেন, তিনি তার ওপর পেন্সিলে লিখলেন 'পি, কে, চক্রবর্তী টু ইণ্টারভিউ।'

"পি, কে, চক্রবর্তী ছিলেন একজন বাঙালী ক্রীশ্চান ও ব্যারিস্টার। য়ুনিভার্সিটির ল' কলেজের লেকচারারও ছিলেন। তাঁর খ্যাতি কিন্তু দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ডে'র সম্পাদক হিসাবে। শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীর আগে তিনি 'ফরোয়ার্ডে'র সম্পাদক ছিলেন। 'ফরোয়ার্ড' ছেড়ে 'এডভান্সে' যোগ দিয়েছেন।

"আমি ও বীরেন দুজনেই চক্রবর্তী সাহেবের টেবলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। স্লিপখানা দিতেই চা পানরত চক্রবর্তী সাহেব জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'সাট ডাউন'। তারপর অমরদার

পত্রটি পড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইংরাজীতেই প্রশ্ন করলেন আবেদনকারী কোন্ জন ?

"আমি ভয়ে ভয়ে আমার বক্তব্য পেশ করতে মিঃ চক্রবর্তী আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—'আই ক্যান নট গারান্টি ইউ এ জব, বাট্ সিন্স ইউ আর ফ্রম মিঃ চ্যাটার্জি, আর ইউ প্রিপেয়ার্ড টু সীট ফর এ টেস্ট ?" (চাকরি-টাকরি বিষয়ে কিছু কথা দিতে পারি না, মিঃ চ্যাটার্জি যখন পাঠিয়েছেন পরীক্ষায় বসতে রাজী আছ ?)

সম্মতি জ্ঞাপন করতে এইবার বেশ শুদ্ধ বাংলায় পাশের লোকটিকে বললেন--

ধীরেন, একটা পেন্সিল আর প্যাড দাও।

এই ধীরেনই উত্তরকালের বিখ্যাত ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, তখন 'এডভান্সে'র কমার্সিয়াল এডিটর।

"পেনসিল ও প্যাড আমার সামনে প্রসারিত হল। পাশে বন্ধু বীরেন রায় বসে, আর আমি সদ্য দিল্লী থেকে আগত (অর্থাৎ প্রায় পল্লীবালক), দুরু দুরু বক্ষে আসন্ন পরীক্ষার কথা চিন্তা করছি। হঠাৎ চায়ের কাপটা সশব্দে সরিয়ে মিঃ চক্রবর্তী বললেন— "রাইট সর্ট নোটস্ অন দি এ্যাটিটুড অব দি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস অন কংগ্রেস রেজলিউসন অব কম্প্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স।" সেই বছর (১৯২৯) লাহোরে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' খুব গালিগালাজ করছিল এই প্রস্তাব নিয়ে।

"আমি অনেকক্ষণ ধরে সেই জানুয়ারীর রাতে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে পেনসিল দিয়েই নোটস্ লিখতে লাগলাম। তখনও ফাউন্টেনপেন এত সুলভ হয়নি। প্রায় ন'টা নাগাৎ তাঁর হাতে আমার লেখাটি শেষ করে দিলাম।

"মিঃ চক্রবর্তীর এইবার অন্য মূর্তি। তিনি বল্লেন—ইউ আর নট পুওর। ইউ আর নট ডেলিকেট, হোয়াই হ্যাভ্ ইউ কাম্ ফর দিস জব্ ? (তুমি দরিদ্র নও, ক্ষীণজীবী নও, কেন এই কাজের জন্য এসেছ ?)

"সবিনয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করে অনুরোধ করলাম যে আমার লেখাটা পড়ে বিচার করুন।

"কে কার কথা শোনে, চক্রবর্তীসাহেব বলছেন—ইউ আর ওয়্যারিং সাচ্ এ্যান এক্সপেনসিভ কোট—(এমন দামী কোট পরেছ—ইত্যাদি)।

"বীরেন আমার জামায় টান দিয়ে ইঙ্গিত করল বাড়ী ফেরার। আমরা দুজনে ম্লান মুখে ফিরে এলাম। চাকরিটা তাহলে হ'ল না।

"আশ্চর্য কাণ্ড! পরদিন প্রভাতে দেখি আমার সেই লেখাটি—"A cat with nine tails" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে সেকেণ্ড এডিটোরিয়াল হিসাবে। অবশ্য মিঃ চক্রবর্তী নিজেই শিরোনামা দিয়েছেন।

"বীরেনই আমাকে 'এডভ্যান্স' এনে দেখাল, হয়ত ৮।৯ জানুয়ারী, ১৯... এর দৈনিক এডভ্যান্স। পরে আমার বন্ধু স্বর্গত প্রমোদকুমার সেন (বার্তা সম্পাদক, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড ও এলাহাবাদ সংস্করণ পত্রিকা) এই সংখ্যাটি আমাকে সংগ্রহ করে উপহার দিয়েছিলেন, তিনি এককালে 'এডভ্যান্সে' বার্তা বিভাগে ছিলেন, কিন্তু সেই পুরাতন সংবাদপত্রটি এখন আর নেই। আমরা আবার অমরদার কাছে গেলাম। তিনি সব শুনে হেসে বললেন—'প্রফুল্লবাবু অতি চমৎকার ইংরাজী লেখেন, কিন্তু বড় খামখেয়ালী লোক, হয়ত সেই সময় মেজাজটা ঠিক ছিল না, আচ্ছা যতীন লাহোর থেকে ফিরুক।'

"এরই ক'দিন পরে সরকারী চাকরির ইণ্টারভিউ-তে ডাক পড়ল, আর ১৪ই জানুয়ারী থেকে পুরোপুরি সরকারী কর্মী হিসাবে যোগ দিলাম। নিরাপত্তার দিক থেকে সরকারী চাকরি তখনকার-কালে অনেক আকর্ষণীয় ছিল, কারণ পুলিশের উৎপাতটা ক্রমে কমে এল।

"মাঝে মাঝে ভাবি, যদি দিল্লীর দরুণ গরম কোটটি গায়ে না থাকতো তাহলে কি সরকারী কর্মচারী না হয়ে সাংবাদিক

হতে পারতাম? কে জানে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় এস্‌প্লানেড গুমটিতে বসে থাকতেন এবং শেষপর্যন্ত নিখোঁজ হয়ে যান, নইলে তাঁকেই প্রশ্নটা করতাম!"

গল্প শেষ করে ভবানীদা থামলেন। আড্ডার সকলে এতক্ষণ মুখ বন্ধ করে শুনছিলেন। এখন হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কিছুদিন দেখা না হলেই খবর পাঠান। সকালের দিকে তাঁর বাড়িতে যাই। দোতলা থেকে নেমে আসেন। তাঁর হাসি-ভরা মুখে স্বাগত আমন্ত্রণ ফুটে ওঠে।

—'বসো, বসো।'

—'শুনলাম, আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, জরুরী দরকার। কি ব্যাপার?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, বসো, অনেক কথা আছে।'

এতক্ষণে বোঝা গেল, জরুরী দরকার ও অনেক কথা আসলে আড্ডা। নিছক বিশুদ্ধ আড্ডাব মৌতাত তাঁর কাছে প্রচুর পাওয়া যায়। তিনি হলেন বাক্‌কুশলী, সব্যসাচী-লেখক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। প্রাণশক্তিব অধিকারী। তাঁর সঙ্গ পেলে মনে হয় মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম।

দৈনিক সংবাদপত্রেব সহকারী-সম্পাদকরূপে মানব-চরিত্র দেখেছেন বিস্তর, অদম্য পাঠতৃষার ফলস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকার অর্জন কবেছেন। ত্বরিত পরিহাস, প্রবল কাণ্ডজ্ঞান, ক্ষুবধাব বুদ্ধির সঙ্গে মিশেছে বাচিক অভিনয়। আর এরই যোগফল শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে নন্দগোপালের বক্তব্য বিষয় সীমাহীন। রস-পরিবেশনে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলেই তাঁর মুখে ববীন্দ্র-কথা অপূর্ব লাগে। জীবনের একপর্ব শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেছেন; তাই তাঁর রবীন্দ্রকথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

—'রবীন্দ্রনাথের সামনে মাত্র দু'জনকে আমি ধূমপান করতে দেখেছি।'

উৎসুক হয়ে বসি।

নন্দগোপাল বলতে থাকেন, "তাঁরা হলেন—চারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস্., 'পুরনো কথা' ও 'ছুনিয়াদারী'র লেখক। আর-একজন সংগীতসাধক অতুলপ্রসাদ সেন। চারুচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দা সত্যেন্দ্রনাথের সহকর্মী-বন্ধু। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজপ্রতিম। ভারিক্কি চালে সিগারেট ধরিয়ে গল্প করতেন। আর অতুলপ্রসাদ 'কি 'কবি, কেমন আছেন?' বলে বসতেন, বসেই একটি সিগারেট ধরাতেন। বাকি সব ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সামনে নিতান্তই সংকুচিত হয়ে থাকতেন। ক্ষিতিমোহন সেন ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে সমানে হাসি ঠাট্টা করতেন বলে মনে পড়ে না।"

বলতে বলতে নন্দগোপাল শ্রোতার মনকে আবিষ্ট করে রাখেন।

"জানো, একবার আমি দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে জব্দ হতে—ভদ্রতা আর বিনয়ের চূড়ান্ত করে গেছলেন নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু, বাগবাজারী ভাষায়—অমর্ত বোস।

"সেবার বোলপুরে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলন হলো। অমৃতলাল তখন প্রৌঢ়, রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন। সম্মেলনে অমৃতলাল ও রবীন্দ্রনাথ আসবেন বলে কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আর এলেন না।

"অমৃতলাল ব্যাপারটা বুঝলেন। সম্মেলনমণ্ডপ থেকেই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি প্যাঠালেন—"আপনার শ্রীচরণের অনুমতি পাইলে দর্শন লাভের জন্য শান্তিনিকেতন যাইতে ইচ্ছা করি। ইতি—অমৃতলাল বসু।" ব্যস্! রবীন্দ্রনাথ সোজা চলে এলেন সম্মেলন-ক্ষেত্রে। অমৃতলালকে গাড়ি করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেলেন।"

কথকের কণ্ঠে, বাগ্‌ভঙ্গীতে সমস্ত দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

"উত্তরায়ণের বড়ো ঘরে দুজনে কথাবার্তা বলছেন। আমরা অনুচরবৃন্দ পাশাপাশি আছি। কখন কি প্রয়োজন হয়।

"অমৃতলাল সোনা-বাঁধানো চশমাটি খুলে নিয়ে বললেন, 'যৌবনে একদিন থিয়েটার করেছিলাম বলে আজো কি ক্ষমালাভের যোগ্য হই নি?

'রবীন্দ্রনাথ মিহি কণ্ঠে বললেন, "না, না, সে কি কথা!"

'অমৃতলাল তবু থামেন না। তিনি এসেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনে যান নি, এই কথা ভেবে আহত হয়েছেন। বলেন, দেখুন, আপনি ব্রাহ্মণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, আর আমি সামান্য কায়েত। আমাকে করুণা করুন।" রবীন্দ্রনাথ বিব্রত হয়ে বলেন, ছি, ছি, ও'কথা বলে লজ্জা দেবেন না। তা ছাড়া বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আর সভা-সমিতিতে—

'অমৃতলাল সবিনয়ে বলেন, "আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি যদি সভায় আসতে পারি, আপনি পারেন না?"

'শেষ পর্যন্ত, অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে মুগ্ধ হলেন। আর সমস্ত শান্তিনিকেতন অমৃতলালের বিনয়ে সৌজন্যে বিস্মিত হলো। কথাশেষে অমৃতলাল একটু অবসর ভিক্ষা করলেন। কারণ তিনি কবির সামনে ধূমপান করতে চান না। বুঝেছ, এই হ'ল 'অমর্ত বোসের ভদ্রতা।" কথক তাঁর কথকতা শেষ করলেন।

একদিন বললেন, 'ওহে তোমার ঠিকানাট. বলো তো। কিছুতেই খেয়াল থাকে না।'

ঠিকানা দীর্ঘ, পাঁচ অংকের। শুনে বললেন, "এই তো মুশকিল। এ তো গুলিয়ে যাবে। এটা সংক্ষেপ করা যায় না? একটা রুশ ছবি দেখেছিলাম—জার্মান নায়ক ও রুশ নায়িকা। উভয়ের মধ্যে কিছু আলাপ-সালাপ হলো। শেষে একদিন ছেলেটি বললো—"তোমার নামটা ঠিকমত জানি না।" মেয়েটি বলল—"আমার নাম

অ্যানা পোলেস্কা চেশুংকা মোরেভা।” শুনে তো ছেলেটির চোখ কপালে উঠে গেছে। কিছুতেই আর আয়ত্ত করতে পারে না। শেষে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। মেয়েটির নামের নানারূপ দাঁড়িয়ে গেল—অ্যানা পোলেস্কা মোরেভা চেশুংকা—উঁহু, অ্যানা চোলেস্কা মেরুংকা চোশেভা,—উঁহু, চ্যানা আনেংকা চোভেস্কা পোরেভা,—উঁহু,—”

হাসতে হাসতে বলি, “দাদা, থামুন।”

নন্দগোপাল বললেন, ‘তখন মেয়েটিই সংকট উদ্ধারের পথ বাত্‌লে দিলে। বললে, “কল্‌ মি অ্যানা”। সেই জন্যই বলছিলাম। তোমার বাড়ির নাম্বারটা ছোট করো। বাংলাতেও এরকম আছে—যেমন, অম্বুজাক্ষ কিরণবিন্দু ঘোষদস্তিদার চৌধুরী।’ হাস্যরোলে নামায়ণ-পর্ব শেষ হলো।

আর এক সকাল। দুজনে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় পদ্মবনে মত্ত হস্তীসম মিটিং-আড়কাঠির প্রবেশ। কিছুতেই ছাড়বেন না, যেতেই হবে, ‘বাহির-শ্রীখণ্ড নেতাজী তরুণ সংঘের রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী’ হবে। না গেলেই নয়। দেখলাম, দাদা খুব সতর্ক। বললেন, ‘তা এত করে যখন বলছেন, তখন যাব। নিশ্চয়ই যাব। কবে সভা হচ্ছে?’

‘আজ্ঞে ১৭ তারিখ, শনিবার।’

দুমিনিট চোখ বুজে ভেবে বললেন, ‘উঁহু, ওদিন তো হবে না, দক্ষিণ-হাবড়ায় সভা আছে।’

—‘তা’হলে স্যার, ১৮ তারিখ, রবিবার। আপনার স্যার, কোনো কষ্ট হবে না।’

—‘উঁহু, সেদিন তো আসানসোল যাচ্ছি, ফিরব তিনদিন বাদে। বার্ণপুর, কুলটি আর চিত্তরঞ্জনে তিনটি মিটিং সেরে।’

—‘তাহলে স্যার, কি হবে? বড়ো আশা নিয়ে এসেছিলুম।’

—'আমারও দুঃখটা কম নয়। আ—চ্ছা, আগামী উৎসবে নিশ্চয়ই যাব।'

অগত্যা ভগ্নদূতের প্রস্থান।

বললাম, 'দাদা, এটা কি হলো?'

উত্তর হলো, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ।'

একদিন সকালে গিয়ে দেখি তাঁর মন-মেজাজ খুব শরিফ্ নয়। চিন্তিত হলেম, এ'রকম তো বিশেষ হয় না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা, এতো গম্ভীর কেন? কোনো দুঃসংবাদ আছে?'

উত্তর হলো, "না, না, একটা বিষয় ক'দিন ধরে ভাবছি। সবাই বলে, আমাদের দেশে চিন্তার ও কথা বলার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সত্যি কথা কোথায় বলি? বাড়িতে বলা যায় না, আপিসে বলা যায় না, সভায় বলা যায় না। সত্যি কথা বললেই অপবাদ শুনতে হয়। ধিক্কার শুনতে হয়। তাহলে মানুষ প্রাণের কথা বলে কোথায়? স্ত্রীর কাছে না, সহকর্মীর কাছে না, ভদ্র-সমাজে না, কোথায় বলে? দেখো, আমার ধারণা, প্রত্যেক মানুষেরই একজন করে গুপে আছে, তার কাছেই বলে।"

জিজ্ঞাসু-কণ্ঠে বলি, 'গুপে? তার অর্থ?'

"গুঁপে হলো ছোটবেলাকার বন্ধু। একমাত্র তার সঙ্গেই খোলা মনে কথা বলা যায়। প্রাণ খুলে সত্যি কথা কেবল সেখানেই বলা যায় না, একজন অপরজনকে বলে, 'জানিস্, গুপে, মাইরি বলছি, সে যা ব্যাপার না—"

হাস্যরোলের মধ্যেই কথা শেষ হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পরম সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু অগ্রজপ্রতিম নন্দগোপাল মারফৎ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথকে লাভ করেছি। কত গল্পই শুনেছি তাঁর কাছে। সামান্য দু'একটি

শব্দের পরিবর্তনে, কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহে বক্তব্যে রসসঞ্চার করতেন রবীন্দ্রনাথ।

নন্দগোপালের মুখেই তার একটি উদাহরণ শুনুন।

"এক সকালে উদয়নের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন, পাশাপাশি রয়েছেন পরিকরবৃন্দ। সামনের আঙিনা দিয়ে দুই মণিপুর রাজকুমার চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে মিহি চড়া গলায় বললেন, "ওই যে দেখছ—খর্ব নাসা, প্রশস্ত ললাট, কপিশ চক্ষু, গৌরবর্ণ রাজকুমারদের, তাঁরা কিন্তু মূ—র্খ!" শেষ শব্দটি এমন জোর দিয়ে ঢেউ তুলে উচ্চারণ করলেন যে আমরা না হেসে পারলাম না।'

কথাপ্রসঙ্গে বলি, 'দাদা, বাঙালী মনীষীদের মধ্যে আপনার কাকে বড়ো বলে মনে হয়?'

নন্দগোপাল এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপরই উত্তর দিলেন, 'রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, অক্ষয় দত্ত, বিবেকানন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ।' এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই তাঁর কাছে শুনেছি। মনীষাক্ষেত্রে তিনি জাতি-অভিমান ও বর্ণ-অভিমানের নিন্দা করে সদুঃখে বলেছেন, "জানো, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, বৈদ্য-শূদ্র জাতিভেদ এখনো সম্পূর্ণ চলে যায় নি। একসময় কলকাতা হাইকোর্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-অধ্যুষিত ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রও তাই ছিল। আজ ধীরে ধীরে সে প্রাধান্যের অবসান হচ্ছে। একটা ঘটনা তোমাকে বলি, শুনে আশ্চর্য হয়ো না।

"ঘটনা আমি দার্শনিক-প্রবর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে শুনেছি। এটা তাঁরই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। সুতরাং অবিশ্বাস করার অবকাশ নেই।

"তখন সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হতে চলেছেন। কলেজের গভর্নিং-বডির একাংশ এই নিয়োগের

বিরোধিতা করেন। শোনা গেল, তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও আছেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাছে গেলেন। বললেন, "স্যার, আমি আপনার স্নেহাস্পদ ছাত্র, পুত্রতুল্য। আপনার পদতলে বসেই আমি শিক্ষালাভ করেছি। আপনি আমার প্রতি বিরূপ হবেন না।" স্নেহাসক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উত্তর দিলেন, "না, না, বিরূপ হবো কেন? তুমি পরম স্নেহভাজন। তবে কি জান? ব্রাহ্মণের কৌলীন্য তো তোমার নেই।" অবশ্য শেষপর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই মিথ্যা বর্ণাভিমান আমাদের সর্বনাশ করেছে।" নন্দগোপাল থামলেন।

সব নদীর শেষ গন্তব্য সাগর। সব আলাপের শেষ লক্ষ্য রবীন্দ্র-আলাপন। তাই শ্রদ্ধেয় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মশায় রবীন্দ্র-কথায় বারবার ফিরে আসেন।

শান্তিনিকেতন যখন তাঁর কর্মস্থল ছিল তখনকার কথা নন্দগোপাল বারবার বলেন। ওখানে পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ছিলেন। 'তিনি সর্বজনের "পণ্ডিত-মশাই"। কিন্তু,'—নন্দগোপাল শুরু করেন, 'এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। উনি ভয়ানক গোঁড়া, স্বপাকে আহার করেন, অব্রাহ্মণের জল বা খাদ্য স্পর্শ করেন না। রবীন্দ্রনাথ ডেকে না পাঠালে তিনি উদয়নের আড্ডায় গিয়ে বসতেন না। ভয় হল কবি ওখানে কিছু গ্রহণ করতে বললে তিনি বিপদে পড়ে যাবেন। একদিনের কথা শোনো।

'পণ্ডিতমশায় কর্মোপলক্ষে কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। বিকেল বেলা। কবি বললেন, "পণ্ডিত মশায়, আপনাকে এক বাটি চা দিতে বলি?"

—"না, না, আমি তো চা খাই না।"

—"ও তাহলে চা থাক।"

পণ্ডিতমশায় ভাবলেন, বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পুনর্বার প্রশ্ন, "তাহলে আপনি একটু মিষ্টি খান।"

আঁৎকে উঠলেন পণ্ডিত মশায়।—"না, না, এখন ও-সব খাবো না। আর মিষ্টি তেমন সহ্য হয় না।"

কবিও সংকটে পড়েছেন, "তাহলে, কি খাবেন?"

পণ্ডিতমশায় টেবিলের উপর সাজানো থালা দেখলেন। কবির অসম্মান করতে পারেন না। এদিকে আবার ব্রাহ্মণ্যের পতাকা ধূলোয় লুটোতে দিতে পারেন না। অগত্যা শেষ পর্যন্ত বললেন, "আজ্ঞে, আমি ঐ পেঁপেটা খাব।" বলে একটা আস্ত পাকা পেঁপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

'কবি মৃদু হেসে বললেন, "বেশ, তাই হবে। পেঁপেটা কেটে এনে দিক।"

' "না, না, আমিই কেটে নেবো।" লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন পণ্ডিতমশায়। অন্য কেউ তা স্পর্শ করে যদি অপবিত্র করে দেয়। সে-ভয়ে তাড়াতাড়ি সেটি হস্তগত করলেন এবং বিদায় নিলেন।'

হাস্যরোলের মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটলো।

অজস্র চমকপ্রদ কাহিনী, দীপ্ত সংলাপ, অপূর্ব বাচনভঙ্গী, বহুবিধ প্রসঙ্গ, ঈর্ষাযোগ্য স্মরণশক্তির সমবায়ে যে-মানুষটি গড়ে উঠেছে, তিনি সুকথক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তাঁর মুখে শোনা আর একটি গল্প বলি।

কথক বলছেন, 'জানো আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের একটি পুরনো ওভারকোট ছিল। তিনি সেটা কি শীত কি গ্রীষ্ম—সব সময়েই ব্যবহার করতেন। আমরা দু'-একবার বলেছি, ওটা বর্জন করে নতুন একটা ওভারকোট কিনতে। দীনেশচন্দ্র হুংকার দিয়ে উঠেছেন : "তুম্‌রা কি কও, এই কোটখান্ কত পয়মন্ত, তা তুম্‌রা জান? এইখান পইর‍্যাই আমি কত বড় বড় মানুষের লগে দেখা

করছি।" তাই ও কোট তিনি আর ছাড়েন না। আসল রঙ কবে মিলিয়ে গিয়েছে, একটা ধূসর আস্তরণ পড়েছে। খুব গরমে কোটটি দীনেশচন্দ্র মাঝে মাঝে খুলে রাখতেন।'

'ঐ কোটের লম্বা-সরু-ছোট-বড় উনিশটি পকেট ছিল। দীনেশ-চন্দ্রের নানারকম কাগজপত্র ঐ-সব পকেটে থাকত। একবার ঝোলানো কোটের লম্বা সাইড পকেটে এক বিডাল তার সদ্যোজাত ছানাগুলিকে বেখেছে। বেশ নিবাপদ গরম আশ্রয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা ছানাকে আব নিয়ে যেতে পাবে নি। সেটি সেখানেই পড়ে আছে। আর মিউ-মিউ-মিউ কবে ডাকছে। ঘরেব মধ্যে অনবরত মিউ-মিউ শব্দ হচ্ছে, কিন্তু কোথাও বিড়ালছানা দেখা যাচ্ছে না। ভৌতিক বিড়াল না কি? শেষ পর্যন্ত দীনেশচন্দ্রের ওভারকোটের সাইড-পকেট থেকে সেই বিড়ালছানা বেরুল। ছোটদের জন্ত 'হাবাণবাবুব ওভারকোট' নামে একটি গল্প লিখে-ছিলাম এই ঘটনা নিয়ে।'

ঝুলি থেকে নয়, কোটের পকেট থেকে বিড়ালছানা বাব করে কথক হাসিব তুবড়ি ফুটিয়ে দিলেন।

বিমলচন্দ্র সিংহ

প্রশ্ন উঠবে, আমি কোন বিমলচন্দ্রের কথা বল্‌ছি? বিমলচন্দ্র সিংহ—যিনি পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও রাজস্ববিভাগের মন্ত্রী, জমিদারী উচ্ছেদ কর্মকাণ্ডের নিপুণ পরিচালক, অর্থনীতি ও কৃষি-অর্থনীতির প্রগাঢ় পণ্ডিত, না, রবীন্দ্র-ভক্ত, সুরসিক, কবি-প্রবন্ধকার, আড্ডা-ধারী বিমলচন্দ্র সিংহ? উত্তরে জানাই, আমি শেষোক্ত জনের কথাই বলছি। তাঁকেই আমি চিনতাম। অবশ্য দুজনেই এক ব্যক্তি।

প্রবল হাসির তোড়ে সুগৌর আনন রক্তাভ হয়ে উঠেছে, হাসির ধমকে কেদারাচ্যুত হবার উপক্রম: বিমলচন্দ্রের এই ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

বিমলচন্দ্রের রবীন্দ্র-ভক্তি সুবিদিত। 'রবীন্দ্র-ভারতী'র সম্পাদক বলেই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল সহজাত।

এই প্রসঙ্গেই একদিনের আড্ডার কথা মনে পড়ছে। বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রপ্রভাব: এই বিষয় অবলম্বন করে সেদিনের আলোচনা জমে উঠেছিলো। আল্‌গোছে মুখে দু'টুকরো সুপুরি ফেলে দিয়ে বিমলচন্দ্র একটু হেসে বললেন, 'কথাটা "বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ" না হয়ে হওয়া উচিত "বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী।"

উৎসুক হয়ে বলি, 'এর অর্থ?'

গূঢ়হাস্যে বিমলচন্দ্র বললেন, 'তবে শুনুন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এক বক্তা, ধরুন, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ক—বাবু। তিনি জীবনে কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের ছায়া মাড়ান নি, রবীন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, ইদানীং কালে এক-আধবার শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েছেন। তারও কারণ আছে। সেখানে

তাঁর ভগ্নী-জামাই কাজ করেন, তাঁরই আতিথ্যে দু-দিন চেঞ্জে গিয়েছিলেন।

'মশাই, আপনাকে বল্‌ব কি'—কৌতুক-উচ্ছলিত কণ্ঠে বিমলচন্দ্র বলে চলেন-'ক—বাবু আমাকে অবাক করে দিলেন। এক আধা-প্রকাশ্য আধা-ঘরোয়া রবীন্দ্রসভায় গিয়েছি। দেখি ক-বাবুর বক্তৃতা আছে। আমার একটু সংশয় হলো, ওঁকে তো কোনোদিন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ বলে জানতেম না। ভাবলাম, হবেও বা।

'ক-বাবুর বক্তৃতা শুরু হলো। তাঁর ভাষা যথাসম্ভব বজায় রেখে বলছি। ক-বাবু বলছেন: "রবীন্দ্রনাথ মহৎকবি, রবীন্দ্রনাথ মহামানব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কত বিনয়ী ছিলেন, সে কথা আপনাদের অনেকেরই জানা নেই। আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। আমার মনে পড়ে প্রহর-শেষের আলোয় রাঙা সেই চৈত্র-সন্ধ্যা, পলাশে আব লাল কাঁকরে উদয়নের প্রাঙ্গণ জ্বলছে। মৃদু হাওয়া। সেই চওড়া বারান্দায় কবি কবিতা পড়ছেন, আমবা পদতলে গোল হয়ে বসে সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনছি। কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেল। একজন শ্রোতা কবির কাছে একটি কবিতার ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। কবি মিষ্টি গলায় ব্যাখ্যা কবলেন। আমার কি দুঃসাহস হলো জানি নে, হঠাৎ বলে বসলাম, কবি, অনুমতি দেন তো আমি আর একটি ব্যাখ্যা করি। সকলে স্তম্ভিত, কবির পদ্মপলাশ নয়ন ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। তবু অনুমতি দিলেন। আমি ব্যাখ্যা করলাম। কবি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। সকলেই শঙ্কিত, আমার এই স্পর্ধায় কবি কি মনে করবেন! কিন্তু কী আশ্চর্য! কবি ধীবে ধীবে আমার কাছে এসে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বৎস, আমি পরাস্ত!' এই মহামানবের এই বিনয়!"

থামলেন বিমলচন্দ্র। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, কৌতুকগূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কি—কেমন ভক্তি?' তারপরই উচ্ছ্বসিত হাসিতে

ভেঙে পড়লেন। সে হাসিতে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বিনয়ঃ এই প্রসঙ্গ আরো একদিন উঠেছিল বলে আজ মনে পড়ছে। কলকাতা আর্ট-স্কুলের (বর্তমানে কলেজ) এক অধ্যাপক-চিত্রী কবির বিনয় সম্পর্কে আর-একটি ঘটনা বিবৃত করেছিলেন। বিমলচন্দ্র সে-গল্পটাও রস দিয়ে পরিবেশন করলেন। বললেন, 'খ'বাবু-কে তো নিশ্চয়ই চেনেন। নাম-করা শিল্পী। কবির তিরোধানের পর আর্ট স্কুলে আয়োজিত লোক-সভায় খ-বাবু ভাষণ দিচ্ছেন। সেদিন কিঞ্চিৎ রসস্থ ছিলেন। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা—'

'ঠিক বুঝেছি, আপনি বলুন'— জানাই আমি।

বিমলচন্দ্র পুনর্বার শুরু করেন—'শোকে মুহ্যমান শিল্পী খ-বাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেনঃ "আজ আপনাদের কাছে গুরুদেব সম্পর্কে কী বলব। হৃদয় আমার ভেঙে পড়ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কলাবিদ্যার সকল দেবী তাঁকে বরদান করেছিলেন। আমি আজ একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করে দেখাব, তিনি কত বড়ো বিনয়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চলাফেরা, কথা-হাসি—সবই ছিল শিল্পমণ্ডিত। তিনি যখন হাঁটতেন, নিঃশব্দে চুপিসাড়ে হাঁটতেন, বিড়ালের মতো হাঁটতেন।"

বিমলচন্দ্র বললেন, "এই পর্যন্ত বলেই খ-বাবু হঠাৎ গুঁড়ি মেরে বসে পড়ে বিড়ালের ভঙ্গীতে চলতে শুরু করলেন। বুঝতেই পারছেন, সেদিন নেশাটা কতটা—"

হাসির প্রবল ধমকে বিমলচন্দ্রের গৌরানন রক্তাভ হয়ে উঠল, হাসতে হাসতে বলি, 'দয়া করে থামুন, ওঃ, একেই বলে মহাকবির বিনয়।'

বিমলচন্দ্র সিংহ মুর্শিদাবাদের কান্দী ও কলকাতার পাইকপাড়ার সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী সিংহবংশের কুলতিলক, তা সবাই জানেন। ধন বা আভিজাত্যের কোনো দম্ভ কোনোদিন তাঁর ছিল না। মিষ্ট-ভাষী সুরসিক গাল্পিক বিমলচন্দ্রের সঙ্গে এক আড্ডায় বা দীর্ঘ মোটর ভ্রমণে যাঁরা সঙ্গী হয়েছেন, তাঁরাই এ'কথা স্বীকার করবেন।

বিমলচন্দ্রেব বাড়ীতে একদা সংগীতের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার এক বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কথ্যভাষায় উচ্চারণের বিশেষত্ব আছে।

প্রবীণ আড্ডাধারী মাত্রেই জানেন, আড্ডার কোনো নির্ধারিত বিষয় সূচী থাকে না। আম থেকে আণবিক বোমা, মহাকাশ ভ্রমণ থেকে লিলুয়ার জলবায়ু—সব কথাই আসতে পারে। এই ভাবেই একদিন কি ভাবে গানের কথা ও সেই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর ঘরানার কথা এলো।

বিমলচন্দ্র বললেন, "আমাদের সংগীতশিক্ষকের অভিজ্ঞতা তো শোনেন নি। তিনি একদিন এক মহারাজা-সকাশে গিয়েই কি ভাবে পালিয়ে এসেছিলেন, তা শুনলে বুঝবেন, সংগীতশিল্পীদের অনুমান-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি কতো প্রখর। আমাদের সংগীতশিল্পী যে-সময় মহারাজের প্রাসাদে পৌঁছলেন, তখন মৌজের সময়। কর্মচারীদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে গেলে মহারাজের বৈঠক-খানা, সেখানে কেবল অন্তরঙ্গজনেরাই আসেন। সংগীতশিল্পীর কথাতেই বলি—'জানো ভায়া, কিছুদূর তো এগিয়েছি। যাই দেখেছি, বেয়াবা স—টা'র বোতল হাতে এগুচ্ছে অমনি পালিয়ে বাঁচি।"

"স—টা'ব বোতল" (অর্থাৎ সোডার বোতল) শব্দটি বিমলচন্দ্র এমন চমৎকার উচ্চাবণ করলেন, যা শুনে আর নির্বিকার থাকা যায় না।

ঐ সংগীতশিল্পীর আর একটি বাক্য বিমলচন্দ্রের মুখে শুনেছি। শিল্পী 'সংগীত-প্রবেশক'-ধরণের একটা বই লিখেছিলেন। বিক্রী আর হয় না। বিমলচন্দ্র বললেন, 'যখনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'কি, আপনার বই কি রকম কাটছে ?'—তখনই তিনি গম্ভীর মুখে জবাব দেন—'কাটছে বটে, তবে প—কায় (অর্থাৎ পোকায়) কাটছে।' "প—কা" শব্দটিও বিমলচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ক্ষেপণে অপরূপ হয়ে উঠত। দেখা হলেই তাই আমাদের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর ছিল—"কি, আপনার কি রকম কাটছে ?" "প—কায় কাটছে।"

প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী—তিন ক্ষেত্রেই বিমলচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল। তাঁর উপহৃত "এল্ ডোরাডো" কাব্যগ্রন্থটি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখছি। আর তাঁর মধুর ব্যবহারের কথা মনে পড়ছে। কতবার তিনি বলেছেন, "আর মশাই, একেবারেই সময় পাই না। অ্যাসেমব্লি সেসন্ আর আপিস করেই দিন-রজনী কেটে যায়। আপনাদের সঙ্গে বসে নিশ্চিন্তে দু দণ্ড আড্ডা দেবো, তা আর হয়ে ওঠে না। রাত আটটার পর বাড়িতে আসুন, তখন ভীড় থাকে না।"

তাঁর কাছে অর্থীর অন্ত ছিল না। সকলের জন্যই তাঁর দুয়ার খোলা। এক সন্ধ্যায় গিয়েছি। প্রশ্ন করলাম—"কি ব্যাপার ?" উত্তর হলো—"আর বলবেন না। সকলেরই ধারণা আমি কল্পতরু, যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়। সিমেন্ট, ট্যাক্সির পারমিট, চাকুরি,—সবই দিতে পারি।" একটু হেসে বললেন, "বলুন, আপনাকে কি দিতে পারি ?"

জানালাম, "একটি প্রবন্ধ চাই।" বললেন, "ও কথাটি কইবেন না। লেখা আর হচ্ছে না। -মিনিস্টার হয়ে লেখাপড়া চুলোয় গেছে।"

তথাপি দেখেছি, বিমলচন্দ্রের অধ্যয়নস্পৃহা কতো প্রবল, কতো ব্যাপক। একদিন কথা হচ্ছিল, লেখক-চিত্রশিল্পী-গায়কদের 'জুর্নাল'

(জার্নাল, ডায়েরী) সম্পর্কে। অঁদ্রে জিদ্-এর 'জুর্নাল' তাঁর কাছে আছে। তিনি আকস্মিকভাবে সেটা পুরনো বইয়ের দোকানে কিনেছেন। পরিহাসতরল কণ্ঠে বলেন, "এ বইটা পড়তে দেবো না। শেষে কি আপনি আমার ওপর মার্ক টোয়েনী ফলাবেন।" মিলিত হাসিতে ঘর ভরে ওঠে।

সুরসিক বাক্পটু তীক্ষ্ণধী বিমলচন্দ্রের সহস্র কথার স্মৃতি মনকে ভাবাক্রান্ত করে তোলে। ছোটখাট ঠাট্টা, স্মিত পরিহাস তাঁর আজ্ঞাধীন ছিল। রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীর কথা হচ্ছিল। তাঁদের সম্পর্কে আমার লেখা বইটি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সে-কথা এ'প্রসঙ্গে অবান্তর। কেবল একটি ঘটনা বলি।

বিমলচন্দ্র বললেন, "জানেন, কান্দীতে আমাদের স্কুলের এক সভায় আপনাদের এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধানকে নিয়ে গেছি। বৈষ্ণবীয় কবিতায় তাঁর খ্যাতি আছে। ভেবেছিলুম, কবিও বোধ হয় নন্দপুরচন্দ্রের বিনয়ী ভক্ত, তাঁর কোনো অভিমান বা আকাঙ্ক্ষা নেই। স্কুলে পৌঁছে তাঁকে হেড-মাস্টার মহাশয় লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়েছেন। তাতেই ঘটল বিপত্তি। আলমারিগুলিতে যে-সব বই আছে, তা তিনি দেখলেন, তারপর বললেন, 'এখানে আমার বই নেই কেন? আমি বক্তৃতা করব না।' মহা মুশকিল! অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করা হলো, তাঁর বইগুলি কে[নবা]র প্রতিশ্রুতি দিয়ে।"

বিমলচন্দ্র কৌতুক-তরল কণ্ঠে হেসে উঠলেন। না হেসে আর উপায় রইল না। আজ সে হাসির উৎস চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবু সে হাসির কথা বারবার মনে পড়ে।

শ্রীসমরেশ বসু

"জীবনের স্থুল আবর্তের অন্তরালে, যে অদৃশ্য চাবিকাঠিটি নিয়ত ঘুরপাক খায়, তাকে আমরা সহসা দেখতে পাই নে। কিন্তু তার নিয়মেই জীবনের যত খেলা। আর সেই জন্যেই তাকে আমরা খুঁজে মরি। এই খুঁজে মরার-ই নাম বোধ হয় শিল্পীর পরিশ্রম, তার অধ্যবসায়, তার অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান। আমার ত মনে হয় আমার গল্প-উপন্যাস এই নিয়ত অনুসন্ধানের ফল মাত্র।"

হাসি হাসি মুখে কথা বলছিলেন সমরেশ বসু। কোঁকড়ানো চুল, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, গভীর কণ্ঠস্বর, প্রশস্ত ললাটের অধিকারী সমরেশ বসুর সন্ধান নিয়তই চলছে। সামনে ধূমায়মান দু'কাপ কফি,—আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসে আড্ডা দিচ্ছি।

"আপনি যাকে দেখেন নি, তার সম্পর্কে আপনি লেখেননি, এটাই কি আপনার দাবি ?" প্রশ্ন করি।

তৎপর উত্তর এলো—"হ্যাঁ, এই আমার দাবি। আমি জীবনকে ফাঁকি দিই নি।" মনে পড়ল, 'সহযাত্রী' গল্পটা। সেই যে ঘণ্টা দুয়েকের সহযাত্রী বর্ধমানের গ্রামের চাষী—আশ্চর্য সেই চরিত্র। কী প্রত্যক্ষ তার কথা বলার ভঙ্গী—"যদি আসেন কখনো বঁইচির দিকে, আসবেন আমাদের গাঁয়ে, গাংটাং রোডের পশ্চিমে, বেরেলা গাঁ, পূব পাড়ার ইতু দিগরের ছেলে ছিচরণ দিগর আমার নাম। আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, গেলে বড় খুশী হই।"

যখনি পুরনো গল্পের বই নাড়াচাড়া করি, তখনি এইসব গল্প আর-একবার পড়বার ইচ্ছে হয়। বললাম—"গাংটাং রোডের পশ্চিমে বেরেলা গাঁয়ের অধিবাসী এই সরল চাষীচরিত্রকে কোথায় পেলেন ?"

সমরেশ বসুর উত্তর—"কোথায় পাব? সে কি আমার সৃষ্টি? সে ত' বিধাতার সৃষ্টি। তাকে সহযাত্রী রূপেই পেয়েছিলাম। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারেই তাদের গ্রাম।"

চরিত্রটি আশ্চর্য, আকর্ষণীয়, শহুরে নিয়মানুযায়ী অভদ্র, গায়ে-পড়া, তবু তাকে ভালো লাগে। ট্রেনের কামরায় গায়ে-পড়ে এই লোকটি জানায় এবার নিয়ে তিনবার হল। "তিনবার দেখা হল কলকেতা। পেথমবারে, সে তখন অনেক ছোট। মনেই নাই, হেঁ হেঁ। তা পরের বার, তেলোক বাঁড়ুজ্জে মশায়ের ছেলের বে'র গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিলম, কলকেতারই মেয়ে কিনা। তখন খুব দেখে নিছলাম ঘুরে ঘুরে। তাপরে, আবার মানে···—বাপ-মা নেই। বে-থা করলাম।" বলে চোখ দিয়ে দেখিয়ে দিলে পাশের ঘুমন্ত বউটিকে। হেসে বলল, "পরিবার। এই বছর দুয়েক হল আমার মামা এসে বে দিয়ে গেছে। এই তো কালনারই মেয়ে। এট্টুস ডাগবসাগর হয়ে পড়েছিল। তা কী করা যাবে! তা মশায়, জন্মে তো কোনদিন কিছু দেখে-টেখে নি। কলকেতা দেখবে দেখবে করে একেবারে পাগল করে খাচ্ছিল। শেষে—"

এইভাবে অজস্র কথা বলে যায়। তার মধ্যে দিয়েই লেখক এই অমার্জিত চাষীচরিত্রের অন্তর্নিহিত সারল্য ও সততা ফুটিয়ে তুলেছেন।

বললাম, "এই ছিচবণ দিগরকে না হয় ট্রেনের কামরায় সহযাত্রী রূপে পেয়েছেন, কিন্তু 'গঙ্গা'র নিবারণ, বিলেস, পাঁচু, সরিক, দামিনী, সয়াবাম, হিমি, কেদমে এদের কোথায় পেলেন?"

সমবেশ বসুর উত্তব—"আমি ত তাদের সঙ্গে মাসের পর মাস, বর্ষার পর বর্ষা মিশেছি। আত্তপুর হালিশহরে যখন ছিলাম, তখন এদের সঙ্গে অনেক দিন গঙ্গার বুকে ফিরেছি মাছ-ধরায় সময় দিনে ও রাতে। জানেন, 'গঙ্গা' উ·ন্যাসের পরিকল্পনা মনে মনে তৈরী করেছি চার বছর আগে। তারপর লিখলাম ১৩৬৩ সনের পুজোর

মরশুমে। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের এক বাড়িতে বসে চার দিনে একটানা লিখে শেষ করি। এই সনের শারদীয় 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হয়। তারপর চারমাস ধরে পরিবর্ধন-পরিমার্জন করি। তারপর গঙ্গা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'গঙ্গা' উপন্যাস আমার জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে।"

মনে পড়ল, 'গঙ্গা'র জন্যই সমরেশবাবু আনন্দ-পুরস্কার পেয়েছিলেন। কথা বলতে বলতে লেখক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ছোট্ট একটি প্রশ্নের বাধা উপস্থিত করলাম—"আর 'বাঘিনী' উপন্যাস ?"

"হ্যাঁ, 'বাঘিনী' লিখেছি যারা মদ চোলাই করে, তাদের নিয়ে। হুগলী বর্ধমান বীরভূমের গ্রামের বেকার, অর্ধ-বেকার চাষীরাই এই কাজ করে। এরা শহুরে অপরাধী নয়, মদ-চোলাই এদের জীবিকা নয়। এরা চাষী—সরল সৎ। তবু বছরের সাত আট মাস যখন ঘরে অন্ন থাকে না, তখন এরা বাধ্য হয়ে মদ চোলাই করে। এদের মধ্যে আমি জীবনের অনেক মূল্যবান মুহূর্তকে পেয়েছি। আপনি এদের সারা বছর খেতে পরতে দিন,দেখবেন মদ-চোলাই এরা করবে না। এমন চাষী পরিবারকে আমি জানি যে-পরিবার মদ খায় না, কিন্তু মদ চোলাই করে। এরা স্বভাব-দুর্বৃত্ত নয়।"

সমরেশ বসুর সৃষ্ট জগতের নরনারী কল্পনার মানুষ নয়। বাস্তবের চেনা মানুষ, এই সত্য লেখকের কথায় ফুটে উঠল। সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে লেখক উঠে পড়লেন। রাত সাড়ে আটটা। বললেন, "আবার একদিন আড্ডা হবে। আজ চলি। ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।" নৈহাটি ফিরে যাচ্ছেন সমরেশ বসু।

অন্য দিনের আড্ডা। সমরেশ বসু আসন্ন প্রকাশ উপন্যাসের প্রুফ দেখছিলেন। গিয়ে পৌঁছতেই প্রুফ ফেলে রেখে আড্ডায় মেতে উঠলেন। আসলে, লোকটি পাঁড় আড্ডাবাজ। একা একা প্রুফ দেখছিলেন, মনে হল আমাকে দেখে স্বস্তি পেলেন।

কথাপ্রসঙ্গে সভাসমিতির আমন্ত্রণের কথা হল। প্রশ্ন করলেন, "এবার রবীন্দ্র জন্মোৎসবে কোথায় যাচ্ছেন ?"

গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম—"কোথাও না।"

শুনে একটু হাসলেন সমরেশ বসু। তারপর বললেন, "কেন, কোথাও কি আমার মতো বে-ইজ্জৎ হয়েছিলেন ?"

—"তার অর্থ ?"

—"বলছি। তার আগে একটু কফি দরকাব। এই গণেশ, দু'কাপ কফি আনো। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তাব আগে"—ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে একটি ক্যাপস্টান ধরালেন, প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে দিলেন।

ফের শুরু করলেন, "বর্ধমানের রসুলপুর চেনেন তো ? সেখান থেকে একবার, মশায়, দুটি ছেলে এলো। খুবই বিনয়ী আর ভদ্র। তাদের কী-এক সংঘের উৎসবে যেতেই হবে। তথাস্তু। রসুলপুর স্টেশনে নামতেই যে-অভ্যর্থনা পেলাম, জীবনে ভুলব না। 'কৈ, সমরেশ বসু কোথায় ?' 'এই নাকি সমরেশ বসু ?' 'ও সব, বাজে কথা শুনব না, তিনি আসেন নি কেন ?' বুঝুন, আমার অবস্থা! যে ছেলেটি নিয়ে গেছে, সে যতই বলে, এই লোকই সমরেশ বসু, ততই গ্রামের ছেলেবা বলে, 'বাজে কথা রাখ, এটা কাকে ধরে এনেছিস্ ?' প্লাটফর্ম থেকে তখনো ন া নি, কথাবার্তা সবই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু হায়—তখন ফেরার কোনো ট্রেন নেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা এই অর্বাচীনকেই সমরেশ বসু বলে মেনে নিল। এমন অপমান জীবনে হইনি। তাই জিজ্ঞেস্ করলাম, আপনি কি এই কারণে কোনো সভায় যেতে চাইছেন না ?"

হেসে বলি, "না, এই ধরণের অভিজ্ঞতা নয়। ভাল লাগে না বলেই যাব না। সে কথা যাক্, আপনার সভাপর্বের আর দুয়েকটা ঘটনা ছাড়ুন।"

ইতমধ্যে কফি এসে গেছে।

কফি খেয়ে সমরেশ বসু আড্ডার মেজাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন। প্রুফটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। শুরু করলেন, "বেশী নয়, দুটি ঘটনার কথা বলি। দ্বারভাঙ্গা আর রাউরকেলা। বিহার আর উড়িষ্যা।

"দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান। দ্বারভাঙ্গায় আমার থাকবার কথা দুদিন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গার বাসিন্দে। তাঁর ওখানেই উঠেছি। তিনি তখন অনুপস্থিত। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তাঁর একদঙ্গল ভাইপো আছে দ্বারভাঙ্গায়, তারাই আমার অভিভাবক। মেডিক্যাল কলেজের সভা তো একদিন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা আর বিভূতিবাবুর ভাই-পোরা আমাকে ছাড়তে চায় না। বলে, কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছেন, প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে দুটো দিন কাটিয়ে যান। তাই সই। বিভূতিবাবুর বাড়িতে আমাকে যা খেতে দিত, তা কোনো মানুষের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তারপর কথা হ'ল, এখানে বসে থাকার চেয়ে কাছাকাছি ঘুরে আসা ভাল। কাছেই নেপাল-সীমান্ত।

"বুঝলেন মশায়, অমন গাঁজা আর কোথাও দেখিনি। নেপাল তরাইয়ে গাঁজার অঢেল চাষ। এক পয়সায় এক মুঠো গাঁজা, রাস্তার ধারে ঢেলে বিক্রি করছে। নেপাল-ভারত-সীমান্ত থেকে দশ বার মাইল ভেতরে জয়নগর বলে একটা জায়গা আছে। তখন শীতকাল। সেখানে রামসীতার মন্দিরে উৎসব। রামের বিবাহ উৎসব। তামাম হিন্দুস্থানের লোক বরযাত্রী হয়ে চলেছে উৎসব দেখতে। দ্বারভাঙ্গার ছেলে-মেয়েরা প্রস্তাব করল, রামের বিবাহে বরযাত্রী হয়ে ঘুরে আসি। ঠিক আছে, চলো। সীমান্তের প্রথম রেলস্টেশনের কর্তা বাঙালি, গার্ড বাঙালি। তাঁরা খুব আপ্যায়িত করলেন। সেখান থেকে জয়নগর যেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। বাঙালী গার্ডসায়েবের বাড়ি মাঝামাঝি এক স্টেশনে। তিনি বললেন, সেখানেই দুটি ডাল ভাত খেতে হবে। সেই নির্ধারিত

স্টেশনে গাড়ি চল্লিশ মিনিট আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। আমরা স্টেশন কোয়ার্টার্সে স্নান সেরে ভাত খেয়ে আবার ট্রেনে চাপলাম। সে কী ট্রেন! ছোট্ট লাইন, খেলনার মতো গাড়ি, আর অসংখ্য বরযাত্রী! জয়নগরে পৌঁছে রামসীতার বিবাহ উৎসব দেখা হ'ল।

"সেখানে রেলের ডাক্তার বাঙালি। তিনি বললেন। এতদূর যখন এসেছেন, কাঠমণ্ডু চলে যান, বাবা পশুপতিনাথকে দর্শন করে আসুন। ঠিক আছে, চলো। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় কানে এমন যন্ত্রণা শুরু হল যে বাধ্য হয়ে দ্বারভাঙ্গা ফিরে আসতে হ'ল। বিভূতিবাবুর এক ভাইপো ডাক্তার। সে করল কানের চিকিৎসা, বলল—এ যাত্রায় বাবা পশুপতিনাথ থাক্, বাড়ি চলে যান। তখন দ্বারভাঙ্গার একটি ছেলে বলল—আপনি রাজগীবটা দেখে যান। পাটনায় তার আত্মীয়কে লিখে দিল। পাটনা হয়ে রাজগীর দেখে তারপর কলকাতা হয়ে নৈহাটি ফিরলাম। দুদিনের জায়গায় চৌদ্দ দিন কাটিয়ে ফিরলাম। কিন্তু বাবা পশুপতিনাথেব কৃপা পেলাম না।" হাসির মধ্যে গল্প শেষ হ'ল।

হাসি থামিয়ে বলি, "আর রাউরকেলার সভা?" কথক ফেব শুরু করলেন, "হ্যাঁ, সেই কথাই বলি। সস্ত্রীক প্রেমেনদা আর আমি রাউরকেলায় সভা কবতে যাচ্ছি। প্রেমেনদাকে চেনেন তো? ট্রেনে উঠে জল খাবেন না। একমা‍ত্র পানীয় ডাবের জল। সাঁকরেল স্টেশনে বৌদি বিশ-পঁচিশটা ডাব কিনে ফেললেন। প্রেমেনদা লিকুইড সাবানে বারবার হাত ধোবেন। বৌদি তা এনেছেন। প্রেমেনদা নস্যি নিয়ে সেণ্টে আঙুল মোছেন। বৌদি তা এনেছেন। যাই হোক, এই সব করে আমরা রাউরকেলা পৌঁছলাম। যথারীতি সভা হয়ে গেল। প্রেমেনদা দুদিন বাউরকেলায় থাকবেন। আমি কোথায় যাই? রাম বসুকে চেনেন তো? হ্যাঁ, কবিতা লেখেন। ও স্টেশন আগের স্টেশন জরাইকেলা, সেখানে রাম বসুর বাড়ি। সে তখন সেখানে আছে। চলে গেলাম

সেখানে। জরাইকেলা উড়িষ্যার গভীর জঙ্গল এলাকার মধ্যে। এক কাঠ-ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভাব করে জরাইকেলা থেকে ট্রাকে করে চলে গেলাম গভীর জঙ্গলে বিখ্যাত 'বাহাদা'র রিজার্ভ ফরেস্টে। সেখানে আছে কয়েকটি পাতার ঘর, আর কিছু মুণ্ডা আদিবাসী যারা কাঠ চেরাই করে। এছাড়া অরণ্য আর অরণ্য, সভ্যতার আর কিছুই নেই।"

সিগারেটে ছুটান দিলেন সমরেশ বসু। ফের শুরু করলেন, "বাহাদার সেই গভীর অরণ্যে গিয়ে মনে হ'ল, এই মুণ্ডাদের সঙ্গে বাস করতে হলে তাদের মতোই হতে হবে। ভদ্র পোশাক ছেড়ে তাদের মতো করে কাপড় পরলাম। তাদের সঙ্গে নাচ শিখতে শুরু করলাম। রোজ সন্ধ্যায় নাচের আসর হ'ত। আমি কি নাচতে পারি? সরস্বতী নামে একটি হাস্যমুখী মুণ্ডা যুবতী ছিল আমার নাচের গুরু। যখনি নাচের পদক্ষেপে ভুল হ'ত, তখন সে আমার পায়ে লাথি মারত। এইভাবে লাথি মেরে মেরে সে আমাকে নাচে পারদর্শী করে তুলল। তাদের সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠতা হ'ল যে তারা ভাবতে শুরু করল আমি হয়ত বা গোত্র বদল করতেও পারি। এদিকে রাম বসুর স্ত্রী খুবই চিন্তিত। তিনি ভাবলেন, আমাকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবার নৈতিক দায়িত্ব তাঁর। শেষ পর্যন্ত আমাকে সভ্য জগতে ফিরে আসতেই হল। যেদিন চলে আসি সেদিন সেই সব সরল মুণ্ডা পুরুষ রমণী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় বিদায় দিল। তাদের কারুর কারুর চোখে জল এসেছিল। আমার চোখের পাতা শুকনো ছিল না।"

অন্য একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ওয়াই. এম. সি. এ. রেস্তো-রাঁয় সমরেশ বসুকে টেনে নিয়ে গেলাম। প্রচুর ধোঁয়া, প্রচুরতর আড্ডা, কয়েক কাপ চা নিয়ে আড়াই ঘণ্টা সেখানে কাটিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে।

মনে পড়ার কারণ আছে।

প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার প্রথম মুদ্রিত গল্প কোনটা? সমরেশ বসু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তার নাম 'আদাব'। এই গল্প ছাপার কাহিনী শুনলে আপনি হয়ত হাসবেন, কিন্তু আজো সে গল্পের জন্য আমি লজ্জিত নই। এই বয়, আর দু'কাপ চা!"

চা এলো।

সমরেশ বসু বললেন, "তবে শুনুন। তখন উনিশশো ছেচল্লিশ সালের অগস্ট চলছে। কলকাতায় লীগওয়ালারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হাঁক দিয়েছেন। গোটা বাংলা দেশ রক্তাক্ত। তখন থাকি জগদ্দল-আতপুরে, চাকরি করি ইচ্ছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীতে। একদিকে দাঙ্গার ভয়, অপরদিকে ফ্যাক্টরীর উদয়াস্ত খাটুনি। অস্বস্তি ও ভয় ছিল প্রতি মুহূর্তেই জগদ্দল-আতপুরে। তবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক, মুসলমান বন্ধু অনেক। আতপুব-জগদ্দল যে কলকাতার মত কুৎসিত হয়ে উঠবে না, এই ভরসাটুকু ছিল। আর সে অবস্থাতেও আমাদের উদয়ন সঙ্ঘের হাতে-লেখা ম্যাগাজিন 'উদয়ন' প্রতি মাসেই পূর্ণোদ্যমেই বেরিয়ে চলেছে।"

প্রশ্ন করি, "আপনি কি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?"

"না, না, সম্পাদক ছিল আমার বন্ধু গৌর ঘোষ। সে এখন সিন্দ্রি ফার্টিলাইজারএ এক সাধারণ কর্মী। সে লেখার থেকে, লেখা বুঝতো বেশি। তাকে নিয়েই এই কাহিনী। গৌর সম্পাদক, আর আমি? কি নই? গল্পলেখক, অনুলেখক, চিত্রকর, সম্পাদক-মণ্ডলীর সভ্য। আর আমাদের সকলের মাথার ওপরে ছিলেন মাস্টারমশাই, সত্য মাস্টার। তিনি আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও গুরু।

"উদয়ন পত্রিকায় অগস্ট মাসে কী কী লেখা বেরুচ্ছে, তদারক করতে এসে মাস্টারমশাই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সমস্ত লেখারই বিষয়বস্তু হওয়া দরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আমি বেশ গুছিয়ে-

গাছিয়ে পত্রিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য জল-রঙে একটি মেয়ের ছবি আঁকছিলুম। মাস্টারমশাই বললেন, এসব ছবি আঁকার এই সময় বটে! দেশের চারদিকে যখন মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা চলেছে, আর ইংরেজ সাহেবরা মজা লুটছে, তখন তোমার কাগজের এই সুন্দর ছবি কে দেখবে? মাস্টারমশাইয়ের ধিক্কারে সচেতন হলুম। তখনি 'উদয়ন' পত্রিকার বিষয়বস্তু বদলানো হল। নতুন লেখা আমন্ত্রণ করা হল বন্ধুদের কাছ থেকে। তা ছাড়া আমি নিজেও, নিতান্ত নিজের নেশা ও তুষ্টির জন্য কয়েকটা গল্প লিখলাম। এই কয়েকটার মধ্যে 'আদাব' অন্যতম। আর আমার সব জমানো গল্পেরই তখন একমাত্র শ্রোতা গৌর। আর সেই—"

বাধা দিয়ে বলি, "এর মধ্যে আর আশ্চর্যের কি আছে?"

"আহা, আগে শুনুন, তারপর বলবেন। সেই-সব গল্প পড়ার স্থান ছিল গঙ্গার ঘাট। গৌর আমার যে গল্পই পড়ত, সবই ছাপতে পাঠাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠত। আমি বাধা দিতাম। বলতাম, 'কী যে বলিস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়েও কোন সাহসে আমাকে গল্প পাঠাতে বলিস্!'

"গৌর রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করত। বড় বড় চোখ, সুগঠিত টিকলো নাক, উনিশ-কুড়ি বছরের গৌরকে তখন দেখাত ভারী সুন্দর। বলা বাহুল্য, 'আদাব' নিয়ে গৌর জেদ ধরে বসল। 'পাঠাতেই হবে ছাপতে, এবং যেখানে সেখানে নয়, 'পরিচয়' পত্রিকায়। 'পরিচয়ে?' গৌরটা বলে কী? হেঁজি-পেঁজি কাগজ নয়, একেবারে 'পরিচয়ে'! পরিচয় তখনকার বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্র। না, না, কিছুতেই না। গৌরের প্রায় পায়ে ধরেছিলাম। কিন্তু গৌর শুনল না, গল্প 'পরিচয়ে' পাঠানো হয়ে গেল। প্রায় বিবর্ণ মুখে, দুরু-দুরু বুকে, কাঁপা হাতে সেই প্রথম প্রকাশের জন্য গল্প পাঠালাম।

"তারপর কী যে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা! কী অশান্তি, কী অস্বস্তি,

আর কি বিশ্রী অস্থিরতা। এদিকে ফ্যাক্টরীতে উদয়াস্ত খাটুনি। ফ্যাক্টরীতে কাজে মন বসে না, রোজই ভাবি, আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে গিয়ে দেখব, গল্পটা ফেরত এসেছে।"

কথক থামলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। এক গ্লাস জল খেলেন। আমি একটু হাসলাম।

"আপনি ত' হাসবেনই। এদিকে আমার যে কী অবস্থা! মাসখানেক বাদে উত্তেজনাটা জুড়িয়ে গেল। মোটামুটি ধারণা করে নিলাম, অমনোনীত হলেও, ফেরত যে পাঠানোই হবে বা সংবাদ দেওয়াই হবে, এমন কী কথা আছে। আমি তো কোনো ডাকটিকিট পাঠাই নি। মাঝখান থেকে লাভ হল এই, গৌরের ওপর মনে মনে চটে গেলাম। এই জন্যেই তো গল্প কখনো কোনো পত্রিকায় ছাপতে পাঠাই নি।

"তারপরে, একদিন ভোরবেলা, গোগ্রাসে খাবার খাচ্ছি, ফ্যাক্টরীতে হাজিরা দেবার সময় প্রায় নেই। ওদিকে ট্রেন এসে গেল বলে। এক মাইল দৌড়ে তবে রেলস্টেশন। হঠাৎ দেখি, প্রায় মুখ-চোখ ঘষতে ঘষতে, একটা খবরের কাগজ হাতে, অন্য পাড়া থেকে গৌর এসে উপস্থিত।

—কী রে?

—'পরিচয়'-এর শারদীয় বিজ্ঞাপন বেরিয়ে । এই ভাখ। খাওয়া মাথায় উঠল। 'পরিচয়'-এর শারদীয় বিজ্ঞাপন? তা'তে আমার কি? মানে, আমার···আমার ··? ভাবনাটা শেষ হবার আগেই, বিজ্ঞাপনটা গৌর খুলে ধরল আমার চোখের সামনে। প্রায় অবিশ্বাস্য চোখে দেখলুম, 'গল্প লিখছেন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু।' কী কাণ্ড! 'পরিচয়' পত্রিকা, তার ওপরে শারদীয় সংখ্যা এবং ঐসব দিক্‌পাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে! ঠিক আমিই সেই সমরেশ বসু তো?

"গৌরী দেবী খেতে দিচ্ছিলেন। আশা করি, বুঝতে পারছেন, তিনি কে। এর পরে কী ঘটতে পারে, সেটা অনুমান করেই বোধহয় হেসে বললেন, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, ট্রেনের সময় হয়ে গেল।

"আর খাওয়া এবং ট্রেনের সময়! বললাম, আজ কোনো কাজ নয়। গৌর বলল, শুধু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকা, তাড়াতাড়ি চল। দুজনেই ছুটলাম গঙ্গার ধারে। আমার থেকে গৌরের আনন্দই বেশি। দুজনে যে কী বক্‌বক্‌ করলাম বেলা দু-প্রহর ধরে, তা আজ আর মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে আছে, তারপরে চেনা বন্ধুবান্ধব যার কাছেই গেছি সকলেই হাত বাড়িয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছে।- আপনি 'আদাব' গল্প পড়েছেন ?"

উত্তর দিই, "অবশ্যই পড়েছি। ঢাকার রক্তাক্ত দাঙ্গার পটভূমিতে দুটি-চরিত্র। বুড়িগঙ্গায় কেরায়া নায়ের মাঝি ও নারায়ণগঞ্জের সুতা-কলের মজুর, একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। এই রক্তাক্ত দাঙ্গার পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদীর হাত আর রিভলভার সক্রিয় ছিল, আপনি সেটাই দেখিয়েছেন। 'আদাব' পড়লে ভুলে যাওয়া কঠিন। আমার মনে হয়, এই গল্পের প্রয়োজন আজো ফুরোয় নি।"

সমরেশ বসু চুপ করে শুনলেন, কোনো প্রতিবাদ করলেন না। কেবল রেস্তোরাঁর বৃদ্ধ 'বয়'-এর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'দু কাপ চা দাও।'

অন্য আর একদিনের কথা। বই-পাড়ায় নিরালা অবসর পাওয়া সুকঠিন, কেউ না কেউ এসে আপনার নিভৃত অবসর বা বিশ্রম্ভালাপ ভেঙে দেবে, মুহূর্তের মধ্যে দুজনের নিভৃত আড্ডা হাটে পরিণত হবে। তাই এক সন্ধ্যায় সমরেশ বসুকে নিয়ে চলে গেলাম সেনট্রাল অ্যাভিন্যুর কফিখানায়। চট্ করে আর কেউ খুঁজে পাবে না।

নানা কথার মধ্যে কথা হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের—যে লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে নোতুন জিজ্ঞাসা ও আয়তন দিয়েছেন।

সেদিন সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছিলেন। চোখ বুজে সিগারেটে টান দিলেন, কয়েকটি মুহূর্ত হয়ত বা সেদিনের ছবি মনশ্চক্ষুতে দেখে নিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, "আপনি বউবাজারে বেঙ্গল পাবলিশার্সের আপিসে গিয়েছেন ? ও, তাহলে তো জানেনই, সেই কাঠের সিঁড়ি। এক দুপুরে আমি নামছি, মানিকবাবু উঠছেন। বললেন, 'সমরেশ, আমার হাতটা ধরো।' বুঝলাম সিঁড়ি বেয়ে উঠতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। হাতটা ধরে তাঁকে উঠতে সাহায্য করলাম। বললেন, 'কেনই বা সিঁড়ি বেয়ে উঠি আর নামি। ওঠা-নামা আর কোনোটাই জীবনে পারি না। তবু কে আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। উঠতেই হয়। শচীনবাবুর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা আনতে হবে, তাই উঠতে হচ্ছে। আর পাবি না।' সেদিন মানিকবাবুব এই কথায় কষ্ট পেয়েছিলাম।

"তাবপর মানিকবাবু মারা গেলেন। খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না এই মৃত্যু। তবু এই মৃত্যুসংবাদে অভিভূত, স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মানিক-স্মরণ সভায় ভীড় দেখে বুঝলাম, মানিকবাবু কতো প্রিয় লেখক ছিলেন। সেই সভায় আমি কয়েকটি কথা বলেছিলাম এবং তা বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। আজো তা মনে আছে। জানি না, হঠাৎ কে এইকথা আমাকে দিয়ে ব 'লো—'আমাদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুঃখী ও সাহসী লেখক বোধ হয় আর কেউ নেই।' আজো একথা আমি বিশ্বাস করি।"

সেদিন লেখকদের কথাই হচ্ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে সুবোধ ঘোষ —এইসব শক্তিমান অগ্রজের কথা সমরেশ বসু বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে 'বনফুলে'র কথা উঠল। দেখা গেল, বনফুল সম্পর্কে আমাদের দুজনের ধারণায় মি· আছে। মানুষ বনফুলের প্রতি আমাদের আকর্ষণ কতো প্রবল, তার পরিচয় সেদিন পেলাম।

সমরেশ বসু সোৎসাহে বললেন, "তবে শুনুন আমার অভিজ্ঞতা। ভাগলপুরে মহিলা কলেজের সভায় বক্তৃতা করতে গিয়েছি। সেখানে এক অধ্যাপিকা আমার হোস্টেস্। তাঁকে বললাম, 'ভাগলপুরে এসেছি, বলাইদার (বনফুলের) সঙ্গে দেখা করতে চাই।' সভা বিকেলে, এটা সকালের ঘটনা। তিনি আমায় বনফুলের বাড়িতে,—না, ডিস্‌পেন্‌সারীতে নিয়ে গেলেন। খালি গায়ে বনফুল বসে। প্রণাম করলাম। দাদা বললেন, 'ও এসেছ, তঃ ভাল হয়েছে। স্নান হয়েছে? তা আমার বাড়িতেই স্নান হবে।' সামনে এক ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললেন, 'যা বাড়িতে মুর্গী রান্না করতে বলগে। সমরেশ আমার এখানে খাবে।' আমি ত অবাক, অধ্যাপিকা হতবাক্। আমি বললাম, 'দাদা, এঁরা আমাকে এনেছেন, এঁদের সভার জন্যই আমি এসেছি। আমাকে—' বনফুল ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে?' তারপরই আমার হোস্টেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন যাও, বিকেলে সমরেশকে আমি সভায় নিয়ে যাব।' অধ্যাপিকা প্রতিবাদ করার সুযোগ মাত্র পেলেন না। দাদা তখনি ডিস্‌পেন্‌সারী বন্ধ করলেন। বাড়িতে গেলাম। বৌদিকে বললেন, 'সমরেশ এখানে এসেছে। 'আর আমার বাড়িতে ওঠে নি। চালাকিটা দেখেছ। ওকে ছাড়া হবে না। এখানেই থাকবে, খাবে।' তার পর খেতে বসে যন্ত্রণা! অনবরত দাদার ধমক—'না, না, ওটা খাও! হুঁঃ! খাবে না! কেন খাবে না! আমি বল্‌ছি খেয়ে নাও। হুঁঃ! খেয়ে নাও, খেয়ে নাও।' তারপর খেয়ে উঠে খানিকটা বিশ্রাম। তারপরই আদেশ—'চলো, বেড়িয়ে আসি। সভা-টভা পরে হবে। চলো, চলো। না বেড়ালে ক্ষিদে হবে কেন? চলো, চলো, রাতে ফিরে খেতে হবে তো।' সেবার অনেক কষ্টে দাদার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম।"

শুনে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'দাদা, আমাকে ভাগলপুর যেতে

লিখেছেন। চলুন। এক সঙ্গে যাই।' শুনেই সমরেশ বসু আঁৎকে উঠলেন, বললেন, "ওরে বাবা! আবার! গেলেই একসঙ্গে ছুটো মুরগী খেতে হবে। না, সে আমি পারব না। আমি পালাই।" বলে উঠে পড়লেন। হাসতে হাসতেই আমরা বিদায় নিলাম। ভাগলপুরের আমন্ত্রণটা এখনো রয়েছে, সঙ্গীর অপেক্ষায় আছি।

শ্রীরমাপদ চৌধুরী

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে। আজ আর কেউ তাঁকে স্মরণ করে না, তাঁর শরণ নেয় না। এখন যা করে তা হল, সংস্কারের দাসত্ব, ধর্মাচারের অন্ধ আনুগত্য। আমরা যে-জগতে বাস করি, তা ঈশ্বরহীন জগৎ। আমাদের কোনো অবলম্বন নেই। দেখুন না কেন, আমাদের সংস্কৃতির অভিমান কত অগভীর কত দুর্বল। এবং তা কত অর্থহীন।"

কথাগুলি বলছেন একালের প্রিয় লেখক রমাপদ চৌধুরী। চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন, লেখা স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল। দশজনের ভীড়ে লেখককে চেনা যায় না, দশটা লেখার মধ্য থেকেও তাঁর লেখা চিনে নেওয়া কঠিন নয়। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি। এক পাড়ার লোক বলেই তাঁর বাড়িতে প্রভাতী আড্ডার অবসর পাই।

"আমি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরেছি। তা থেকে আমার মনে হয়েছে, বাঙালির মতো শ্রদ্ধাহীন কর্মহীন জাত আর নেই। কোনো কিছুর প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা নেই—না ধর্মে, না পূর্বপুরুষে, না জাতীয় নেতৃত্বে। সবটাই হুজুগ। আর অলস বাক্যালাপে আমাদের জুড়ি নেই, আড্ডায় আমাদের ক্লান্তি নেই, পরচর্চায় উৎসাহের কমতি নেই। আপনি ত প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াচ্ছেন। আমি দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি, হিন্দুহস্টেলে থেকেছি। কিন্তু আমাদের সময়ে এখনকার মতো এত আড্ডা ছিল না।" পরক্ষণেই রসিকতা করে বললেন, "বোধ হয় বইপাড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কফিহাউস ছিল না বলেই

এত আড্ডার সুযোগ ছিল না। আজকাল তো ওপাড়ায় গেলে কিরকম অচেনা ঠেকে। আপনি কি বলেন?"

কি আর বলব? সমর্থনের মৃদু হাস্য ছাড়া আর কিছু আমার হাতে নেই।

"আজকাল হিন্দু হস্টেল কি সেই রকমই আছে? তেমনি নির্জন নিস্তব্ধ মনোরম শ্যামল? সেদিন হিন্দু হস্টেল আর তার পরিবেশ কী চমৎকার লাগত! আশেপাশে বড় বড় বাড়ি ছিল না। বেকার ল্যাবরেটরি তখন ছোট ছিল। ছিল না সোশ্যাল সায়ান্স ইনস্‌টিটিউটের বাড়ি, ছিল না বেকার ল্যাবরেটরির দীর্ঘ-প্রসারিত পশ্চিম বাহু।"

মৃদু হেসে বলি, "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না!"

উত্তরে রমাপদ চৌধুরী স্মিত হাসি হাসলেন। বললেন, "তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন গণিতে র‍্যাংলার শ্রীবি. এম. সেন। হস্টেলের সরস্বতী পুজোয় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। তিনি আমাদের উৎসাহ দিতে হস্টেলে আসতেন। আসতেন আর একজন।

"সরস্বতী পুজোর দিন সেই মহৎ বাঙালিকে হস্টেলে দেখেছিলাম। হস্টেলের মাঠে ত্রিপল টাঙিয়ে প্যাণ্ডাল হয়েছে। তার মধ্যে প্রতিমা। পুজো হয়ে গেছে। প্রায় দুপুর। যে যার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি—সন্ধ্যায় নাটকের অভিনয় হবে, তার কথা হচ্ছে। কে যেন ডাকলেন,—আচার্য এসেছেন, শিগ্‌গীর এসো। দুদ্দাড় করে নেমে গেলাম। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ইনিই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়? গায়ে একটি চাদর, লুঙির মতো করে ধুতি পরেছেন।

শীর্ণকায় রুগ্ন মানুষটি একটি ছাত্রের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন প্রতিমার কাছে। আমরা প্রণাম করতেই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন!

অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে আচার্য বললেন, এখনো তেমনি কমল-কোমল মুখ কেন হে মায়ের ? তেজ থাকবে তো চোখে ?

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, পুজো তো স'পাঁচ আনায় সারবে, না কি হে ? বাকি সব হৈ হুল্লোড়, কেমন ?

কথাটা শুনে লজ্জা পেলাম। এ'কথা তো মিথ্যে নয়। পুজোয় চাঁদা উঠত হাজার দেড়েক টাকা। আমাদের নিরুত্তর দেখে বললেন, এই টাকায় একটা ছেলে ভাল করে পড়াশুনো করে এসে দেশের জন্যে কিছু করতে পারত হে!

আচার্যের কথাটা সত্যি, কিন্তু মনে হল তিনি যেন আমাদের ফুর্তিটুকু কেড়ে নিতে চান। বোধ হয় তিনি আমাদের মনের কথা বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন, না, না, এসবও থাকবে বইকি, এসবও থাকবে।

তারপর হাতের কাছে একটি ছাত্রকে উদ্দেশ করে বললেন, স্বাস্থ্য ভাল কর। শুধু মুখ গুঁজে বই পড়ে কি হবে ? স্বাস্থ্য ভাল কর।

মিনিট কয়েক পরে তিনি চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরেও আমরা অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম ফটকের বাইরে।"

গল্প শুনে চুপ করে রইলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, "আর কোন বাঙালিকে দেখে আপনি অভিভূত হয়েছিলেন।"

রমাপদ চৌধুরীর তৎপর উত্তর—"রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষচন্দ্র। এই তিনজনকে দেখে আমার সাধ মিটে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র—বলুন, এরপর আর কী দেখার আছে ?"

মানতেই হ'ল কথাটা। বললাম, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার কি রকম আলাপ ছিল ?"

রমাপদ চৌধুরী হাত নেড়ে বললেন, "না, না, আলাপ বললে যা বোঝায়, তার কিছুই না। আমার কৈশোরের এক মধুর স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ। আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন। খড়্গপুরে রেল কোয়ার্টার্সে আমরা থাকতাম।

ভোরের দিকে প্রতিদিন সাহেব-পাড়া দিয়ে বেড়াতে যেতাম কয়েক বন্ধু মিলে। ঐ পাড়াটি ছিল নিস্তব্ধ, পরিচ্ছন্ন, পিচঢালা চকচকে চওড়া রাস্তা। ভারতীয়দের সে এলাকায় বাস ছিল না। সায়েব আর ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব। ঐ সুন্দর পথগুলির দুপাশে ছিল মহানিম, দেওদার, অশোক, অর্জুন, শিরিষ, কৃষ্ণচূড়া। আমরা তিন-চারটি কিশোর সেই সব পথ ধরে বেড়াতে যেতাম।

এই পথেই একটি বিচিত্র ফুল আবিষ্কার করেছিলাম। যার নাম জানি না, যা আগে দেখি নি, যা-কিছু ভালো, যা-কিছু বিরল-·তাই ছিল আমাদের কাছে বিলিতী। ফুলটির নাম দিয়েছিলাম বিলিতী চাঁপা। কী সুন্দর সেই ফুল! লম্বা লম্বা আঙ্গুলের মতো চারটে কবে পাপড়ি। স্পঞ্জের মত নরম, ঈষৎ সোনালি হলুদ রঙ, আর কা মিষ্টি গন্ধ। আসলে ফুলটির নাম আমরা জানতাম না।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে ফুলের নামটি জানিয়ে ছিলেন।"

ঈষৎ কৌতুক আর অবিশ্বাসে বলি, "বলেন কি, রবীন্দ্রনাথ আপনাকে ফুল চিনিয়েছেন?"

রামপদ চৌধুরী একটু হেসে বললেন, "ভোরের দিকে প্রতিদিন সাহেব-পাড়া দিয়ে বেড়াতে যেতাম। বিলিতী চাঁপা কুড়োতাম। তারপর যেতাম স্টেশনে। খড়্গপুরের দীর্ঘ প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মে কৃষ্ণচূড়া গাছ। ফেরবার পথে ঐ গাছ থেকে এক ডাল কৃষ্ণচূড়া ভেঙে নিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

সেদিনও দুহাতে কৃষ্ণচূড়া আর সেই বিলিতী ফুলের রাশি বুকে চেপে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি ভোর বেলায়। দেখলাম ডাউন পুরী এক্সপ্রেস এসে দাঁড়াল। গাড়ির জানালা-গুলোর ওপর দিয়ে চোখ পিছলে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে থামল।

সে দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। সে মনের ভাব প্রকাশের ভাষা আমার নেই। এক মুহূর্তেই চিনতে পারলাম। কে না চেনে ঐ

রূপবানকে। ফার্স্টক্লাস কামরার জানলা থেকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

অভিভূতের মতো কাছে এগিয়ে এলাম। নির্লজ্জের মতো সেই দেবদুর্লভ রূপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। সেই ভোরে দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল। সকলেই চিনতে পেরেছে। দেখি দু-একজন হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে হঠাৎ ছুটতে-ছুটতে চলে গেল সামনের তার-ঘরে। একটা খাতা নিয়ে এসে কি যেন বললে তাঁকে। তিনি হাসলেন, অটোগ্রাফ দিলেন।

তা দেখে আমার সাহস এলো। কামরায় উঠে গিয়ে ফুলের রাশি নামিয়ে দিতে গেলাম তাঁর পায়ে। মৃদু হেসে ফুলগুলি তুলে নিলেন তিনি দু-হাতে, তারপর সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের একটি প্রশ্ন শুনলাম, 'মুচকুন্দ? কোথায় পেলে?'

জবাব দেবার আগেই ঘণ্টা বাজল, নেমে পড়লাম। তিনি কী যেন বললেন। ট্রেন ছেড়ে দিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। সস্নেহ হাসি দেখলাম তাঁর মুখে, আমার সেই বিলিতী ফুলের ঘ্রাণ নিলেন। সে যে কী আনন্দ তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। সে এক অপার্থিব আনন্দ। এক ফিরিঙ্গী সায়েব আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, লাকি চ্যাপ।

রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রথম দেখলাম, তাঁর কাছেই মুচকুন্দের নাম শিখলাম। তিনি আমায় ফুল চিনিয়ে ছিলেন।

তাঁকে দ্বিতীয় ও শেষবার দেখলাম, তিরোধানের পরে, বাইশে শ্রাবণ। সারা কলকাতা সেদিন পথে নেমে এসেছে। মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় করে রবীন্দ্রনাথ অমর্ত্যলোকে যাত্রা করলেন সেদিন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শবযাত্রা এগিয়ে আসছে। অসংখ্য শোকাচ্ছন্ন মানুষের ভীড়, দূর থেকে দেখলাম ফুলের শয্যায় শায়িত মুদিতনয়ন প্রশান্ত রবীন্দ্রনাথকে।

ধীরে ধীরে সেই দেবদুর্লভ রূপ চিরদিনের মতো দৃষ্টি থেকে অপসৃত হয়ে গেল।"

স্মৃতিভারাচ্ছন্ন কথক থামলেন।

অন্য এক সকালের আড্ডা।

সাহিত্যপত্র সম্পাদনার কথা হচ্ছিল। রমাপদ চৌধুরী জানালেন, তিনি বেশ কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। "Life of India", "ইদানীং", "রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা", আরও কিছু কাগজ।

বললেন, "জীবনে অনেক কাজ করেছি। মাছ-ঘি-এর ব্যবসা, চাকরি, পত্রিকা-সম্পাদনা, বীমা-এজেন্সী—নানা ধরনের কাজ করেছি। আবার অনেক সময় বিশুদ্ধ বেকার হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। রাচী, মুরী, বিলাসপুর, গৌহাটি, ডিব্রুগড়, রায়পুর, রামগড়, আরগাডা, মহুয়ামিলন, বরকাকানা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তিনটি মাস কাটিয়েছিলাম বিলাসপুর রায়পুর। আমার প্রথম দিককার বহু গল্পে এই অঞ্চলের পটভূমি আছে। বিলাসপুরী মানুষগুলিকে ভাল লাগত। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে তিন মাস কাটিয়েছি মুরীতে। সেখানকার মুণ্ডাদের জীবন আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। তারপর ১৯৪৭-এ জীবিকার সন্ধানে কাটিয়েছি হাজারী-বাগ অঞ্চলে আরগাডা মহুয়ামিলন বরকাকানায়। নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত মহানগরীতে।

"আমার এই ভ্রাম্যমাণ জীবনের পিছনে আমার কোনো হাত ছিল না। যাকে আমরা দেখতে পাই না, যার পরিচয় জানি না, যার সঙ্গে লড়াই করতে পারি না, সেই ভাগ্য আমাকে বার বার ঘুরিয়েছে। ভাগ্যের হাতে শাস্তি ও পুরস্কার দুই-ই পেয়েছি।"

বাধা দিয়ে বলি, "তাহলে তো আপনি নিয়তিবাদী, fatalist।" কথক বললেন, "একথা যদি বলেন আমি আপত্তি করব না। যুক্তি

ধিয়ে সব নস্যাৎ করে দিই ; অথচ মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষ তার ভাগ্যের নির্দেশ এড়িয়ে যেতে পারে না।”

বললাম, “আপনার কখনো তা মনে হয়েছে ?”

কথক বললেন, “যখন চাকরীর সন্ধানে ঘুরেছি, তখন চাকরী পাই নি। যখন চেষ্টাশেষে নিরস্ত হয়েছি তখন ভাগ্য আমার হাতে চাকরি তুলে দিয়েছে।”

রমাপদ চৌধুরী মৃদু হাসলেন। “একবার পুজোর আগে এক প্রবাসী সাহিত্যিক কলকাতা এসেছেন। আমি গিয়েছি দেখা করতে। কথায় কথায় তিনি বললেন,—তোমার কোষ্ঠীর ছক মনে আছে ?

“বললাম। তিনি তখনি তা বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। এক, আমার শিশু কন্যার আসন্ন দুর্ঘটনা। দুই, কর্মক্ষেত্র অশুভ।

“মাসখানেক পরের কথা। অষ্টমী পুজোর দিন সেটা। সন্ধ্যের সময় দুর্ঘটনা ঘটলো, সাজগোজ করে মেয়েটি প্রতিমা দেখতে বেরোবে, কোত্থেকে কি হয়ে গেল, এক কড়াই ফুটন্ত দুধ এসে পড়লো ওর সারা শরীরে।”

একটু থেমে বোধ হয় সেই দুঃসহ দৃশ্যটা মনের চোখে দেখে নিলেন একবার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “সে যা দিন গেছে একটা মাস, কল্পনা করতে পারবেন না। তার জীবন নিয়ে টানাটানি চললো একমাস, সারাটা দিন পি. জি. হসপিটাল আর বাড়ি, বাড়ি আর পি. জি. হসপিটাল। মাঝে মাঝে ওষুধের দোকান, ডাক্তার, ব্লাড-ব্যাঙ্ক।”

আতঙ্কের ছায়াটা যেন ধীরে ধীরে সরে গেল তাঁর মুখের ওপর থেকে। হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, “জানেন না, বোধ হয়, এই ঘটনার এক সপ্তাহ আগে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেছি ‘বনপলাশির পদাবলী’। একটি মাত্র কিস্তি ছাপা হয়েছে,

আর এক লাইনও লেখা হয়নি। অথচ দু'তিন দিনের মধ্যে পরের সপ্তাহের কিস্তি লিখে দিতে হবে। পুজো সংখ্যার কাজের চাপে উপন্যাস সম্পর্কে কিছুই ভাবতে পারি নি, এখন আবার অন্য দুশ্চিন্তা।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এরই মধ্যে লিখলেন ?"

উত্তর এলো, "লিখতে হলো। উপন্যাস আরম্ভ করেই তার পরের সপ্তাহে 'অনিবার্য কারণ' দেওয়া যায় না।"

বললাম, "বইটা পড়ে কিন্তু বোঝাই যায় না এমন দুশ্চিন্তার মধ্যে লেখা।"

রমাপদ বাবু হাসলেন।—"ঐ একটা দুর্ঘটনা নয়, বলতে গেলে এ-উপন্যাস লিখতে নিয়ে পদে পদে বাধা পড়েছে, মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মুস্কিল কি জানেন, পাঠকরা উপন্যাস পড়ে সাহিত্যের বিচার করেন, নাক সিঁটকে বলেন, বাজে লেখা, তখন ভিতরের ইতিহাস জানতে চান না।"

আমি হেসে বললাম, "এত বাধা পড়েও তো এটাই আপনার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অথচ একাগ্র মনে লিখেছেন, কোন বাধা পড়েনি, সে লেখা হয়তো সত্যিই উৎরোয় নি।"

রমাপদ চৌধুরী ভুলে-যাওয়া প্রশ্নটিকে এবার ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, "সেই জন্যেই তো কখনো কখনো ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।"

আমি হেসে বললাম, "অর্থাৎ কুসংস্কারে বিশ্বাস ?"

"হ্যাঁ। আমি তো বলেছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছি আমরা সকলেই, কিন্তু কুসংস্কারকে জয় করতে পারিনি। এই দেখুন না, চার বছরের কন্যাটির দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী মিললো, সেটাকেই বড় করে দেখি আজও, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অশুভ না হয়ে বরং উন্নতি হলো, তবু সেটাকে দাম দিলাম না।"

একটু থেমে বললেন, "সবচেয়ে বড় রহস্য কি জানেন ? চেষ্টা

করে যা পাই না, চেষ্টা না করেও অনেক সময় তা পেয়ে যাই। ভালো লেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই, আর দায়সারা লেখারও খ্যাতি শুনতে পাই। যে নামই দিন, ভাগ্য ছাড়া কি?"

একটু থেমে বললেন, "যুক্তি তো শুধু সব বিশ্বাস নির্মূল করার জন্যে নয়, নোতুন বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যে। তা আমরা পারি নি, আবার ঈশ্বরে বিশ্বাসও হারিয়েছি। এ-যুগের মানুষের তাই ভাগ্যই সম্বল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

আর একদিনের আড্ডা।

রমাপদ চৌধুরী গল্প লেখার গল্প করছিলেন। তাঁর দুই সহপাঠী বন্ধু প্রাণতোষ ঘটক আর স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন— "কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পাবলিক রেস্তোরাঁয় বসে তিন জনে মিলে পরস্পরের গল্প শুনতাম, তারপর নৃশংসের মত ধারালো সমালোচনা-ছুরিতে তা টুকরো-টুকরো করে ফেলতাম। এইভাবেই আমরা তিন বন্ধু গল্প লিখতাম আর ছিঁড়ে ফেলতাম। নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত শর্ত হয়েছিল যে, অপর দুজনকে না পড়িয়ে, তাদের সম্মতি না নিয়ে কেউ আমরা কোথাও গল্প পাঠাব না।

"কিন্তু একদিন একটা ছোট গল্প লিখে ভাবলাম, দিই পাঠিয়ে, দেখি না কী হয়। দুজনকে না জানিয়েই পাঠিয়ে দিলাম। শর্ত ভঙ্গ করলাম।

"গল্পটার নাম 'উদয়াস্ত'। ছাপা হয়ে গেল, যুগান্তর সাময়িকীতে। কিন্তু বাকি দুজন অভিযোগ করল না, কারণ ওই একই সপ্তাহে 'আনন্দবাজারে' বের হল প্রাণতোষের গল্প, আর স্বরাজের গল্প অন্য কোনো কাগজে। সেই প্রথম বোধ হয় আমরা বাইরের জগতে বেরিয়ে এলাম।

"তারপর দু'তিন বছর হাসির গল্প লিখেছি।"

"তখনকার দিনের সবচেয়ে আধুনিক সাহিত্যপত্র ছিল 'পূর্বাশা'

আর 'চতুরঙ্গ'। তখন এম. এ. পড়ছি। ভাবলাম, 'পূর্বাশা'য় গল্প ছাপাতে না পারলে লেখাই বৃথা।

অসংখ্য সংশোধনের পর 'পূর্বাশা'য় গল্প পাঠালাম, বেরিয়ে গেল গল্প, নাম 'রত্নকূট'। কিন্তু তা পড়ে কেউ প্রশংসা করল না। তখন আবার লিখলাম। আবার সংশোধন, সংশয়, অসন্তোষ। ফের পাঠালাম 'পূর্বাশা'য়। গল্পের নাম 'চন্দ্রভস্ম', ছাপা হল। পূর্বাশা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনুরোধ-পত্র পেলাম। দেখা করার অনুরোধ।

তাঁর পোষ্টকার্ড পকেটে পুরে 'পূর্বাশা' অপিসে অনেক সংশয় আর ভয় নিয়ে হাজির হলাম একদিন। গিয়ে দাঁড়ালাম। সঞ্জয়বাবু প্রশ্ন করলেন—কি চান আপনি?

বললাম—আমি রমাপদ চৌধুরী।

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন। সঞ্জয়বাবু হাঁকডাক শুরু করলেন—আপিসের সকলকে ডাকলেন, প্রত্যেককে দেখালেন, ইনি রমাপদ চৌধুরী, ইনিই রমাপদ চৌধুরী। তারপর বললেন, প্রেমেনবাবু আপনার গল্প পড়ে একটু আগেই ফোন করেছিলেন। খুব প্রশংসা করেছেন। বুঝতে না পেরে বললাম, প্রেমেনবাবু কে?

সঞ্জয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, কেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

বললাম, ও।

কিন্তু তাতে কী হয়েছে। তিনি যে এক· া বিশিষ্ট লেখক, তা তখন জানতাম না, জানতাম তিনি সিনেমার ডিরেক্টর।

ফিরে এসে আমার এক সমালোচক-বন্ধুকে ঘটনাটা বললাম। জিগ্যেস্ করলাম,—প্রেমেন্দ্র মিত্র কেমন লেখেন রে?

বন্ধু অবাক হয়ে বলল, বল্লিস কি তুই? ওঁর লেখা পড়িস নি।

উত্তর দিলাম, দু-একটা কবিতা পড়েছি।

—সে কি গল্প পড়িস নি?

—না তো।

বন্ধু হতবাক্। শেষে যখন সে বাক্শক্তি ফিরে পেল, তখন বলল,—লেখা ছেড়ে দে তুই। তোর হবে না।

আমি কেবল বললাম,—'কিন্তু তিনিই যে ফোনে বলেছেন, আমার হবে।'

রমাপদ চৌধুরী থামলেন, গল্প শুনে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হল। কথক নিজেও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

শ্রীপ্রফুল্ল রায়

মনে পড়ে, একটি শীতের সন্ধ্যা। ১৯৫৬ সালের জানুআরি। বই-পাড়ায় একটি বইয়ের দোকানে সেই শীতের সন্ধ্যাটি আড্ডার মৌতাত পেয়ে জমে উঠেছিল। বাইরের অতিথি ছিলেন একজন। তিনি লখনউর শ্রীদ্বিজেন্দ্র সান্যাল ওরফে সর্বজনীন দ্বিজুদা। সেই আড্ডায় এক প্রবীণ লেখক দ্বিজুদার সঙ্গে এক নবীন লেখকের আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ইনি প্রফুল্ল রায়, 'পূর্বপার্বতী'র লেখক।'

দ্বিজুদার সবিস্ময় উত্তর, 'অ্যাঁ! এই বাচ্চা লেখকের এই ঢাউস বই! এ যে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি!' হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে দ্বিজুদা যে-কথাটি বলেছিলেন, তরুণ লেখক প্রফুল্ল রায় সম্পর্কে সেটি সত্য কথা। এই নবীন লেখক সেদিন তিরিশ পেরোন নি, কিন্তু সেদিনই 'পূবপার্বতী' আর 'সিন্ধুপারের পাখি' লিখে বাংলা উপন্যাসের দিগন্তকে প্রসারিত করেছিলেন।

আজ প্রফুল্ল রায় তিরিশ উত্তীর্ণ হয়েছেন, এদিকে বইয়ের সংখ্যা ডজন পেরিয়েছে। 'নতুন দিন,' 'দূরের বন্দর', 'পূর্বপার্বতী', 'সিন্ধু-পারের পাখি', 'নোনা জল মিঠে মাটি', 'মাটি আর নেই', 'মরশুমের গান', 'তাসের মিনার', 'নদীর মত', 'সাধের শারিকা', 'আকাশের সীমা নেই', 'সীমারেখার বাইরে'—এই বারোটি উপন্যাস আর 'অন্তরঙ্গ', 'রূপসীর মন', 'হৃদয়লতা'—তিনটি গল্পগ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে অন্ততঃ চারটি পৃথুলকায়, দুঃসাহসিক, উচ্চাশী। এখন তাঁর সামনে পড়ে আছে জীবনের সুবিশাল ক্ষেত্র। লেখকের কাছে আকাশের সীমা নেই। তাঁর অভিসার সীমারেখার বাইরে, যেখানে মাটি আর নেই, নোনাজলের

সীমাহীন বিস্তার। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, নাগাদেশ, দণ্ডকারণ্য, সুন্দরবন—যেখানেই প্রকৃতি ও মানুষ আদিম রূপে বর্তমান, সেখানেই এই তরুণ লেখকের পদক্ষেপ, নির্ভুল পর্যবেক্ষণ আর নিখুঁত জীবনচিত্রণ।

এই তরুণ লেখক কেবল সুলেখক নন, সুকথক। জমিয়ে আড্ডা দিতে, হরেকরকম গল্প করতে ও রাজাউজীর বধ করতে তাঁর কখনো ক্লান্তি ঘটে নি। আমার বাড়িতে যে সান্ধ্য আড্ডা বসে সেখানে প্রফুল্ল রায় অনিয়মিত সদস্য। কিন্তু যেদিন প্রফুল্ল রায়ের আগমন, সেদিন অন্য কথকেরা চুপ, একা তিনিই গান ধরেন।

প্রফুল্ল রায় লিখতে শুরু করেছেন মাত্র দশ বছর আগে, ১৯৫৪ সালে। এক সন্ধ্যার আড্ডায় বলেছিলাম, "আপনি লিখতে এলেন কেন?"

প্রফুল্ল রায় জোড়হাতে বলেছিলেন, "আপনি বিশ্বাস করুন, লেখক হবার স্বপ্ন আমার ছিল না। এপিকের তোরঙ্গ দেখে আমি দৌড় দিয়েছিলাম।"

আড্ডার নিয়মিত সদস্য বাচ্চু সেনমশায় গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "এপিকের তোরঙ্গটা কী? খুইল্যা কন?"

কথক এবার জমিয়ে বসলেন।

"হ্যাঁ। তাই বল্‌ছি। তখন আমরা কালীঘাটে থাকি। টালিগঞ্জের পুরনো পাড়ায় দুই লেখককে দেখতে যাই মাঝে মাঝে। লেখক-সান্নিধ্যে এসেই ধন্য হয়ে যাচ্ছি বলে মনে করতাম। তার বেশি কিছু নয়। তাঁদের নাম? এই ধরুন, অ-বাবু আর ক-বাবু।

"একদিন ক-বাবুর বাড়ি গিয়েছি। আমি, আমার বন্ধু, তখন দুজনেই হাফ-প্যাণ্ট পরা, আর অ-বাবু। ক-বাবু বললেন, 'আস, আস। আইজ এট্টা কথা কমু।' কথা কী? কিছুই বুঝি না। ক-বাবু তাঁর মেয়েকে ডেকে বললেন, 'শিগ্‌গীর পরটা আর আলুর দম বানা।' ছেলেকে ডেকে আদেশ দিলেন, 'মোড়ের দোকান

থিক্যা এক টাকার রসগোল্লা লইঅ্যা আয়।' ভাবছি, এত আয়োজন কেন? ক্রমে ক্রমে পরটা, আলুর দম, রসগোল্লা এলো। পরিতোষ-পূর্বক জলযোগ হ'ল। তখনো ভাবছি, কী ব্যাপার? 'ক-বাবু ছেলেকে আদেশ দিলেন, 'যা, ভাঙা মসজেদের সামনে মাদুরটা বিছাইয়া থো।' তারপর বললেন, 'খাটের তল থিক্যা এপিকের তোরঙ্গটা বাইর্ কর্।' দুই নির্দেশ পালিত হ'ল। আমরা মাঠে মাদুরে বসলাম। সামনে হারিকেন, তোরঙ্গ আর ক-বাবু।

"ক-বাবু গোড়ায় একটু ভূমিকা করলেন। বললেন, 'আইজকাল এপিকের যুগ আর নাই,—এই কথাডাই বেবাক লোকে মাইন্যা নিছে। কিন্তু এইডা ঠিক না। অখনো জিনিস আছে, বিষয়বস্তু আছে ল্যাখনের লোক নাই। হ্যাহ, নেতাজীর ইম্ফল অভিযান—এইডা কি কম কথা? আমি এই ঘটনা লইঅ্যা একখান্ এপিক লেখ্‌ছি। আইজ তোমাগো শুনামু।' এই কথা বলে তোরঙ্গ খুলে—ওরে বাবা—একটা বিরাট পুঁথি বার করলেন। উঁকি মেরে দেখি, তোরঙ্গের মধ্যে ঐ রকম আরো তিনটে জাব্‌দা খাতা আছে। সর্বনাশ! এখন উপায়? সারারাত ধরে এই এপিক শুনতে হবে! কি কুক্ষণে যে পরটা-আলুর দম-রসগোল্লা খেয়েছিলাম।"

শুনে আড্ডার সকলের হাস্য। কথক করুণকণ্ঠে বললেন, "আপনাদের তো হাসি পাবেই, আমার অবস্থাটা ভাবুন।"

আড্ডার অপর নিয়মিত সদস্য বিনয়রঞ্জন ঘোষ মশায় বললেন, 'কেমুন ঠ্যাহে?'

'আর ঠ্যাহে! আমার তখুন আর কিছুই ভাল ঠ্যাহে না।'

কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের পর কথক ফের শুরু করলেন।

"তারপর ক-বাবু সেই এপিক 'নেতাজীর ইম্ফল অভিযান' পড়তে শুরু করলেন। পাঁচালী ধরনের লেখা। পয়ার ছন্দে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে ক-বাবু পড়ে যেতে লাগলেন। আমরা নাচার হয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছি। হঠাৎ অ-বাবু বললেন,

ঈশ্‌শ্‌। একেরে ভুইল্যা গিছি। অখনি যাইতে অইব।' বলেই চকিতে অন্তর্ধান। ক-বাবু একটু দমে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'তা যাউক। তুমরা দুইজন শুন।' বলে আবার পড়তে লাগলেন। আধঘণ্টা গেল। হঠাৎ দেখি, আমার বন্ধু তপন অন্ধকারের সুযোগে নিঃশব্দে উঠে সাঁকো পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বুঝুন, আমার অবস্থা। এই শর্মা তখন একা, নিরুপায়, বিপদাপন্ন।'

আড্ডার সকলে হেসে উঠলেন। বললাম, 'কাপালিকের হাতে নবকুমার শর্মা।' হাসির দমকে ঘর কেঁপে উঠল।

প্রফুল্ল রায় বললেন, "দুঃখের কথা আর বলেন কেন। আরো একঘণ্টা। ততক্ষণে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পড়া হয়েছে। এপিক শেষ হতে রাত ভোর হয়ে যাবে। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, 'আমায় আজকে ছেড়ে দিন। রাত দশটা হল। বাড়িতে বকুনি দেবে। আমায় ছেড়ে দিন।' এইভাবে কাকুতি মিনতি করে বহু কষ্টে ছাড়া পেয়ে দৌড়। দৌড়—দৌড়—একেবারে সোজা বাড়ি। সেইদিন নাক কান মলেছিলাম, আর কখনো পরটা আলুর দমের ফাঁদে পা দেব না, এপিক শুনব না, এপিকের ধারেকাছে যাব না, সাহিত্য করব না।"

কথক থামলেন। আড্ডা প্রাণ খুলে হাসল।

প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু লেখার রাজ্যে এলেন কি করে?'

প্রফুল্ল রায় উত্তর দিলেন, "সেই কথায় এবার আসি। এতক্ষণ সমুদ্র-লঙ্ঘন পালা চলছিল, এবার লঙ্কা দহন। ঐ যে আমার অপর মুরুব্বী অ-বাবু, তিনি লেখক, মুদ্রিত উপন্যাসের লেখক। তাঁর প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। একদিন ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'আমি একটা গল্প লিখেছি। যদি অমুক পত্রিকায় একটু বলে—'

'হইব না—হইব না—অত সহজে লেখক হওন যায় না। আমারে ছাহ, কত কষ্ট কইর‍্যা লেখক হইছি। এক কাম কর—আমার এই বইখান্‌ পইড়্যা এট্টা ভাল রিভিউ লেইখ্যা ফ্যালাও।'

তাই করলাম। আদেশ হল—'এইটা দিয়া আস'। যেখানে দিতে গেলাম, সেখানেই আমার গল্পটা দিতে অ-বাবুকে অনুনয় করেছিলাম। তাঁরা বললেন, অ-বাবু ত দেন নি। রোখ চেপে গেল। গল্পটার নাম 'একটি সংবাদ'। সাহিত্যসংসারের আর কাউকে চিনি না। বেশি দূরে যেতে ভরসা হয় না। আমার বাড়ি থেকে ভবানীপুর—শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট কাছে। বর্মন স্ট্রীট অনেক দূরে। চলে গেলাম 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার আপিসে। গল্পটা শ্রীঅনিলকুমার সিংহের হাতে দিয়ে চলে এলাম। দেখি পরের মাসেই বেরিয়ে গেছে। এই আমার প্রথম গল্প, ১৯৫৪ সালে লেখা। 'অন্তরঙ্গ' গল্পগ্রন্থে 'একটি আত্মহত্যার কাহিনী' নামে মুদ্রিত হয়েছে। তারপর উৎসাহ পেয়ে এক রাতে দুটো গল্প লিখে ফেললাম। ঐ বছরেই সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বেরুল 'মাঝি', আর শারদীয়া 'মুখপত্র'-এ বেরুল 'চর'। এ দুটিও 'অন্তরঙ্গ' বইতে আছে। 'দেশে' তারপর বেরুল 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাস। এই উপন্যাসেই আমার যা-কিছু প্রতিষ্ঠা। এর জন্য আমি সাগরদা'র অর্থাৎ সাগরময় ঘোষের কাছে চিরঋণী। আচ্ছা, আপনি 'অন্তরঙ্গ' পড়েছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ, পড়েছি। সব গল্পই তো পূব-বাঙলার চাষী-মাঝি-জীবন নিয়ে লেখা।"

প্রফুল্ল রায় উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। আমার বাড়ি ঢাকা জেলায়। পূব-বাঙলার গ্রামজীবন, মেঘনা-পদ্মার জীবন, ঢপের গান আর সখীসোনার পালাগানের জীবন ঐ গ্রন্থের প্রধান চরিত্র। জানি না, আর কোনোদিন দেশে ফিরতে পারব কিনা। ঐ মেঘমতী মেঘনা আর মোহিনী পদ্মাকে* ভুলতে পারি না। সেখান থেকে চলে এসে ডায়মণ্ডহারবারে আমার [illegible] বাড়ি করেছেন। সেখানেও নদী। নদী বাদ দিয়ে আমি ভাবতে পারি না।"

সত্যি তাই। 'অন্তরঙ্গ' বইটা আর একবার পড়লাম। তার

পাতায় পাতায় মেঘমতী মেঘনার বন্দনা। যে কোনো এক পাতার বর্ণনা : "মেঘনার জল রাশি রাশি কাশফুলের স্তবকের মত ফেনায় ফেনায় 'গর্জে উঠছে। বর্ষা এসেছে। কালনাগিনীর মত জলের রঙ, আসমান-সমান ঢেউগুলো ভৈরব-উল্লাসে আছড়ে পড়ে পারের মাটিতে। আর তারই ওপর কোষ-নৌকাটার আড়কাঠে লগি বেঁধে বাদাম দিয়ে দিত গোলোক। উজানী হাওয়ার খুশিতে একটা ঢেউএর উপর আর একটা ঢেউএর উপর ছিটকে এসে পড়ত নৌকাটা।" (মেঘনাপারের প্রেম)

প্রফুল্ল রায়ের নদী প্রশস্তি এবার মুখ খুললেন বিনয়রঞ্জন ঘোষ মশায়। "হ বুঝছি, আপনে ম্যাঘ্‌নার প্রেমে পাগল। কন্ দেহি এট্টা ম্যাঘ্‌নাপারের গান।"

প্রফুল্ল রায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। বললেন, "তাহলে শুনুন—

কালো চোখের মদ খাইয়াছি
হইয়াছি উন্মন,
আর মদ খাইয়াছি আমার
বধূর পের্‌থম যৌবন।
কেমনে ভাঙ্গুম আমি সেই
বঁধুয়ার মান—
চোখের পাতায় দিমু চুমা
ঠোঁটে সাঁচি পান।'

গান শুনে আড্ডা হৈ-হৈ করে উঠল। কথক জো পেয়ে বললেন, "এর চেয়ে বেশি ভাবের গান হ'ল এইটা—

হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
রাইত পোহাইল্যে টাকার কাম
টাকা কৃষ্ণ বড় কৃষ্ণ, আধুলি বলরাম
সিকি দুয়ানি হইল শ্রীদাম সুদাম।"

গান শুনে ঘোষ মশায়ের ভাবাবেশ হ'ল। তিনি 'অহো অহো'

করে উঠে দাঁড়ালেন নাচের ভঙ্গীতে। অর্ধমুদিত নয়নে কীর্তনের সুর ধরলেন—'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, রাইত পোহাইলে টাকার কাম—'

আড্ডার সেখানেই ইতি।

অন্যদিনের আড্ডা। চা-খাবারের পাট শেষ। আড্ডাধারী সবাই উপস্থিত। উস্‌কে দেবার জন্য বললাম, 'আপনি তো আন্দামানে গেছিলেন। 'সিন্ধুপারের পাখি' নামে এক বৃহদাকার উপন্যাস তো ঐ সফরের ফসল।'

প্রফুল্ল রায় ঘাড় নাড়লেন।

বললাম, 'ঐ উপন্যাস আমরা পড়েছি। ওর বাইরে আন্দামানের অন্য-কোনো গল্প বলুন।'

ঘোষ মশায় বললেন, 'বেশ রংদার কিস্‌সা বলুন।'

একটু হেসে প্রফুল্ল রায় বললেন, "আন্দামান নামের রকমফের আছে। যশোর-খুলনার যে-সব উদ্বাস্তুরা আন্দামানে গিয়েছে, তারা বলে আন্ধারমান দ্বীপ। তাদের একজনের কথা আপনাদের বলি। আমি পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়ে উঠি আমার বন্ধুর কোয়ার্টারে। মিঃ রাহা। তিনি সেখানকার First Class Magistrate এবং Rehabilitation Officer। তাঁর সঙ্গে একদিন তাঁর কোর্টে গিয়েছি। একটি বিচারদৃশ্য এ এক অপূর্ব চরিত্র যা দেখেছি, তা নিবেদন করি।"

বাচ্চু সেন মশায় বললেন, "শর্টকাট্ কইরেন না। খুইল্যা কন।"

প্রফুল্ল রায় শুরু করলেন,—

"অভিযুক্ত আসামীর নাম বিপদভঞ্জন বিশ্বাস। আদি নিবাস খুলনা জেলা। যদিও বিপদভঞ্জন বিশ্বাস তার নাম, আন্দামানে বিপদবর্ধন হিসেবেই সে পরিচিত। আন্দামানে প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে সাত একর বা একুশ বিঘে চাষের জমি দেওয়া হয়।

জঙ্গল পুড়িয়ে জমি বার করেই ভাগ করা হয় বলে জমিগুলোর কোনো সীমারেখা বা আল নেই। কাজেই মাপজোক করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিপদ ঝামেলা এখানেই।

"উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যারা নির্দিষ্ট সীমানা থেকে খুঁটি তুলে পাশের জমির দশবিশ হাত দখল করে সেটা পুঁতে দেয়। ফলে ঝগড়া মারামারি অনিবার্য। বিপদভঞ্জনের মামলাটি এ জাতীয় একটি মারামারির পরিণতি।

"তার বিপক্ষে অভিযোগ এই যে, ভীমরাজ জয়ধর নামে এক উদ্বাস্তুর মাথা বাঁশের বাড়ি দিয়ে দু-ফালা করে দিয়েছে। ভীমরাজ অবশ্য প্রাণে মরে নি। আমি যেদিন রাহার সঙ্গে তাঁর কোর্টে গিয়েছি, তার আগেই বিপদভঞ্জনের মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ সওয়াল-জবাব হয়ে গেছে। এবার অভিযুক্ত আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছু সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিপদভঞ্জন বিশ্বাস অপরাধ স্খালনের চেষ্টায় ও নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করায় যা বলেছিল, সেটাই আসল গল্প।

"ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে বিপদভঞ্জন শুরু করল।—'উপুরি দেখিছি ভগমান বাবা, নীচে দেখিছি আপনিরে। আপনি রাখলি রাখতি পারেন, মারলি মারতি পারেন। গুলী করি মার্তি পারেন। হাগরের জলে ভাসাইয়ে দিতি পারেন?'

"এই সময় পাবলিক প্রসিকিউটর বাধা দিয়ে বলেন, 'আজে বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা বল।'

"উত্তরে বিপদভঞ্জন বলল,—'কতিছি বাবা কতিছি। বিয়ান বেলায় উঠি জমিনে আলাম। 'আইসে দেখি ঐ হালা ভীমরাজ আমার জমিনে দশ হাত খুটা হান্দাই দেছে। আমি তারে ক'লাম, ভাই, পরের জমিনে খুটা হান্দাতি নাই। হে আমারে ক'ল, হালা। আমি তারে ক'লাম, হালা ক'তি নাই। হে আমারে ক'ল, ক'ব,

এক শ দির ক'ব। ত্যাখন তারে ক'লাম, ভাই যে বাবা [অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট, তিনিই রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার] আমাগোর কইল্‌কাতা থিকা এই আন্ধারমান দ্বীপি আনিছে সেই বাবার কাছে চল। উপুরি দেখিছি ভগমান, নীচে দেখিছি আপনিরে। আমি ভীমরাজেরে ক'লাম, চল সেই বাবার কাছে। সে আমারে ক'ল, যা হালা তোর বাপির কাছে। এই কথা কয়ে সে আমারে এট্টা অশৈল্য কথা ক'ল। সে কথা আমি ক'তি পারব না।' —বলেই সেই অশ্লীল শব্দগুলি বেমালুম উচ্চারণ করল বিপদভঞ্জন। পাবলিক প্রসিকিউটর ধমকে দিলেন।

"বিপদভঞ্জন ফের শুরু কবল।—'উপুরি দেখিছি ভগমান, নীচে দেখিছি আপনিরে। তারপর আমি তারে ক'লাম, তুমি আমারে যা ক'তিছ, ক'তিছ, কিন্তুন বাবারে [ম্যাজিস্ট্রেটকে] যদি কিছু কও, ভাল হবে না ক'তিছি। ভীমরাজ ক'ল, যা হালা, তোর বাবা আমার এইটা করব। কয়েই আবেট্টা অশৈল্য কথা ক'ল। হে কথা আমি মুখি আন্‌তি পারব না।' বলেই যথারীতি অশ্লীল কথা-গুলি বলল বিপদভঞ্জন। ম্যাজিস্ট্রেট ধমক দিলেন, 'অর্ডার, অর্ডার। বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা বল।'

"বিপদভঞ্জন বলল, 'কতিছি বাবা কতিছি। উপুরি দেখিছি ভগমান, নীচে দেখিছি আপনিরে। তার বাবা, আমি তারে আবার কলাম, বাবা গুরুজন, ছ্যাব্‌তা। তার নামে ফির যদি কও সহ্য করফ না। ত্যাখন বাবা, হে আমারে মাইরল্‌ চোপাড়। গেলাম পড়ি। উইঠে খাড়াইলাম তো আবার মাইর্‌ল চোপাড়। ফির গেলাম পড়ি। আবার উইল্লাম। মাইর্‌ল চোপাড়। গেলাম পড়ি। আবার উইল্লাম, মাইর্‌ল চোপাড়। চোপাড় খাতি খাতি বাবা, মনে রাগ হ'ল। মানুষের শরীল তো! পাশে একখান সরু কঞ্চি পইড়েছিল বাবা, সেইখন তুইলে ভীমরাজের কপালে আস্তে ঠেহাইছি। বাবা, আমি নিরপরাধ। আপনি রাখলি রাখতি পারেন,

মারলি মারতি পারেন। গুলী করি মারতি পারেন। হাগরের জলে ভাসাইয়ে দিতি পারেন। উপুরি দেখিছি ভগমান, নীচে দেখিছি আপনিরে।' ”

কথক থামলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে হাবে ভাবে বিচার-দৃশ্যটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আড্ডা হো-হো হেসে উঠল। কথক সামান্য হেসে বললেন, 'কেমুন ঠ্যাহে ?' বিনয় ঘোষ মশায় ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হু, ভালই ঠ্যাহে।'

আর একদিনের আড্ডা। উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ভাল না মন্দ, এই নিয়ে সেদিন গুরুগম্ভীর তর্ক হচ্ছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ভূগোল প্রসারিত হয়েছে। সে বিষয়ে সবাই একমত। তার ফলে অজানা দেশ, অচেনা মানুষ, অপরিচিত ভাষার প্রতি আমাদের রোমান্টিক কৌতূহলের তৃপ্তিসাধনকারী উপন্যাস অনেক পেয়েছি। তার ফলে উপন্যাসের উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কিনা তা বিচার্য। এই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রফুল্ল রায় এসে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঞ্চলিক উপন্যাস লেখককে হাতের কাছে পেয়ে সবাই তাঁকে ধুন্‌তে শুরু করল।

প্রফুল্ল রায় চুপ করে শুনলেন। তারপর বললেন, “আপনাদের যুক্তি অনেকটাই ঠিক। কিন্তু আমরা ওখানেই থেমে গিয়েছি ও-কথা মনে করছেন কেন ? 'পূর্বপার্বতী' আর 'সিন্ধুপারের পাখি' আমার শেষ কথা নয়। আধুনিক জগতের আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ আশ্রয়চ্যুত। সে আশ্রয় স্থূল জাগতিক আশ্রয় নয়, মানসিক আশ্রয়। আজকের মানুষ মানসিক উদ্বাস্তু। প্রেম বিশ্বাস ধর্ম—নানা ক্ষেত্রেই মানুষ আজ আশ্রয়চ্যুত। এই মানসিক আশ্রয়চ্যুতি ও পুনর্বাসনই আজকের লেখকের কাছে বড় সমস্যা। কোনো সচেতন লেখকই এই প্রশ্নকে বাদ দিয়ে যেতে পারেন না। 'নোনাজল

মিঠে মাটি' বা 'সিন্ধুপারের পাখি' উপন্যাসে শারীরিক জাগতিক পুনর্বাসনের কাহিনী বড় কথা, কিন্তু 'আকাশের সীমা নেই' আর 'সীমারেখার বাইরে' এই দুটি উপন্যাসে মানসিক পুনর্বাসনের প্রশ্নই প্রধান। মনের দিক থেকে আশ্রয়চ্যুত মানুষকে কী ভাবে মানস-আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে সমস্যার আলোচনা এখানে পাবেন।"

"কিন্তু—"

"আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। অল্‌ব্যের কামুর 'দি প্লেগ' উপন্যাস পড়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। মনে হয়েছে, এই উপন্যাসের পথরেখা অনুসরণ করলে আমরা সমাধানের নির্দেশ পাব। এই উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে, সে দেখার মধ্যে কোনো মোহ নেই, অন্তরাল নেই, ফাঁক নেই।"

বললাম, "কামুর এই উপন্যাস 'La Peste' নামে ফরাসী ভাষায় ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। উত্তর আফ্রিকার একটি শহরে প্লেগ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের চেহারা বদলে গেল। ডাক্তার দেখলেন, এতদিন যে-সব মূল্যবোধ অভ্রান্ত বলে মনে হত, আজ সেগুলি ভেঙে পড়ছে। সব রকম আদর্শবাদ এবং ধর্মাদর্শ যখন ভেঙে পড়ল, তখন ডাক্তার ঠিক করলেন তাঁর চারপাশের মানুষের সেবার মধ্যেই তাঁব মুক্তি' ডাক্তারের জীবনদর্শন অনেকটা নিরাশাবাদী মানবতাবোধ। আপনি কি এই পথে—"

লেখক বাধা দিয়ে বললেন, "না, না, আমি নিরাশাবাদী নই। আমি আশাবাদী, আমার যে মানবতাবোধ তার মধ্যে নৈরাশ্যের শেষ বিজয় ঘোষিত হয় নি। আমি ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষ কখনো নৈরাশ্যকে শেষ বিজয় দান করে না। আমার সামনে পড়ে আছে জীবনের প্রসারিত ক্ষেত্র, অভিজ্ঞতা ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে আমাকে এগোতে হবে। শেষ দুটি উপন্যাসে ('আকাশের সীমা নেই, ও 'সীমারেখার বাইরে') আমি এগোবার চেষ্টা করেছি,

আপনাদের মতো সহৃদয় সমালোচকের বিশ্লেষণে আমার ত্রুটি ধরা পড়বে। তার ফলে জীবনকে আরো ভালভাবে চিনতে পারব বলে আমি আশা করি।"

জীবনের প্রতি এই গভীর কৌতূহল ও তৃপ্তিহীন অন্বেষণ, এই বিনম্র দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে প্রফুল্ল রায় এগিয়ে চলেছেন।

প্রফুল্ল রায় ঘুরেছেন প্রায় সারা ভারতবর্ষ। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, নাগারাজ্য, দণ্ডকারণ্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ঘুরে বেড়িয়েছেন।

একদিনের সান্ধ্য আড্ডায় ভ্রমণের কথা উঠেছিল। ভাদ্রের শেষ। সে-সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল। আর কেউ আসেন নি। আমরা দুজন গল্প করছি। সামনেই পুজোর ছুটি। স্বভাবতই ভ্রমণ-প্রসঙ্গ উঠেছিল।

প্রফুল্ল রায় প্রশ্ন করলেন, "এবার ছুটিতে কোথায় যাচ্ছেন?"

গম্ভীর ভাবে বললাম,

'ইচ্ছা সম্যক্ পাথেয় নাস্তি
মন উড়ুউড়ু পায়ে শিক্লি
এ কি দৈবেরি শাস্তি।'

প্রফুল্ল রায় হাসলেন। জানালেন, তিনি এবার বোম্বাইর রত্নগিরি অঞ্চলে বেড়াতে যাবেন। মহারাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। বললাম, "আপনার বোম্বাই-ভ্রমণের দু-একটা গল্প বলুন।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে রায় বললেন, "বোম্বাই ভ্রমণের কথা আর আমায় মনে করিয়ে দেবেন না। সমুদ্রতীরবর্তী এই নগরের স্মৃতি আমার কাছে দুঃখ ও লজ্জার, আনন্দ ও বেদনার।"

বললাম, "উঁহুঁ, এখানে থামলে চলবে না। কিছু হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারের আঁচ পাচ্ছি যেন। খুলে বলুন।"

ম্লান হাসি হাসলেন প্রফুল্ল রায়। তারপর বললেন, "বেশ, আপনি যখন শুনবেনই, তখন বলছি। কিন্তু এক শর্ত, শুনে কোনো মন্তব্য করবেন না।"

কথা দিলাম। বাইরে তখন সন্ধ্যার কলকাতা বৃষ্টিতে ভিজছে। দরজার বাইরে জল পড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল রায় শুরু করলেন।

"বছর চারেক আগে বোম্বাইর জুহু 'বীচে' বসেছিলাম। পাশে বান্ধবী শারদা প্যাটেল। সামনে আরব সাগর। যতদূর চোখ যায়, সমুদ্র তার অগণিত তরঙ্গ নিয়ে ওখানে বিপুল, বিশাল আর উদার হয়ে আছে।

আমার বান্ধবীটি গুজরাটের পোরবন্দরের মেয়ে। হ্যাঁ, সুন্দরী নিশ্চয়ই। চাকরির খাতিরে বর্তমানে বোম্বাইবাসিনী। আর আমি? মাস ছয়েকের কাজে বোম্বাইবাসী। আপনার হয়ত মনে আছে মাঝে কলকাতা শহর থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেম। সেটা ঐ সময়েই।

শারদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক সামাজিক আসরে। তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তা এগিয়ে গিয়েছে। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের দু-জনের সম্পর্ক এখন বন্ধুত্বেই সীমাবদ্ধ নেই। কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে আমরা আরো নিকট এবং ঘনিষ্ঠ হয়েছি।

ইদানীং শারদাকে ঘিরে আমার মনে একটি বাসনা জন্মেছে। আমার প্রবল ইচ্ছা তাকে এমন ভাবে পাই যেমন ভাবে পেয়ে একজন পুরুষ সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত। আভাসে যতটুকু বুঝেছি, আমাকে ঘিরেও শারদার ঐ একই আকাঙ্ক্ষা, ঐ একই স্বপ্ন।

শারদার মনের কথা আমি এখনও সম্পূর্ণ জানি না। আমার কথাও তাকে বলা হয় নি। পরস্পরকে জানব বলেই শারদাকে নিয়ে জুহুর বালুকাবেলায় আজ পাশাপাশি বসেছি।

আরব সাগর তার সীমাহীন বিস্তৃতি নিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত ধাবিত। শারদা সেদিকে তাকিয়ে আছে। খুব মগ্ন হয়ে কি যেন ভাবছে। কেমন করে শুরু করব, বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ এলোমেলো-

ভাবে দু-চারটে সাধারণ কথা হ'ল। অন্যমনস্কের মতো কথার পিঠে কথা জুগিয়ে যেতে লাগল শারদা।

এক সময় নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা শারদা, জীবনে কী পেলে তুমি সবচেয়ে সুখী?'

'সবচেয়ে সুখী?' সমুদ্রের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই শারদা শুধলো।

'হ্যাঁ।' পিপাসিতের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'যদি ডাক্তার হতে পাই—' বলতে বলতে শারদা থামল।

এই মুহূর্তে এ-রকম একটা উত্তর প্রত্যাশা করি নি। ভেবেছিলাম, আমার মনের কথাটাই শারদার মুখে প্রতিধ্বনিত হবে। মনে মনে খুবই আহত হলাম।

বললাম, 'কী বলছ!'

'সব শুনলে তুমিও বলবে, ঠিকই বলছি।' শারদা বলতে লাগল, 'পোরবন্দরে যেখানে আমাদের বাড়ি, প্রতি বছরে কলেরায় সেখানে বহুলোক মারা যায়। অথচ ওখানে কোনো ভালো ডাক্তার নেই। শহরে যা-ও দু-চারজন আছে, তারা ওখানে যেতে চায় না। গেলেও অনেক টাকা 'ফী' আদায় করে। অত টাকা দেবার সামর্থ্য আমার গ্রামের লোকের নেই। ফলে বিনা চিকিৎসায় মরাটা ওদের কাছে নিয়তি।'

একটু থেমে শারদা আবার শুরু করল, 'বিনা ওষুধে মরে মরে শেষ পর্যন্ত লোকগুলো যেন মরীয়া হয়ে উঠল। তারা স্থির করল, একজন ডাক্তার চাই। চাই তো, মেলে কোথায়? অনেক পরামর্শের পর ঠিক হ'ল, দেশেরই কারুকে চাঁদা তুলে ডাক্তারি পড়ানো হবে। শর্ত হ'ল, ডাক্তার হবার পর গ্রামে এসে তাকে চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু গ্রামের কোনো ছেলেই এগিয়ে এল না। লোকগুলো যেন হতাশ হয়ে পড়ল। অসহায়, দৈবনির্ভর মানুষগুলোকে দেখে আমার করুণা হ'ল। তাদের শর্তে রাজী হয়ে

গেলাম। তারাও আমাকে পড়াতে লাগল। মেডিক্যাল কলেজে চার বছর পড়েও ছিলাম। তারপর গ্রামের লোকেরা আর খরচ চালাতে পারল না। চাকরি নিয়ে তাই বোম্বাই এসেছি। মাসে মাসে টাকা জমিয়ে যাচ্ছি। আবার আমি কলেজে ভর্তি হ'ব। ফাইনাল পরীক্ষাটা বাকি আছে। একেবারে ডাক্তার হয়ে বাড়ি ফিরব। দেশের মানুষগুলো অনেক আশা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মৃত্যুর হাত থেকে তাদের বাঁচানোই আমার সবচেয়ে বড় সুখ, সবচেয়ে বড় আনন্দ। জীবনে এর চেয়ে বড় বাসনা আমার নেই।'

শারদা থামল। মনে হল, সামনের সমুদ্রটার সঙ্গে শারদার বাসনার কোথায় যেন আন্তরিক একটা মিল আছে।

খানিকটা চুপচাপ।

এবার শারদার পালা। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি সবচেয়ে কিসে সুখী?'

'আমি—আমি—' বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সাধটার কথা বলা হ'ল না। বিরাট সমুদ্রের বালুকাবেলায় বসে নিজেকে খুব স্বার্থপর, ক্ষুদ্র আর সংকীর্ণ মনে হতে লাগল।

এরপর আর একটা কথাও হ'ল না। শারদার মতো আমিও সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। আরব সাগর যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, ছোট মাপের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমুদ্রের কাছে আসতে নেই।"

প্রফুল্ল রায় থামলেন। বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামে নি। ঝির্-ঝির্ করে পড়ছেই। শর্তমতো চুপ করে রইলাম। নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রফুল্ল রায় বললেন, 'আজ চলি।' বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন। বাধা দিলাম না।

প্রফুল্ল রায়ের সাহিত্য সাধনা বৃহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, এই সত্যটি সেই বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যায় উপলব্ধি করলাম।
